কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর

"গীতায় ঈশ্বরবাদ", "উপনিষদ্" (ব্রহ্মতত্ত্ব) "বেদান্ত-পরিচয়" প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল,
বেদান্তরত্ন
প্রণীত

সন ১৩৩২ সাল

মূল্য ১৷০ মাত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

কর্ম্মবাদিনী

প্রথম অধ্যায়

কর্ম্মবাদের যুক্তি

আর্য্যঋষিরা যোগসিদ্ধ প্রতিভাবলে যে, অপূর্ব্ব প্রজ্ঞামন্দির রচনা করিয়াছিলেন, তাহার চূড়ায় নির্ব্বাণের জ্যোতিঃ এবং তাহার ভিত্তিফলক কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর। আমরা প্রথমতঃ কর্ম্মবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কর্ম্মবাদের যুক্তি কি?

জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সাম্যবাদীরা যাহাই বলুন না কেন, এ জগৎ কিন্তু বৈষম্যময়। সাম্যবাদী এ কথা অস্বীকার করেন না; বরং, বৈষম্যময় জগতে যাহাতে বৈষম্য ঘুচিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাই সাম্যবাদীর লক্ষ্য ও আদর্শ। জগতের বৈচিত্র্য সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৈচিত্র্য বৈষম্যের নামান্তর। এই বৈচিত্র্য বা বৈষম্যের প্রকার ও পরিমাণ কিরূপ?

প্রাচীনেরা জগৎকে দুই প্রধান কোটিতে বিভক্ত করিতেন—চর ও অচর। 'চরাচর বিশ্ব' সংস্কৃত গ্রন্থে একটী সুপরিচিত শব্দ। চর অর্থে গতিশীল, জঙ্গম; অচর অর্থে স্থিতিশীল, স্থাবর। স্থাবরজঙ্গম চরাচরের নামভেদ মাত্র। ইংরাজীতে ইহাদের প্রতিশব্দ Inorganic ও Organic—নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। মৃত্তিকা, পাষাণ, স্থল, জল, পর্ব্বত, নদী, ধাতু প্রভৃতি সমস্তই স্থাবর পদার্থ। যাহা পরমাণুর সমষ্টিতে গঠিত, অথচ প্রাণহীন, তাহাই অচর বা স্থাবর; ইহার প্রকারভেদের সংখ্যা করা মনুষ্যশক্তির অসাধ্য। স্থাবরেরই এত বৈচিত্র্য, জঙ্গমের জাতিভেদের ইয়ত্তা কে করিতে পারে? জঙ্গম প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; উদ্ভিদ্ (Vegetable) ও

জীব (Animal)। উদ্ভিদের কত শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। জীবের শ্রেণীনির্দ্দেশ স্থলে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য প্রভৃতির উল্লেখ করেন। প্রাচীনেরা জঙ্গম পদার্থকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিতেন—স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। যাহার প্রাণ আছে, কোষাণু (cell)-সমষ্টিতে যাহার দেহ গঠিত, সেই জঙ্গম। জীবের প্রত্যেক শ্রেণীতে কত উপশ্রেণী আছে, প্রত্যেক জাতিতে কত উপজাতি আছে, কে তাহার গণনা করিয়া শেষ করিবে? যদি আবার প্রত্যেক উপজাতির অন্তর্গত ব্যক্তি সকলের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে তাহাদের বৈচিত্র্যে বাস্তবিকই বিমূঢ় হইতে হয়। পশুর উপরে যেমন মানুষ, তেমনি মনুষ্যসৃষ্টির উপর দেবসৃষ্টি। সে সৃষ্টি অবশ্য সাধারণের প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষের উপদেষ্টা শাস্ত্রে ও দিব্যদৃষ্টিশীল সাধুদিগের মুখে এ বিষয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, দেবসৃষ্টির বৈচিত্র্য, জীবসৃষ্টির বৈচিত্র্যকে সহজেই পরাভূত করিয়াছে। সে বৈচিত্র্যের কথা ভাবিলে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার গণনা অতিরঞ্জিত মনে না হইয়া, বরং, প্রকৃত সংখ্যার অনেক ন্যূন বলিয়াই মনে হয়। অতএব, মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, জগৎ নিতান্তই বৈষম্যময়।

কেবল যে জীবের মধ্যে দেহগত বৈষম্য, তাহা নহে; জীবের প্রকৃতি ও ভোগ বিষয়েও যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষিত হয়। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া মনুষ্যের কথাই দেখা যাউক। মানুষে মানুষে যথেষ্ট বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধার্ম্মিক কেহ অধার্ম্মিক, কেহ বুদ্ধিমান্ কেহ নির্ব্বুদ্ধি, ইহা ত' সর্ব্বদাই ধরা যাইতেছে। বাস্তবিক, মানুষে মানুষে জাতিগত সাদৃশ্য ভিন্ন, বোধ হয়, আর কোন বিষয়েই সাম্য নাই। কি ভোগ, কি প্রকৃতি, কি আচরণ—সর্ব্ব বিষয়েই প্রচুর বৈষম্য।

এরূপ হয় কেন ? জগতে এত বৈষম্য কেন ? কেন সকল জীব সমান সুখী নহে ? কেন সকলের বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রকৃতি, ধারণা একরূপ নহে ? ঈশ্বরই ত' জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ! তিনি ত' করুণাময় ! অতএব, সকলকে সমান করিলেন না কেন ? সমান ভোগ, সমান সুখ, সমান বুদ্ধি, সমান ধর্ম্মে সকলকে সমান অধিকারী করিলেন না কেন ? তিনি ত' সর্ব্বশক্তিমান্ ! অতএব ক্ষমতার অভাব হইতেই পারে না। আর তিনি যখন করুণাময়, তখন প্রবৃত্তিরও অভাব সম্ভবে না। তবে প্রবৃত্তি ও শক্তি —উভয় সত্ত্বেও, জগতের রচনায় তিনি এরূপ বৈষম্যের অবতারণা করিলেন কেন ? তবে কি ঈশ্বর পক্ষপাতী ? তিনি কি পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও ভাল, কাহাকেও মন্দ গড়িয়াছেন ? তাহাও ত সম্ভবে না। কারণ, তিনি নিজেই বলিয়াছেন 'সকল জীবই আমার কাছে সমান, আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই'। (সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ—গীতা, ৯।২৯)। তবে এ বৈষম্যের মীমাংসা কি ?

আধুনিক খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে যত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, প্রত্যেকেই ঈশ্বরের নূতন সৃষ্টি। অর্থাৎ মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সে জীবের কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রত্যহ যতগুলি জীব উৎপন্ন হইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের প্রত্যেককে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। অথচ, খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মা অজর ও অমর। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে আত্মার জন্ম আছে কিন্তু মৃত্যু নাই, উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নাই, আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই। এই মতাবলম্বীরা জগতের বৈষম্যের কোন কিছু সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন না। অবশ্য তাঁহারা যখন নাস্তিক নহেন, তখন ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই করুণাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করেন। এইরূপ স্বীকার করাতে এই বৈষম্য-সমস্যার সমাধান তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। কারণ, করুণাময় ঈশ্বর,

সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও কেন যে জগতে এত বৈষম্যের অবতারণা করিয়াছেন, সে কথার তাঁহারা কোন উত্তর দিতে পারেন না।

ইহার ফল পাশ্চাত্য দেশে বড় বিষময় হইয়াছে। কারণ, বৈষম্যের কোন সুমীমাংসা না পাইয়া, ইউরোপের বুদ্ধি বিপথগামী হইয়াছে। কোন কোন মনীষী ঈশ্বরকে কঠোর, নির্ম্মম ও জীবদুঃখে উদাসীন ভাবিয়া তাঁহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু তিনি জগদ্ সৃষ্টির পর জগদ্-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা অবলম্বন করিয়াছেন এবং জীবের দুঃখকষ্টে, যাতনা ও বেদনায় সহানুভূতি না করিয়া স্বর্গের একান্তে বসিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছেন। আস্তিকতার ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে? অপর পক্ষে, জড়বাদী নাস্তিকগণ যদৃচ্ছাবাদের (Chance) অবতারণা করিয়া এই বৈষম্যের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরমাণুপুঞ্জের আকস্মিক সঙ্ঘাতে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব দেহাতিরিক্ত কোন চৈতন্য-বস্তু নহে। আত্মা মস্তিষ্ক-ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। এ মতে জগতের জীব যেমন আকস্মিক, জগতের বৈষম্যও তেমনি আকস্মিক (due to chance)। এ বৈষম্যের জন্য অন্ধ জড়পরমাণুই দায়ী। সে অন্ধ জড়কে দায়ী করিয়া লাভ কি?

এই মত প্রচারিত হওয়াতে, পাশ্চাত্য দেশ অশান্তি ও অসন্তোষের লীলাভূমি হইয়াছে। কেহই নিজের অবস্থায় তুষ্ট নহে; সকলেই ভাবিতেছে যে, সম্পূর্ণ সুখসম্পদে অপরের যেমন অধিকার, তাহারও সেইরূপ। অপরে সুখী, সে দুঃখী কেন? অপরে ধনী, সে নির্ধন কেন? অপরে প্রভু, সে দাস কেন? অপরে ঊর্দ্ধে, সে অধে কেন? অপরের সহিত সমান হইবার তাহার ন্যায্য অধিকার আছে। আর তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—সমাজ ও শাসন। এই প্রবলকে দুর্ব্বল করাই

তাহার মনুষ্যত্ব। পাশ্চাত্য জনসাধারণ এই ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াতেই, ইউরোপে এত বিপ্লব ও বিতণ্ডা। ইহা হইতেই Nihilism, Anarchism প্রভৃতি সমাজদ্রোহের উৎপত্তি। এই ভাব সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়া এক বিশাল নিরাশা-সাহিত্যের (Literature of Despair) সৃষ্টি করিয়াছে। সেই নিরাশা-সঙ্গীতে সমস্ত ইউরোপ মুখরিত। পাশ্চাত্য সাহিত্য-মন্দিরের এক আয়ত প্রকোষ্ঠ এই নিরাশা-সাহিত্যে সজ্জিত। এবং ইহার ফলে চির প্রচলিত দুঃখবাদ (Pessimism) সর্ব্বগ্রাসী নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে পরিণত হইয়া ইউরোপের বিশাল আকাশে বিরাজমান।

জগতের এই বৈষম্য ইউরোপের দর্শনশাস্ত্রেরও আলোচ্য হইয়াছে। যে সকল দার্শনিক ইহার সমালোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে লাইবনিটজ (Liebnitz) ও ক্যাণ্টের (Kant) মত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাইব নিট্জ বলেন যে, সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই সসীম হইবে; কারণ, সৃষ্টি বলিলেই সীমা বুঝায়। সীমাহীন সৃষ্টি অসম্ভব ব্যাপার। অতএব জীব যখন সৃষ্ট পদার্থ, তখন সেও সসীম। সসীম হইলে অসম্পূর্ণ হইতেই হইবে। জীব যখন অসম্পূর্ণ, তখন তাহার পক্ষে পাপ করা অবশ্যম্ভাবী; এবং পাপের ফলে দুঃখ সুনিশ্চিত। অতএব যখন সৃষ্ট পদার্থ লইয়া জগৎ, তখন সে জগতে দুঃখ থাকিবেই থাকিবে। জগতে দুঃখ আছে বলিয়া ইহা যে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বতঃপূর্ণ পরমেশ্বরের রচনা নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনই যুক্তি নাই।

লাইবনিট্জ যে সমুদয় কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে এই মাত্র দেখান হইয়াছে যে, ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে কেমন করিয়া দুঃখের স্থান হইয়াছে। কিন্তু তিনি বৈষম্যের কি সমাধান করিলেন? সকল জীবই ত' অপূর্ণ। তবে কেহ কেহ অল্পবুদ্ধি বশতঃ এবং অসৎ প্রকৃতির প্রেরণায় পাপ করিয়া দুঃখভাগী হয় কেন? আর অপরে সুবুদ্ধির বশে শুদ্ধ প্রকৃতির

সাহায্যে পুণ্য করিয়া সুখভাগী হয় কেন? এক কথায়, জীবের স্বভাবে ও ভোগে এত বৈষম্য কেন? লাইবনিট্জ এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নাই।

দার্শনিক ক্যাণ্টের (Kant) উত্তরও ইহাপেক্ষা সন্তোষজনক নহে। তিনি বলেন যে, পুণ্যের ফলে সুখ ও পাপের ফলে দুঃখ, ইহাই নৈতিক জগতের ধারা (Moral Order of the Universe) হওয়া উচিত। সংসারে কিন্তু দেখা যায় যে, পুণ্যের সহিত অনেক সময় দুঃখ জড়িত থাকে; এবং পুণ্যের অভাব সুখলাভের অন্তরায় হয় না। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য আমাদের মানিয়া লইতে হয় যে, দেহান্তের পরও আত্মা জীবিত থাকে এবং পরলোকে পাপপুণ্য ও দুঃখসুখের সামঞ্জস্য বিধান হয়। ক্যাণ্ট (Kant) এই বিশ্বাসকে ব্যাবহারিক বুদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ (Postulate of Practical Reason) স্বরূপ বলিয়াছেন।

ক্যাণ্টের কথায় প্রতিবাদযোগ্য কিছুই নাই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি এই মতবাদ প্রচার করিয়া জগতের বৈষম্য-সমস্যার কি মীমাংসা করিলেন?

পাশ্চাত্য দার্শনিকের সাহায্যে যখন এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইল না, তখন ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা ইহার কি উত্তর দেন, তাহার একবার সন্ধান করা ভাল। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া জীবের হিতার্থে যে সকল সত্যের প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কর্ম্মবাদ একটী প্রধান সত্য। ঋষিদের মতে আত্মা অজ, নিত্য, পুরাতন, সনাতন বস্তু; আত্মার জন্মমৃত্যু, উৎপত্তি বিনাশ নাই। তবে পুনঃ পুনঃ দেহের সহিত তাহার সংযোগ বিয়োগ ঘটিতেছে। ইহারই নাম জন্মান্তর। জীব যে এই প্রথমবার জন্ম গ্রহণ করিল, তাহা নহে; ইহার পূর্ব্বেও তাহার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; আবার পরেও বহু জন্ম উপস্থিত হইবে। জীব ইহজন্মে যেমন পাপপুণ্যের

অনুষ্ঠান করিতেছে, যেমন শুভ ও অশুভ বাসনা চিত্তে পোষণ করিতেছে, যেমন সুচিন্তা ও কুচিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছে, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও করিয়াছিল। সেই সেই ভাবনা, বাসনা ও ক্রিয়ার ফলে, তাহার ইহজন্মের প্রকৃতি ও ভোগ নিয়মিত হইয়াছে; অর্থাৎ সে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, তেমনি ফল পাইতেছে। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত বা করুণার অভাব নাই। তিনি কর্ম্মানুসারে ফলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীব আপন সুকৃতির ফলে সুখী এবং দুষ্কৃতির ফলে দুঃখী হইয়াছে। সে যদি জন্মান্তরে শুভ বাসনা ও সৎ ভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকে, তবে ইহজন্মে শুভবুদ্ধি ও সুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আর যদি জন্মান্তরে দুর্ব্বাসনা ও কুভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকে, তবে ইহজন্মে অশুভবুদ্ধি ও কুপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাই কর্ম্মবাদের স্থূল কথা। জগতের বৈষম্য বুঝাইবার পক্ষে এরূপ সমীচীন মত আর দ্বিতীয় নাই। এ সম্বন্ধে মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎতথাহি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, জগতে কাহাকেও কাহাকেও অত্যন্ত সুখভোগী, কাহাকেও কাহাকেও অত্যন্ত দুঃখভোগী এবং কাহাকেও কাহাকেও মধ্যম অবস্থাপন্ন দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাত বা করুণার অভাব সিদ্ধ হয় না। কারণ ঈশ্বর কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন না। তিনি জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম বা অদৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বৈষম্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। অতএব জীবগত কর্ম্মের তারতম্যই বৈষম্যসৃষ্টির প্রকৃত কারণ;—ঈশ্বর নিমিত্ত মাত্র।

সাপেক্ষোহীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিম্ অপেক্ষতে ইতি চেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষতে ইতি বদামঃ। * * দেবমনুষ্যাদি-বৈষম্যে তু

তত্তজ্জীবগতানি এব অসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি। এবং ঈশ্বরঃ সাপেক্ষত্বাৎ ন বৈষম্যনৈঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি ॥

এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজাচার্য্য এই পরাশরবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

নিমিত্তমাত্রং এবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মনি।
প্রধান কারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥

'সৃজ্য পদার্থের সৃষ্টির পক্ষে ঈশ্বর নিমিত্ত মাত্র। কারণ সৃজ্য জীবের শক্তিই (কর্ম্ম) সৃষ্টির প্রধান কারণ।' ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে ভাগবতকার সৃষ্টির পক্ষে তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কাল, স্বভাব ও সংস্কার। স্বভাব অর্থে জগতের জড় উপাদান—প্রকৃতি ; সংস্কার=জীবের অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্ম্ম। যখন প্রলয়ের অন্তে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টির কাল উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ জীবের অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির পরিণামে বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করেন। অতএব কর্ম্মই সৃষ্টি-বৈষম্যের প্রধান কারণ।

মীমাংসকেরাও কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন। কর্ম্মই যে বৈষম্যের জনক, ইহা তাঁহাদেরও মত ; কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মের উপর অধিক ঝোঁক দিয়া ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে কর্ম্মই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (automatically) ফল উৎপন্ন করে। ইহাতে ঈশ্বরের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, জড় কর্ম্ম বিধাতার বিধান ভিন্ন কোন কিছুই করিতে পারে না। সেই জন্য ঈশ্বরকে নিমিত্ত বলা হইয়াছে। অবশ্য ঈশ্বরকে কর্ম্মফলের বিধাতা বলাতে দণ্ডপুরস্কারের নিয়ন্তা বলা হইল না। প্রচলিত খৃষ্টানধর্ম্মে দণ্ডপুরস্কারের (Reward and Punishment) সহিত ঈশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। খৃষ্টানের ঈশ্বর নাকি ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর (jealous God)! এইরূপে ঈশ্বরকে

জীবের পাপপুণ্যের বিচারকের আসনে আসীন করান হয়। তিনি প্রত্যেক জীবের পুণ্য ও পাপ তৌল করিয়া সুখ দুঃখের বিধান করেন।

কর্ম্মবাদ এ ভাবে ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব স্বীকার করে না। বোধ হয় এই ধরণের মতের প্রতিবাদ করিয়াই মীমাংসকেরা কর্ম্মফলের স্বতঃসিদ্ধি খ্যাপন করিয়াছেন: কর্ম্ম ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে ফল প্রসব করে। কেহ যদি অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়, তবে তাহার দাহফল অবশ্যম্ভাবী; সে জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নাই। সেইরূপ কেহ যদি সুকৃতের অনুষ্ঠান করে, তবে তাহার সুখভোগ সুনিশ্চিত; তজ্জন্য ঈশ্বরকে বিচারাসনে বসাইবার প্রয়োজন নাই।

কর্ম্মবাদের সাহায্যে জগতে অধুনাদৃষ্ট বৈষম্যের সমাধান করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সৃষ্টির প্রারম্ভে যে বৈষম্য প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার হেতু নির্দ্দেশের উপায় হয় কি? শাস্ত্রে সৃষ্টির যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রথম হইতেই জগৎ বৈষম্যময়। উদ্ভিদ্, পশু, মনুষ্য, দেব—জীবের এই ভেদ প্রথম অবধিই ছিল।

> তস্মাৎ চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
> সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি॥—মুণ্ডক, ২।১.৭

'তাঁহা হইতে সৃষ্টির আদিতে দেব, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী—এই বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়।'

> তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।
> মুণ্ডক ২।১।১

'সেই অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, আবার তাঁহাতেই লীন হয়।'

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মবৈচিত্র্যই এই বৈষম্যের কারণ। দেহধারী

জীব ভিন্ন কে কর্ম্ম করিবে? সৃষ্টির পূর্ব্বে ত' জীবের দেহ সংযোগ থাকে না। তবে কর্ম্ম আসিবে কোথা হইতে? অথচ বলা হয় যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টিবৈষম্য বিধান করেন। হিন্দুর পক্ষে এ আপত্তির উত্তর অতি সহজ। কারণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি অনাদি। বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বেও অসংখ্যবার সৃষ্টি হইয়াছে, আবার পরেও অসংখ্য সৃষ্টি হইবে। যেমন অঙ্কুর হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুর; সেইরূপ কর্ম্ম হইতে সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির জন্য কর্ম্ম। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের মীমাংসা এইরূপ—

ন কর্ম্মাবিভাগাদ্ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ। —ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৫

ইহার শঙ্করভাষ্য এইরূপ :—

নৈষঃ দোষঃ অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদ্ এষ দোষো যদি আদিমান্ সংসারঃস্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতু-হেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তিন বিরুধ্যতে।

পতঞ্জলিও যোগসূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন—

তাসাম্ অনাদিত্বম্ চাশিষোনিত্যত্বাৎ —৪।১০

জন্মান্তরের প্রসঙ্গে আমাদিগকে এ কথার পুনর্ব্বার আলোচনা করিতে হইবে। অতএব এ স্থলে আর বিস্তার করিব না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

কর্ম্ম কি? অন্তর্দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আত্মার তিন শক্তি; জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি।

পরাস্য শক্তির্বিবিধা চ মায়া, স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ।—শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮।

'ইঁহার (আত্মার) পরা শক্তি, বিবিধ মায়া; জ্ঞানশক্তি, বল (ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই তিনটি স্বভাব সিদ্ধ।'

শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। আত্মার এই যে তিন শক্তি, ইহাদিগের প্রকাশ কিসে?

জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়া ভাবনা (Thought); ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া বাসনা (Desire); এবং ক্রিয়া শক্তির ক্রিয়া চেষ্টনা (Action)। অতএব, আত্মা হইতে যে শক্তিত্রয় উৎসারিত হইতেছে, তাহাদিগের প্রকাশ—ভাবনাতে, বাসনাতে ও চেষ্টনাতে।

ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে—Action মাত্রেরই Reaction আছে। এই বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রাকৃতিক জগতের সম্বন্ধে যেমন সত্য, আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধেও সেইরূপ। কারণ, জগৎ সর্ব্বত্রই নিয়মের অধীন। কি আধ্যাত্মিক কি প্রাকৃতিক, কি চিৎ কি জড়, জগতের কুত্রাপি এ নিয়মের ব্যত্যয় নাই। এই যে ত্রিবিধ ক্রিয়া,—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা,—ইহাদিগের সাধারণ নাম কর্ম্ম। কর্ম্মফল কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। কর্ম্মফল কর্ম্মেরই উত্তররূপ, এবং কর্ম্ম কর্ম্মফলের পূর্ব্ব রূপ। কর্ম্ম

করিলেই তাহার ফল হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী।

কর্ম্ম করিলে কেবল যে কর্ত্তারই স্বগত (subjective) ফল হয়, তাহা নহে ; তাহার পরগত (objective) ফলও অপরিহার্য্য। কর্ম্মের স্বগত ফল দ্বিবিধ ; সংস্কার ও অদৃষ্ট। আত্মার যে শক্তি যখন সক্রিয় (Kinetic) হয়, তখন সে তাহার উপযোগী উপাধিতে স্পন্দন উৎপন্ন করে। ক্রিয়াশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র অন্নময় কোষ (Physical body) ; ইচ্ছা শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র প্রাণময় কোষ (Astral body) ; এবং জ্ঞান-শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র মনোময় কোষ (Mental body)। অতএব ভাবনাতে মনোময় কোষের, বাসনাতে প্রাণময় কোষের এবং চেষ্টনাতে অন্নময় কোষের স্পন্দন উৎপন্ন হয়। যদি সে স্পন্দন প্রবল হয়, তবে তাহার ফলে স্পন্দিত কোষের উপাদান সমূহ আন্দোলিত হইয়া স্থানচ্যুত হইতে পারে। তখন নূতন উপাদান কোষভ্রষ্ট উপাদানের স্থান গ্রহণ করে। এইরূপে কোষের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এবং সেই সেই স্পন্দনের সংস্কার, সেই সেই কোষে সংস্কার রূপে রহিয়া যায়। ইহাই কর্ম্মের স্বগত ফল।

স্পন্দন কিরূপে সংস্কার-আকারে স্থায়ী হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের অপরিচিত নহে। আমরা যাহাকে স্মৃতি বলি, যাহার ফলে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) হয়, সেই স্মৃতি সংস্কার ভিন্ন আর কি ? এই স্মৃতির ব্যাপার আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাকৃতিক জগতেও সংস্কারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ফনোগ্রাফ যন্ত্রের নিকটে যদি কোন সঙ্গীত করা যায়, তবে সেই শব্দ সংস্কার-রূপে ঐ যন্ত্রে রক্ষিত হয় ; পরে কৌশলে তাহার উদ্বোধন করিলে সেই সঙ্গীত আবার শ্রুতিগোচর হয়। আমাদের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষে, ভাবনা বাসনা ও চেষ্টনার যে সংস্কার রহিয়া যায়, তাহার প্রকৃতিও ঐরূপ।

এই তিন কোষের উপর উন্নততর জীবের আর তিনটী সূক্ষ্মতর কোষ আছে। তাহাদিগের নাম বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোষ। এই কোষত্রয় আত্মার উচ্চতর, অন্তরতর শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র। সেই শক্তিত্রয়ের নাম সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ। আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মার সৎ-ভাবের বিকাশ সন্ধিনী শক্তিতে; ঐ শক্তির প্রকাশ হিরণ্ময় কোষে। আত্মার আনন্দ-ভাবের বিকাশ হ্লাদিনী শক্তিতে; ঐ শক্তির প্রকাশ আনন্দময় কোষে। আত্মার চিৎ-ভাবের বিকাশ সংবিৎ শক্তিতে; ঐ শক্তির প্রকাশ বিজ্ঞানময় কোষে। এই তিন সূক্ষ্মতর কোষেও শক্তির ক্রিয়ার ফলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। ঐ ক্রিয়ারও স্বগত ও পরগত ফল আছে। সাধারণ জীবে আত্মার সচ্চিদানন্দ ভাব সম্পূর্ণ অব্যক্ত। সুতরাং ঐ সূক্ষ্মতর কোষত্রয়ও অস্পষ্ট। অতএব কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সাধারণ আলোচনায় ইহাদিগের প্রসঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন।

যে কোষে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেই কোষ স্পন্দিত করিয়াই স্পন্দনের নিবৃত্তি হয় না। স্পন্দন উপযুক্ত বাহনের (Medium) সাহায্যে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া সম-জাতীয় বস্তুতে প্রতিস্পন্দন উৎপন্ন করে। ইহাই কর্ম্মের পরগত ফল। যেমন শব্দ; একটী বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করিলে কেবল যে সেই তন্ত্রীই স্পন্দিত হয় তাহা নহে; সেই আঘাত-জনিত স্পন্দন দিগন্তে প্রসারিত হইয়া অন্যান্য তন্ত্রীকেও স্পন্দিত করিয়া তুলে। এইরূপ আমাদের ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টা, চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া অপরের সম্বন্ধেও কার্য্যকারী হয়। ইহাই কর্ম্মের পরগত (objective) ফল।

আমাদের চেষ্টা (Action) যে অপরের ইষ্টকারী বা অনিষ্টকারী হয়, অপরকে সুভাবে বা কুভাবে স্পন্দিত করে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বস্তুতঃ চিরদিন ধর্ম্ম-শিক্ষকেরা সৎদৃষ্টান্তের সুফল এবং

অসৎ দৃষ্টান্তের কুফল কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু আমাদের ভাবনা ও বাসনাও কি অপরের সম্বন্ধে ফলপ্রদ হয়? অনেকে বিবেচনা করেন যে, আমাদের চেষ্টা যদি সৎ হয়, তবে ভাবনা ও বাসনা যতই অসৎ হউক না কেন, তদ্দ্বারা আমাদেরই অনিষ্ট হয়, অপরের কোন অনিষ্ট হয় না। এইরূপ সৎচিন্তা ও সুবাসনার দ্বারাও আমাদের নিজেদেরই ইষ্ট হইতে পারে, অপরের তাহাতে কোন ইষ্টাপত্তি নাই। মহাকবি মিল্টন (Milton) বলিয়াছেন যে, দেবতার ও মনুষ্যের চিত্ত কুবাসনা ও কুভাবনার হিল্লোলে আন্দোলিত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা স্থায়ী কোনও অনিষ্ট হয় না। এ মত সমীচীন নহে। যেমন শব্দের স্পন্দন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হইয়া প্রতিস্পন্দন উৎপন্ন করে, সেইরূপ ভাবনা ও বাসনার স্পন্দনও একের মস্তিষ্ক হইতে অপরের মস্তিষ্কে, এক জনের মন হইতে অন্য জনের মনে সঞ্চারিত হয়। ইহাকে Telepathy বা Thought Transference বলে। Thought Transference যে কাল্পনিক পদার্থ নহে, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকপ্রবর Sir Oliver Lodge, এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া Review of Reviews পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, thought transference সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার ফলে ইহার সত্যতা এরূপ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এখন ইহাকে বৈজ্ঞানিক তথ্য রূপে ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞানসভায় উপস্থিত করা যাইতে পারে। এক মস্তিষ্ক হইতে যে অপর মস্তিষ্কে চিন্তা সঞ্চারিত হয়, ইহাতে অ-বৈজ্ঞানিক কিছুই নাই। বিজ্ঞান এখন wireless telegraphy প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কেবল বিজ্ঞানশালায় পরীক্ষার জন্য নহে, সভ্য জগতের কার্য্যক্ষেত্রেও এখন wireless telegraphyর ব্যবহার চলিতেছে। বিনা তারযোগে সমুদ্রপারে সম্ভাষণ এখন নিত্যকার

ঘটনা। বিগত মহাযুদ্ধে wireless telegraphyর ভূয়ঃ প্রয়োগ হইয়াছিল। Telepathy আধ্যাত্মিক wireless telegraphy ভিন্ন আর কিছুই নহে। Wireless telegraphyতে যেরূপ একস্থলে Conductor বা চালক ও অন্যস্থলে Receiver বা ধারক যন্ত্র থাকে এবং আকাশ উভয়ের মধ্যে সংযোগতন্তুর প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সেইরূপ Thought Transferenceএও এক মস্তিষ্ক হয় চালক, অপর মস্তিষ্ক হয় ধারক, এবং উভয়ের মধ্যে ভাবনার বিনিময় চলিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের চিন্তা ও কামনা এক মন হইতে অন্য মনে সঞ্চারিত হইতে পারে। সুতরাং চেষ্টনার বিষয়ে আমাদিগের যেমন দায়িত্ব, বাসনা ও ভাবনার বিষয়েও সেইরূপই দায়িত্ব। কারণ, সুচিন্তা ও সুবাসনার দ্বারা যেমন আমরা অপরের ইষ্ট সাধন করিতে পারি, দুশ্চিন্তা ও দুর্ব্বাসনার দ্বারা সেইরূপ অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারি। ইহা হইতে বুঝা যায়, কিরূপে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ কার্য্যকর হয় এবং কেনই বা ধর্ম্মজ্ঞেরা শত্রুর সম্বন্ধেও দ্বেষ-হিংসার ভাব বর্জ্জন করিয়া মৈত্রী ও করুণার ভাব পোষণ করিতে বলিয়াছেন।* এইজন্যই যীশুখৃষ্ট শিষ্যাদিগকে বলিতেন যে, যদি কেহ কোন রমণীর সম্বন্ধে কামভাব পোষণ করে, তবে সে ব্যভিচার দোষে দোষী হয়। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ মনঃ-সংযমের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন এবং যাহারা বাহিরে ক্রিয়াসংযম করিয়া অন্তরে কামনা পোষণ করে, তাহাদিগকে মিথ্যাচার বলিয়াছেন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥—গীতা, ৩।৬

'যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করে, অথচ মনে মনে কামনার বস্তুকে ধ্যান

* এ সম্বন্ধে শ্রীমতী Annie Besant কৃত "Path of Discipleship" চতুর্থ অধ্যায়ে এবং Mr. C. W. Leadbeater কৃত "Introduction to Theosophy" গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা আছে।

করে, সেই মূঢ়ব্যক্তিকে কপটাচারী বলা যায়।' অতএব, দেখা যাইতেছে যে, ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার কেবল যে স্বগত (সংস্কার-রূপ) ফল হয়, তাহা নহে, ইহাদিগের পরগত ফলও আছে।

ইহা কর্ম্মের সাক্ষাৎ (Immediate) ফল। কর্ম্মের পরোক্ষ (Mediate) ফলও আছে। তাহাকে অদৃষ্ট বলে। আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা আমরা অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি। একজন অপরকে হত্যা করিল, অথবা তাহার প্রাণ রক্ষা করিল। ইহার ফলে হত বা রক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাহার একটি অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল। প্রথম স্থলে হত ব্যক্তির নিকট সে ঋণী হইল; দ্বিতীয় স্থলে রক্ষিত ব্যক্তি তাহার নিকট ঋণী হইল। চিত্রগুপ্তের চিরন্তন খাতায় এই দেনা পাওনার জমা খরচ রহিল। যতদিন না ঐ ঋণ উসুল হয়, ততদিন এই হিসাবের নিকাশ হয় না। হন্তাকে হত হইতে হইবেই; রক্ষিতকে রক্ষা করিতে হইবেই। এইরূপেই কর্ম্মের ফলভোগ হয়। যতদিন না ভোগ শেষ হয়, ততদিন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না,—কোটি কল্প বর্ষ অতীত হইলেও হয় না।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়,—তা সে কর্ম্ম সুকৃতই হউক, অথবা দুষ্কৃতই হউক। ভোগ ভিন্ন তাহার ক্ষয় নাই।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম বিনা ভোগাৎ ন তৎক্ষয়ঃ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৮৪.

সেইজন্য মহাভারতকার বলিয়াছেন—

যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি॥—শান্তিপর্ব্ব, ১৮১।১৬

'যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস আপন মাতাকে বাছিয়া লয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তাকে অনুসরণ করে।' অতএব কর্ম্মের হাত এড়াইবার

উপায় নাই। কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হইবেই। যেমন কৰ্ম্ম তেমনি ফলভোগ করিতে হইবেই। **As you sow, so you reap**; যেমন বীজ, তেমনি বৃক্ষ। আমড়া বীজ পুঁতিয়া আম্রফলের আশা অতিশয় দুরাশা। পুণ্য কৰ্ম্ম (সুকৃতের) ফল সুখ; পাপ কৰ্ম্ম (দুষ্কৃতের) ফল দুঃখ; এ নীতির কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। সেইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ—যোগদর্শন, ২।১৪

অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ।* ইহাই কৰ্ম্মফলের সাধারণ নিয়ম।

* জর্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) এই নিয়ম স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন—

of Practical Reason.

তৃতীয় অধ্যায়

—:*:—

কর্ম্মবিভাগ

আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষের আত্মা হইতে যে শক্তিত্রয় উৎসারিত হইতেছে, তাহাদিগের নাম জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। যে ক্রিয়াতে জ্ঞানশক্তির প্রকাশ, তাহার নাম ভাবনা (Thought); যে ক্রিয়াতে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ, তাহার নাম বাসনা (Desire); এবং যে ক্রিয়াতে ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ, তাহার নাম চেষ্টনা (Action)। ক্রিয়ারই নামান্তর কর্ম্ম। অতএব মানুষের কর্ম্ম ত্রিবিধ—ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা।

মানুষ ইহজন্মে অনেক কর্ম্ম করিতেছে। বহুসংখ্যক ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার সে কর্ত্তা। এই সমস্ত তাহার 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্ম। কিন্তু ইহজন্মই তো মানুষের প্রথম জন্ম নহে; মানুষ এবারের পূর্ব্বে আরও অনেকবার জন্মিয়াছিল। ইহজন্মের পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাহার অনেক অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

> বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!—গীতা, ৪।৫

'হে অর্জ্জুন! তোমার ও আমার বহু বহু জন্ম ব্যতীত হইয়াছে।'

ভগবান্ অর্জ্জুনের সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, প্রত্যেক জীবের সম্বন্ধেই তাহা বক্তব্য। আমাদের প্রত্যেকেরই বহু বহু জন্ম ব্যতীত হইয়াছে। সেই যে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম, সে সকল জন্মেও আমরা বহু বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার কর্ত্তা হইয়াছি। সেই

আমরাই আবার ইহজন্মে কর্ম্ম করিতেছি। অতএব যে জীব, ক্রিয়মাণ কর্ম্মের কর্ত্তা, সেই জীবই ঐ সকল প্রাক্তন কর্ম্মেরও কর্ত্তা। প্রাক্তন অর্থে পূর্ব্বতন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম।

আমাদের পূর্ব্বজন্মে কৃত বা ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হয় শুভ, না হয় অশুভ; হয় পুণ্য, না হয় পাপ; হয় সুকৃত না হয় দুষ্কৃত। আমরা জানিয়াছি যে, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়; তা' সে কর্ম্ম সুকৃতই হউক আর দুষ্কৃতই হউক।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভম্।

ভোগ ভিন্ন কর্ম্ম ক্ষয় হয় না।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

এক জন্ম কেন, কোটি কল্পকাল বহিয়া যাউক, যতক্ষণ না কৃত কর্ম্মের ভোগ হইতেছে, ততক্ষণ সে কর্ম্মের ক্ষয় নাই। যে জন্মে কৃত কর্ম্ম, যদি সেই জন্মেই তাহার ভোগ হইয়া যায় তবে ভালই; কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না। অল্প কর্ম্মই সেই জন্মে ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশই পরজন্মে ভোগের জন্য 'সঞ্চিত' হইয়া থাকে। এই অভুক্ত প্রাক্তন কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। অতএব কর্ম্মকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত।

ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে।

* *

অনেকজন্মসংজাতম প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্।

—দেবীভাগবত ৬।১০।৯, ১২

'ক্রিয়মাণ যে কর্ম্ম তাহাকে বর্ত্তমান কর্ম্ম বলা হয়। অনেক জন্মকৃত পূর্ব্বতন কর্ম্মকে সঞ্চিত বলে।'

এইরূপ প্রত্যেক মানুষেরই রাশি রাশি সঞ্চিত কর্ম্ম রহিয়াছে। সেই সকল কর্ম্মকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই জীব জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। যাহার সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছে, তাহার আর জন্ম হয় না। মানুষ জন্মিয়া পরিমিত কাল মাত্র জীবিত থাকে। মানবের আয়ুর পরিমাণ সাধারণতঃ শত বৎসরের অধিক নহে। বেদ বলিয়াছেন—"শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ"। এই কয় বৎসরের মধ্যে কয়জনের সহিতই বা তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে অসংখ্য জীবের সহিত সে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয় জনই বা ইহজন্মে বিদ্যমান রহিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে এবং কয় জনের সহিতই বা তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অথচ যাহার সহিত কর্ম্মসূত্রের যোগ—যে উপকার পাইয়া তাহার নিকট ঋণী, অথবা যাহার অপকার করাতে সে তাহার নিকট ঋণী হইয়াছে—তাহার সহিত সংযোগ না হইলে ত' সে কর্ম্মের শেষ হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক জন্মের মধ্যে, সঞ্চিত কর্ম্মের অত্যল্প অংশেরই ক্ষয় সম্ভব। সেইজন্য কর্ম্মের যাঁহারা বিধাতৃপুরুষ, তাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া এইরূপ যোগাযোগ করিয়া দেন যে, সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্রেরই ইহজন্মে ভোগ সমাধা হয়। এই নির্দ্দিষ্ট অংশের নাম 'প্রারব্ধ' কর্ম্ম। সঞ্চিত কর্ম্মরাশির মধ্যে যে কর্ম্ম-পুঞ্জ পরস্পর সমঞ্জস, যাহাদের একই স্থূলদেহে ভোগ সাধন সম্ভবপর, যাহা এক জীবনের মধ্যে ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে পারে—তাহাদিগেরই সমষ্টি 'প্রারব্ধ' কর্ম্ম। এই কর্ম্মভোগের নিমিত্ত তাহাকে এমন দেশের অধিবাসী করা হয়, যেখানকার ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, শাসননীতি প্রভৃতি তাহার প্রকৃতির অনুগুণ। সে এমন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, যে জাতির জাতীয় স্বভাব তাহার স্বভাবের অনুকূল। সে এমন বংশে উৎপন্ন হয়, যে বংশে সন্ততির নিয়মে তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির অনুরূপ

দেহ তাহার লাভ হইতে পারে। এইরূপে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের ব্যবস্থা হয়। প্রারব্ধ = প্র + আরব্ধ ; অর্থাৎ যে কর্ম্মের ভোগ আরব্ধ হইয়াছে।

> সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ৎ কিল।
> দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ॥
> প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং— —দেবীভাগবত, ৬।১০।৯, ১২

'সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট অংশ কাল নবজন্মের প্রাক্কালে ভোগের জন্য প্রেরণা করেন, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম।'

দেবীভাগবত অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

> পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
> স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ॥
>
> * *
>
> ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা॥
> ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে।
> তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মভিঃ পুনঃ॥
> যোজয়ত্যেব তং কালঃ * *—দেবী ভাগবত, ৪।২১।২২—৪

'দেহান্তে জীব স্বকৃত কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরক লাভ করে। সেই স্বর্গ বা নরকে তাহাকে নানা প্রকার ভোগ ভুগিতে হয়। পরে ভোগের অবসানে যখন তাহার পুনর্জ্জন্মের সময় হয়, তখন কাল সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলি কর্ম্মের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করে।' ইহাই 'প্রারব্ধ' কর্ম্ম।

এই ভাবে কর্ম্মের বিভাগ এইরূপ দাঁড়াইতেছে—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত কর্ম্ম যেন অপক্ক ফল—এখন ও ভোগের যোগ্য হয় নাই ; প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিপক্ক ফল—সে ফল ভোগের উপযুক্ত হইয়াছে। ইহজন্মের

যাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহা ভোগ করিতেই হইবে—ভোগ ভিন্ন তাহার ক্ষয় হইবে না।

প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।

সেই জন্য কেহ কেহ জ্যা-মুক্ত শরের সহিত প্রারব্ধ কর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন। যেমন ধানুকী যে তীর ছাড়িয়াছে, তাহা লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিবেই, সেইরূপ যে (প্রারব্ধ) কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ভুগিতেই হইবে।

যে জন্মে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে জন্মে সেই কর্ম্মের ভোগ হইতেছে, ইহার মধ্যে ত' প্রচুর ব্যবধান। দেশ, কাল, জাতির ভেদ সত্ত্বেও সেই কর্ম্ম ও তাহার ভোগের সহিত সংযোগ কিরূপে রক্ষিত হয়? ইহার উত্তর পতঞ্জলি ঋষি যোগসূত্রে এই ভাবে দিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, সাধারণ জীবের কর্ম্ম ত্রিবিধ।

ত্রিবিধমিতরেষাম্—যোগসূত্র, ৪।৭

কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ ও শুক্ল—জীবের এই ত্রিবিধ কর্ম্ম। পাপ, পুণ্য ও মিশ্র—কর্ম্মের এই তিন বিভাগ। যে জন্মে যে কর্ম্মের ভোগ হইবে, জীবের চিত্তক্ষেত্রে তাহার অনুগুণ বাসনার প্রকাশ হয়।

ততঃ তদ্বিপাকানুগুণানামেব অভিব্যক্তির্বাসনানাম্—যোগসূত্র, ৪।৮

অর্থাৎ 'যে জাতীয় কর্ম্মের যে বিপাক, তাহারই অনুগুণ বাসনার উদয় হয়। বিগুণ বাসনার উদয় হয় না। এইরূপে ভোগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।'

অতঃপর পতঞ্জলি বলিতেছেন :—

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপি আনন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োঃ একরূপত্বাৎ।

—যোগসূত্র ৪।৯

'কর্ম্ম ও ভোগের মধ্যে শত সহস্র জাতি, বহুদূর দেশ ও কল্প কালের ব্যবধান থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের আনন্তর্য্যের ক্ষতি হয় না, তথাপি তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যেহেতু,—স্মৃতি ও সংস্কার একরূপই থাকে।'*

* যথাঽনুভবাস্তথা সংস্কারাঃ। তে চ কর্ম্মবাসনারূপাঃ যথা চ বাসনা স্তথা স্মৃতি-রিতি জাতিদেশকালব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ। স্মৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কারা ইত্যে-বমেতে স্মৃতিসংস্কারাঃ কর্ম্মাশয় বৃত্তিলাভবশাদ্ব্যজ্যন্তে। অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্য্যমেব সিদ্ধমিতি।—৪।৯, যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ম্মভোগ

আমরা জানিয়াছি যে, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম দ্বিবিধ—পুণ্য ও পাপ। পুণ্যের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ। সেই জন্য পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন,—

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ।—২।১৪

ইহার ব্যাসভাষ্য এইরূপ ঃ—

তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলা অপুণ্যহেতুকা দুঃখফলা ইতি।

অর্থাৎ 'জীবের ভোগাদি পুণ্যজনিত হইলে সুখফল এবং পাপজনিত হইলে দুঃখফল হয়।'

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

যথা যথা কর্ম্মগুণং ফলার্থী করোত্যয়ং কর্ম্মফলে নিবিষ্টঃ।
তথা তথায়ং গুণ সংপ্রযুক্তঃ শুভাশুভং কর্ম্মফলং ভুনক্তি॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০১।২৩

'ফলাসক্ত জীব ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেমন যেমন কর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে সে সেইরূপ শুভাশুভ ফল ভোগ করে।' অর্থাৎ, সুকৃতের ফলে তাহার সুখভোগ হয় এবং দুষ্কৃতের ফলে তাহার দুঃখভোগ হয়।

অতএব, সুখলাভের একমাত্র উপায় ধর্ম্মাচরণ এবং দুঃখ অধর্ম্মাচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই জন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন ঃ—

সুখং হি জগতামেকং কাম্যং ধর্ম্মেন লভ্যতে।

জগতের একমাত্র কামনার বস্তু যে সুখ, তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই লাভ হয়।'

মহাভারতকারও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—

নাবীজাজ্জায়তে কিঞ্চিৎ নাকৃত্বা সুখমেধতে।
সুকৃতৈর্বিন্দতে সৌখ্যং প্রাপ্য দেহক্ষয়ং নরঃ॥—শান্তিপর্ব্ব,২৯১।১২

'বীজ না হইলে অঙ্কুর হয় না; সুকৃত ব্যতিরেকে সুখ হয় না। দেহধারী জীব সুকৃতেরই ফলে সুখভোগ করে এবং দুষ্কৃতের ফলে দুঃখ ভোগ করে।'

এই কর্ম্ম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে মানুষ আর সুখলাভে উৎফুল্ল এবং দুঃখ লাভে উদ্বিগ্ন হয় না। কারণ, সে তখন বুঝিতে পারে যে, সে নিজে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে স্বহস্তে যে বীজ রোপণ করিয়াছিল, ইহজন্মে তাহারই ফল ফলিতেছে মাত্র। ভোগ ভিন্ন যখন কর্ম্মের ক্ষয় নাই—(শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম বিনা ভোগাৎ ন তদ্‌ক্ষয়ঃ—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ), তখন দুঃখভোগে ধার শোধ হইল বলিয়া প্রফুল্ল হওয়াই উচিত; কারণ, যাহার যে ঋণ আছে, উত্তমর্ণ সুদ সমেত তাহার শেষ পাই অবধি উসুল করিবেই করিবে।

এই যে সুকৃত দুষ্কৃত, ইহার ফলভোগ কখন হয়? যে জন্মে সেই সমস্ত পুণ্য পাপের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই জন্মেই হয়, অথবা জন্মান্তরে? এ প্রশ্নের সাধারণ উত্তর এই যে, সে জন্মে হয় না, পর জন্মে হয়। সেইজন্য যাহাকে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলা হয়, অর্থাৎ ইহজন্মে কৃত কর্ম্ম, তাহার আর একটী নাম 'আগামী'। আগামী অর্থে যাহার ফল এখন হইবে না, পরে হইবে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন 'ফলতি গৌরিব'। কর্ম্ম ফলে কিরূপ? গৌঃ ইব। গো অর্থে পৃথিবী। পৃথিবীতে যেরূপ বীজ বপন করিলে তাহা সদ্যসদ্যই ফলবান্ হয় না, কিন্তু কালসহকারে সেই বীজ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও মুকুলিত হইয়া পরে ফল প্রসব করে, কর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ ইহজন্মে ফলে না, পরজন্মে ফলিয়া থাকে। তবে কর্ম্ম যদি

উৎকট হয়, তবে তাহার ভোগ ইহজন্মেই ভুগিতে হয়—তা' সে কর্ম্ম পুণ্যই হউক আর পাপই হউক। সেইজন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,

অত্যুৎকটৈঃপুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।

'পুণ্য কিম্বা পাপ উৎকট হইলে, তাহার ফল ইহজন্মেই ভোগ করিতে হয়।'

এই মর্ম্মে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন ঃ—

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ—যোগসূত্র, ২।১২

কর্ম্মাশয় অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম রাগদ্বেষমোহাদিমূলক; এবং ইহাদের ফল দৃষ্ট (ইহ) জন্মে কিম্বা অদৃষ্ট (পর) জন্মে প্রকাশিত হয়।

এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ ঃ—

তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রভবঃ স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ। তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভিঃ নির্ব্বর্ত্তিত ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানাম্ আরাধনাদ্ বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃ পুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে।

'অর্থাৎ 'এই যে ইহজন্মকৃত পাপ পুণ্য—যাহাদের মূলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি—তাহার ফল ইহজন্ম বা জন্মান্তরে জানা যায়। উৎকট পুণ্য সদ্যই ফলবান্ হয়; যেমন আত্যন্তিকভাবে মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির অনুষ্ঠান অথবা ঈশ্বর, দেবতা, ঋষি কিম্বা মহাত্মার আরাধনা। এইরূপ উৎকট পাপের সদ্য ফলভোগ হয়; যেমন পীড়িত, ভীত, আর্ত্ত ও শরণাগতের প্রতি অত্যাচার অথবা ঋষি-তপস্বীর প্রতি অপকার।'

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য ব্যাসভাষ্যে দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে—নহুষ ও নন্দীশ্বর। নহুষ ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করিয়া অভিমানে এরূপ অন্ধ

হইয়াছিল যে, সে অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিদিগকেও নির্য্যাতিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই উৎকট পাপের ফলে তাহার সদ্য অজগর দেহ লাভ হইল। এইরূপ নন্দীশ্বর দেবদেব মহাদেবের এরূপ উৎকট আরাধনা করিয়াছিল, যে তাহার মনুষ্য দেহের পরিবর্ত্তে ইহজন্মেই দেবত্ব লাভ ঘটিয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন রামায়ণে দশরথ ও সিন্ধুমুনি ঘটিত বৃত্তান্ত। দশরথ মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণে অন্ধমুনি-দম্পতির একমাত্র সম্বল বালক সিন্ধুকে বধ করেন; এই উৎকট পাপের ফল সেই জন্মেই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি পুত্র রামচন্দ্রের বনগমনের শোকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামায়ণে লিখিত আছে যে, ঐরূপ ঘটিবার কারণ, তাঁহার সিন্ধুবধ জনিত উৎকট পাপ। এইরূপ মহাভারতের বনপর্ব্বোক্ত সাবিত্রীর উপাখ্যানে আমরা উৎকট পুণ্যের সদ্য ফল ইহজন্মেই ফলিতে দেখিতে পাই। সাবিত্রী যখন সত্যবান্‌কে মনে মনে বরণ করিবার পর পিতার অনুমতি লইবার জন্য রাজধানীতে প্রতিগমন করেন, তখন দেবর্ষি নারদ ঘটনাক্রমে তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঋষি সত্যবানের নাম শুনিয়া সাবিত্রীকে এই বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, সত্যবান্ অশেষগুণে গুণান্বিত হইলেও অল্পায়ুঃ; তাঁহাকে বিবাহ করিলে বৎসরান্তে সাবিত্রীর বৈধব্য অনিবার্য্য। কিন্তু সাবিত্রী তাঁহার কথায় প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। তিনি দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যখন মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আর কাহাকেও এ শরীর দিতে পারিব না। পরে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ঋষির দৃষ্টি অভ্রান্ত; তিনি দিব্য চক্ষে সাবিত্রীর যে বৈধব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, বৎসরান্তে তাহাই ফলিল। অকালে সত্যবান্ কালের কবলিত হইলেন। যম তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র কারণ-দেহ পাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু সাবিত্রী ঐ বৎসরের মধ্যে

যে তীব্র ব্রতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অত্যুৎকট পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা ত' নিষ্ফল হইতে পারে না। সেই পুণ্যপুঞ্জের ফলে তাঁহার অদৃষ্ট-জনিত বৈধব্যের খণ্ডন হইয়া গেল। সত্যবান্ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সাধ্বীর সহিত মিলিত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত ধ্রুবচরিত্রেও আমরা এই সত্যের সাক্ষাৎ পাই। ধ্রুব বিমাতার বশীভূত পিতার আদর হইতে বঞ্চিত ছিলেন। একদিন পিতা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বিমাতার গঞ্জনার ভাগী করিয়াছিলেন। ইহাতে শিশু ধ্রুব মর্ম্মাহত হইয়া আপন মাতার সদনে যান। মাতা অনেক সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, জীব ইহজন্মে জন্মান্তর-কৃত পাপপুণ্যেরই ফল ভোগ করে। যাহার পুণ্য আছে সেই সিংহাসনে বসিতে পায়। দুর্ভাগার পুণ্যহীন পুত্রের এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? ইহাতে ধ্রুব গর্ব্ব সহকারে বলিয়াছিলেন যে, যদি পুণ্যের ফলেই উত্তম স্থান লাভ হয়, তবে তিনি এমন পুণ্যপুঞ্জ অর্জ্জন করিবেন এবং তাহার ফলে এমন সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করিবেন যে, তাঁহার পিতাও সে স্থান কখন পান নাই।

ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম।

ধ্রুব কার্য্যে তাহাই করিলেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন হরির ঐকান্তিক ভাবে আরাধনা করিয়া সর্ব্বোত্তম ধ্রুবলোক, যাহা দেবতাদিগেরও চিরবাঞ্ছিত, তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে উৎকট পুণ্যের ফল ইহজন্মেই ফলিল। অবশ্য এ সকল দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং ইহারা অত্যুৎকট পুণ্য পাপের নিদর্শন। সাধারণ নিয়মে এক জন্মের পাপ পুণ্যের ফলভোগ পর জন্মেই হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি

আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্মবাদ মূলতঃ ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুকৃতের ফলে সুখ ও দুষ্কৃতের ফলে দুঃখ—পুণ্যাত্মার পক্ষে সুখভোগ ও পাপীর পক্ষে দুঃখভোগ—ইহাই কর্ম্মের বিধান। এরূপ হওয়াই উচিত। কারণ, এ জগৎ বিধাতার সৃষ্টি; দৈত্যের রচনা নহে। ভগবানের রাজ্যে ন্যায়ের পথ, ধর্ম্মের পথ সুখদ হওয়াই সঙ্গত।

ইহা হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমরা যে সুখভোগ করি, তাহা পুণ্যের ফলে, এবং যে দুঃখ ভোগ করি, তাহা পাপের ফলে। কেহ যে দুঃখ পায়, সে দুঃখ যে তাহার আত্ম-দুষ্কৃত-বৃক্ষের ফল—এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নহে। তাহাই যদি হয়, দুঃখ যদি কর্ম্ম-জন্য, তবে দুঃখীর দুঃখমোচন কিরূপে উচিত হইতে পারে? এই যুক্তির বলে কেহ কেহ দুঃখীর দুঃখ মোচনে বিরত থাকেন। তাঁহাদের ভয় পাছে তাঁহাদের কৃত সাহায্য কর্ম্মফলের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। একটু বুঝিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। এ ধারণার মূলে অতি বৃহৎ স্পর্দ্ধা লুক্কায়িত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি বিধাতার কর্ম্মবিধানের ব্যত্যয় করিবে! সে নিয়ম অকাট্য, অলঙ্ঘ্য। মানুষ সহস্র চেষ্টায়ও তাহার এক তিল বিপর্য্যয় করিতে পারে না। যে দুঃখীর দুঃখমোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইলাম, যদি তাহার দুঃখের অবসান বা লাঘব বিধাতার অভিপ্রেত না হয়, তবে আমাদের সে চেষ্টা পণ্ড হইবে মাত্র। অতএব ইহাতে কর্ম্মফলের ব্যাঘাত ঘটিবার কোনই আশঙ্কা নাই। কিন্তু যদি তাহার দুষ্কৃতের শেষ

হইয়া থাকে, যদি কর্ম্মের বিধানমতে তাহার দুষ্কৃত-রাত্রির প্রভাত হইয়া থাকে, তবে তাহার দুঃখমোচনে সাহায্য করিয়া আমরা কর্ম্মের ব্যাঘাত করা দূরে থাকুক, সহায়তাই করিব. যাহার সাহায্য পাওয়া উচিত, কর্ম্ম-বিধাতা তাহাকে সাহায্য দিবেনই দিবেন। আমরা যদি সেই সাহায্যের দ্বার হইতে অস্বীকার করি, তবে তিনি অন্যের দ্বারা সেই সাহায্য করিবেন। লাভের মধ্যে আমরা পরোপকার-রূপ পুণ্য হইতে বিরত ও বঞ্চিত হইব। দুঃখীকে দেখিয়া তাহার দুঃখমোচন না করিলে আমরা দুষ্কৃত অর্জ্জন করিব। সাধ্য থাকিতে সাহায্য-প্রার্থীকে সাহায্য না করিলে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সাহায্যের পথে কণ্টক রোপণ করিব। আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা অলস বা উদাসীন থাকিলে বিধাতার কর্ম্মবিধান অচল হইবে। সাহায্য যাহার প্রাপ্য, সে পাইবেই; কেবল আমরা সাহায্যদাতার উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব মাত্র। অবশ্য যদি আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইতাম, যদি আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সেই দুঃখীর অতীত জীবনের চিত্রপট উন্মুক্ত থাকিত, যদি আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিতাম যে, কর্ম্মের বিধান মতে সে দুঃখীর কাল-রাত্রির অবসান হইতে এখনও বিলম্ব আছে, তবে অবশ্য তাহার দুঃখমোচনের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা হইতে বিরত থাকাই আমাদের উচিত হইত। কিন্তু আমরা অজ্ঞ, আমরা ত' সর্ব্বজ্ঞ নহি। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহাদের ঐ রূপ অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাহারা অনেক সময়ে ব্যর্থ সাহায্যের বিফল. চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন বটে; কিন্তু আমাদের পক্ষে তাঁহাদের সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আর এক কথা। পাপের ফলে যদি দুঃখই সুনিশ্চিত, তবে পাপীর সমৃদ্ধি হয় কেন? কুচরিত্র কুক্রিয়াসক্ত লোকও ঐশ্বর্য্যশালী হয় কেন? এ দৃশ্য ত' বিরল নহে যে, চরিত্রহীন দুষ্ক্রিয়ারত ব্যক্তি ধনরত্নের অধীশ্বর হইয়া সেই অর্থের অপব্যয় করিতেছে, আর সুশীল সদ্বৃত্ত ব্যক্তি অর্থাভাবে অশেষবিধ

কষ্ট ভোগ করিতেছেন। এরূপ হয় কেন? কর্ম্মবাদের মূলে যদি ধর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এ দৃশ্য বিরল হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা ত' হয় না। ইহার সামঞ্জস্য কি?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহার এইরূপ সমাধান করিতে চান। ইহলোকে পাপপুণ্য ও সুখদুঃখের সামঞ্জস্য হয় না বটে। সেই জন্যই পরলোকের প্রয়োজন। পরলোকে পুণ্য ও সুখ এবং পাপ ও দুঃখের যথাযথ সামঞ্জস্য হয়। তুলাদণ্ডের ওজনে পাপের সমান দুঃখ ও পুণ্যের সমান সুখ জীবকে সঠিক ভোগ করিতে হয়। ইহার এক তিল, এক রতি ব্যত্যয় হয় না। ইউরোপে ক্যাণ্ট (Kant) ও নিউম্যান (Newman) এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ক্যাণ্ট বলেন যে অনেক সময়েই দেখা যায় বটে যে, জগতে পুণ্যের সহিত দুঃখ জড়িত রহিয়াছে, এবং পুণ্যের অভাব সুখলাভের অন্তরায় হইতেছে না, অথচ জগতের নৈতিক বিধানের অনুসারে এরূপ হওয়া অনুচিত; এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য আমাদিগকে মানিয়া লইতে হয় যে দেহান্ত হইলেও আত্মা জীবিত থাকে এবং পরলোকে পাপ, পুণ্য ও দুঃখ সুখের সামঞ্জস্য বিধান হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, ক্যাণ্ট্ এই বিশ্বাসকে 'ব্যাবহারিক বুদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ' (Postulate of Practical Reason)—এই আখ্যা দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকের এই উত্তর কি সদুত্তর? কর্ম্মবাদের সহিত ধর্ম্মনীতির কি অন্যরূপে সামঞ্জস্য করা যায় না? আমরা কর্ম্মের ভোগ আলোচনা করিবার সময় যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে। জন্মান্তরে যে অপরকে সুখ দিয়াছে, কর্ম্মের বিধানে ইহজন্মে সুখ তাহার ন্যায্য প্রাপ্য—ইহার সহিত তাহার চরিত্রের বা আশয়ের (Motive) কোন সম্বন্ধ নাই। আশয়ের ফলে—যদি সে দুরাশয় হইয়া কাহাকেও সুখ দিয়া থাকে, তবে তজ্জন্য

তাহার প্রকৃতি মলিন হইবে বটে—কিন্তু সুখ প্রদানের বিনিময়ে সুখের আদানে সে কেন বঞ্চিত হইবে? এইরূপ যদি কেহ শুভ ইচ্ছা ও আশয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়াও ফলতঃ অপরকে দুঃখ দিয়া থাকে, তবে তাহার ফলে তাহার প্রকৃতি মলিন হইবে না বটে, কিন্তু তাহার পক্ষে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। মনে করুন কোন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। কত লোক অনাহারে মুমূর্ষু হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময়ে একজন দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া নহে, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা বশে নহে, কিন্তু উপাধি-ব্যাধির তাড়নায় সেই সকল অনশন-ক্লিষ্ট আতুর অনাথ দিগকে ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল বিপুল পরিমাণে বিতরণ করিল। তাহার আশা যে, ঐরূপ করিলে সে রাজার নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। এই দুষ্ট আশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সে এই পুণ্য অর্জ্জন করিল। ইহার ফল কিরূপ হইবে? এই দুরাশয়চালিত আচরণে তাহার স্বভাব অবশ্যই আরও মলিন হইবে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই হউক, সে যখন বহুলোককে পার্থিব সুখ দিয়াছে, তখন কর্ম্মের বিধানমতে সেও জন্মান্তরে পার্থিব সুখের উপকরণ সমূহের (ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধির) অধিকারী হইবে। যে পরিমাণ লোককে যতটা পার্থিব সুখ দিয়াছে, তাহারই অনুপাতে তাহার পার্থিব সমৃদ্ধির পরিমাণ হইবে। একজন দুষ্ট, কারবারে লাভবান হইবে বলিয়া ধানের চাষ করিল। তাহার আশয় দুষ্ট বলিয়া কি ধান্যের বীজ অঙ্কুরিত হইবে না? কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে ভাবেই ভাবিত হইয়া হউক, যে আশয়েই প্রণোদিত হইয়া হউক, অপরকে সুখদান রূপ বীজ যে জন্মান্তরে বপন করিয়াছে, ইহজন্মে তজ্জন্য সুখ ফল তাহার অবশ্য প্রাপ্য। কারণ যে ভূমিকায় (plane) শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও সেই ভূমিকাতেই হয়। অপরকে পার্থিব সুখে সুখী করিলে নিজেরও পার্থিব সুখ মিলিবে। উদ্দেশ্য, আশয়

পার্থিব ভূমিকার বস্তু নহে। তাহার ক্রিয়া সূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম-জগতেই তাহার প্রতিক্রিয়া হয়।

অন্যপক্ষে মনে করুন, একজন বৈজ্ঞানিক দেশে মারীভয় প্রবল হইয়াছে দেখিয়া অনেক চিন্তা ও গবেষণা করিয়া একটা ঔষধ আবিষ্কার করিলেন এবং সদাশয়-প্রণোদিত হইয়া অনেককে সেই ঔষধ সেবন করাইলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য শুভ হইলেও ফল বিপরীত ঘটিল। সেই ঔষধের ক্রমের ভুলে অনেক নিরীহ লোক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। সেই বৈজ্ঞানিক অপরকে যে দুঃখ দিলেন, সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইলেও তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই। একদিকে শুভ আশয় ও পরোপকার কবিবার সদুদ্দেশ্যের ফলে তাঁহার স্বভাব উন্নত হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপরকে পার্থিব দুঃখ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পরজন্মে দুঃখভোগ করিতে হইবে।

একই কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন আশয়ে করিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের দুঃখমোচন দুরাকাঙ্ক্ষা-তাড়িত হইয়াও করা যায় আবার অনাবিল করুণাব বশবর্ত্তী হইয়াও করা যায়। এই দুই ব্যক্তি পার্থিব হিসাবে একই কাজ করিলেন। উভয়েই বহু দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়া, বহু ব্যক্তিকে পার্থিব সুখ দিলেন। তাহার ফলে পরজন্মে উভয়েই পার্থিব সম্পদে সম্পন্ন হইবেন। কিন্তু একজনের শুভাশয়, আর অপরের দুরাশয় —ইহারও ফল সূক্ষ্ম ভূমিকায় ফলিবে। একজন সুচরিত্র, আর একজন দুশ্চরিত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। উভয়েই সমৃদ্ধিশালী হইবে বটে, কিন্তু যে দুরাশয় সে পার্থিব সমৃদ্ধির মধ্যে থাকিয়াও সন্তোষ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। আর যে শুভাশয় সে সমৃদ্ধির উপরে যে উচ্চতর সুখ—শান্তি ও সন্তোষ, সেই সুখের অধিকারী হইবে।

এইরূপ অপরকে পার্থিব দুঃখের ভাগী করিবার স্থলেও শুভাশয় ও

দুরাশয়ের তারতম্য দৃষ্ট হয়। যে বৈজ্ঞানিক শুভাশয়-প্রণোদিত হইয়া কেবল আকস্মিক ভ্রমের ফলে অপরকে পার্থিব দুঃখ দিয়াছে, আর যে বৈজ্ঞানিক দুরাশয়ের প্রেরণায় অপরকে নৃশংসও নির্দ্দয় ভাবে পার্থিব যাতনা দিয়াছে—পরজন্মে এ দুই জনের অবস্থা তুল্য হইবে না। যে শুভাশয় সে পরজন্মে পার্থিব দুঃখ ভোগ করিবে বটে, কিন্তু শুভাশয়-জনিত চরিত্রের উন্নতির ফলে সেই দুঃখের মধ্যেই সে সহিষ্ণুতা ও সন্তোষ অর্জ্জন করিয়া দুঃখকে অসহ্য গুরুভার মনে করিবে না। আর যে দুরাশয়, তাহার পার্থিব দুঃখ ত' হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্রের ফলে সে দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া দুঃখভার আরও গুরু করিবে, এবং তাহার ফলে তাহার প্রকৃতি মলিন হইতে মলিনতর হইতে থাকিবে। এই ভাবে কর্ম্মের সাম্য রক্ষিত ও সামঞ্জস্য বিহিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম্মের বিপাক

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবাত্মার তিন শক্তি—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ কামনায় (Desire), জ্ঞান-শক্তির প্রকাশ ভাবনায় (Thought) এবং ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ চেষ্টনায় (Action)। কামনার নাম কাম, ভাবনার নাম ক্রতু এবং চেষ্টনার নাম কৃতি। অতএব কর্ম্ম ত্রিধা (Three-fold)। এ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথা-কামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। যৎক্রতু-র্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে। যৎকর্ম্ম কুরুতে তদ্ অভিসম্পদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

"অর্থাৎ জীব কামময়। তাহার যেরূপ কামনা, সে তদনুযায়ী চিন্তা করে। যেরূপ চিন্তা করে, তদনুরূপ কার্য্য করে। যেরূপ কার্য্য করে, তদনুসারে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে এক জন্মের কামনা, ভাবনা ও কার্য্যদ্বারা পরজন্ম নিয়মিত হয়। এই নিয়মের প্রকার ও প্রণালী কিরূপ?

প্রথমতঃ কামনা বা বাসনা। এক জন্মের বাসনা কিরূপে পর জন্ম নিয়মিত করে?

এক কথায় বলিতে গেলে কামনা জীবকে কাম্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত করে।*

* Desires carry the man to the place where the objects of desire exist and thus determine the channels of his future activities.

—*Sanatana Dharma Text Book, p. 112.*

স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্—বৃহ ৪।৩.১২

যেখানে কাম্য বস্তু, জীব সেইখানে যায়। মুণ্ডক উপনিষদ্ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ, স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।—৩।২।২

'জীব যে সকল কাম্য বস্তুর কামনা করে, কামনার ফলে সে সেইখানে জন্মায়।'

তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি।

লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য—বৃহ, ৪ ৪।৬

'যাহার মন যাহাতে আসক্ত, কর্ম্ম তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যায়।'

স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত—কেহ সকামভাবে স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ করিল। তাহার ফলে দেহান্তে সে স্বর্গলোকে নিশ্চয়ই গমন করিবে—কারণ, তাহার কাম্যবস্তু স্বর্গসুখ।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্

অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব-ভোগান্—গীতা, ৯।২০

এমতে সেই স্বর্গধামে সে বহু দেবভোগ (স্বর্গসুখ) আস্বাদন করিল। পরে?

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।—গীতা, ৯।২১

সে সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আবার ফিরিয়া আসে। কেন? বৃহদারণ্যক ইহার উত্তর দিয়াছেন।

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ং।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥

ইতি নু কাময়মানঃ।—৪।৪।৬

'স্বর্গলোকে তাহার কৃত কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে সে পুনরায় ইহলোকে—এই কর্ম্মভূমিতে ফিরিয়া আইসে। এইরূপই কামনার ব্যাপার।'

'বৌদ্ধেরা এই কথা আর এক ভাষায় বলেন। তাঁহারা বলেন, জীবের স্বর্গভোগ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিত্তে তন্হার উদয় হয়। তন্হা তৃষ্ণার পালি অপভ্রংশ। তৃষ্ণা = কামনা। স্বর্গের সূক্ষ্মতর সুকুমার ভোগে আর তাহার তৃপ্তি হয় না—এই পৃথিবীর হৃদ্যতর স্থূলতর ভোগ্যাভোগের তৃষ্ণা তাহার মধ্যে জাগরিত হয়। তাহার ফলে—স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্—যেখানে ঐরূপ ভোগের সংস্পর্শ সম্ভব, কামনার দ্বারা সে সেই স্থানে নীত হয়। যত দিন চিত্তে কামনা থাকিবে, ততদিন ঐ কাম তাহাকে কাম্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত করিবেই করিবে। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন—কামনার সংকোচ কর, তৃষ্ণার ক্ষয় কর—কারণ,

যৎতু কামসুখং লোকে, যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

'এই লোকের যে ভোগ-সুখ এবং স্বর্গের যে উচ্চতর সুখ—সে সুখদ্বয় তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের ষোল ভাগের এক ভাগও নহে।'

অবশ্য এ বাসনা-বর্জ্জন ধীরে ধীরে করিতে হইবে—স্থূল ভোগের স্থলে সূক্ষ্মতর সুকুমারতর ভোগ বসাইতে হইবে, ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার করিতে হইবে—ক্রমশঃ ধারণা করিতে হইবে—

যে তু সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে—গীতা

'বিষয়-ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ জনিত সুখ মাত্রেই দুঃখোদর্ক'—ন তেষু রমতে বুধঃ—সে সুখে বুদ্ধিমানের সন্তোষ হইতে পারে না। জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে এই ধারণা ক্রমশঃ চিত্তে নিবিড় ভাবে বদ্ধমূল হইবে। তখন

এমন এক দিন আসিবে, যখন—শুধু কামনার ভোগ নহে, বাসনার 'রস' পর্য্যন্ত তাহার চিত্ত হইতে উন্মূলিত হইবে।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥—গীতা

তখন উপনিষদের ভাষায়—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
তদা মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥—বৃহ, ৪।৪।৭

হৃদিস্থিত সমস্ত কামনা নিঃশেষিত হইলে মর্ত্ত্য মানুষ অমরত্ব লাভ করিবে—ব্রহ্মবিন্দু জীব ব্রহ্মসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভাবনা (চিন্তা বা ক্রতু)। ভাবনা কিরূপে পরজন্ম নিয়মিত করে? এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ লিখিয়াছেন—

অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে
পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।—৩।১৪।১

'জীব ক্রতুময়। ইহলোকে সে যেরূপ চিন্তা করে, দেহান্তে (ইতঃ প্রেত্য) সে সেইরূপ হয়।'* গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—যো যৎশ্রদ্ধঃ স এব সঃ। এক কথায় বলিতে গেলে—আমাদের যে স্বভাব বা চরিত্র, তাহা পূর্ব্ব জন্মকৃত চিন্তার ফল অর্থাৎ আমাদের পরজন্মের প্রকৃতি পূর্ব্ব জন্মের ভাবনার দ্বারা নিয়মিত হয় (Thoughts build

---

* ধম্মপদ এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

All that we are is the result of what we have thought, it is founded on our thoughts, it is made up of our thoughts.

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট তাঁহার Ancient Wisdom গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The mental faculties of each successive life are made by the thinkings of the previous lives."

character)। কথাটা আমাদের চরিত্র গঠনের পক্ষে এত দরকারি যে, এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উপনিষদে জীবকে 'হংস' বলা হইয়াছে।

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে—শ্বেতাশ্বতর

কবীর এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

শুন হংসা! পুরাতন বাত।
কোন মুলুক্‌সে আয়সি হংসা
উৎরঙ্গে কোন ঘাট।

হংসের সহিত জীবের তুলনা করিবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। ব্যোমবিহারী হংস যেমন পৃথিবীর মাটীতে অবতীর্ণ হইয়া আহার সংগ্রহ করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিবার পর তাহার নিজ ধাম বিমানমার্গে উড্ডীন হয়, জীবও সেইরূপ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিত্তের খাদ্য "চিন্তা" আহরণ করে এবং ঐ ব্যোমবিহারী হংসের ন্যায় তাহার নিজ ধাম স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়া যেখানে সেই আহৃত চিন্তা পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করে। এইরূপে জীব পুষ্ট ও পীন হয়।*

আমরা এক ঘণ্টায় যাহা আহার করি, তাহা পরিপাক করিতে অন্ততঃ ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে। দৈহিক পরিপাকের যে নিয়ম, আত্মিক পরিপাকেরও ঐ নিয়ম। ৬০।৭০ বৎসরে আমরা ভূলোকে যে চিন্তা-

---

* The devachanic life is one of assimilation, the experiences collected on earth have to be worked into the texture of the Soul. and it is by these that the Ego grows : its development depends on the number and variety of the Mental Images it has formed during its earthly life

—*Karma. page* 36.

খাত্ত আহরণ করি, দেবলোকে তাহা পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করিতে অন্ততঃ ৫০০।৬০০ বৎসর সময় লাগে। সেই জন্য জীবের পৃথিবীবাসের তুলনায় তাহার স্বর্গবাস অনেক দীর্ঘকাল স্থায়ী।

এই পরিপাকের প্রণালী কি? দু' একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বিশদ হইতে পারে—ধরুন, ইহ জন্মে কেহ বৈজ্ঞানিক বা বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার প্রায়াস করিল। সে মেধাবী বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি নহে, সাধারণ রকমের মস্তিষ্ক লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। গভীর বা নিবিড় ভাবে চিন্তা করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। অথচ জ্ঞানের পিপাসা, প্রকৃত জিজ্ঞাসা তাহার মধ্যে বেশ সংধুক্ষিত হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটিল। যে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া কিছু দিন কামলোকে অবস্থান করিবার পর স্বর্গলোকে উপনীত হইল। সেখানে সে দুর্ব্বল মস্তিষ্কের বাধা বিমুক্ত হইয়া, সেই সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার সংস্কার লইয়া পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান করিতে লাগিল—সেই সকল অৰ্দ্ধস্ফুট চিন্তার ছবি তাহার চিত্তে বার বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই অনুধ্যানের ফল কি হইল? সেই পূর্ব্ব জন্ম কৃত চিন্তার সংস্কার ক্রমশঃ চিন্তার শক্তি ও সামর্থ্যে আকারিত হইয়া তাহার চিত্ত-সম্পদে পরিণত হইল। *

স্বর্গ ভোগের পর যখন সে জন্মান্তর গ্রহণ করিল তখন সেই উপচিত চিন্তা শক্তি তাহার নিজস্ব সম্পত্তিরূপে প্রকাশ পাইল। এবং পূর্ব্ব জন্মে যে সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের নিকট তাহার চিত্ত ব্যাহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইত, পরজন্মে সেই সকল তত্ত্ব তাহার পক্ষে সুগম ও অনায়াস-লভ্য হইল।

---

* By this transformation they cease to be Mental Images created and worked on by the Soul, and become powers of the Soul, part of its very nature. —*Karma page 37.*

আর একটা দৃষ্টান্ত ধরুন—ইহ জন্মে কেহ দয়াপ্রবণ প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—লোক-হিতৈষণা তাহার লক্ষ্য, কিন্তু সে দরিদ্র ও অক্ষম। সুযোগের অভাবে এবং সহায় ও সম্পদের অভাবে তাহার লোকহিত-মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইল। সে সেই সকল হিতৈষণা-ব্রতকে আকার দান করিয়া মূর্ত্ত করিতে পারিল না। এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। সে সেই অতৃপ্ত লোকহিতৈষণা লইয়া স্বর্গ লোকে উপস্থিত হইল। সে সেই স্বর্গলোকে সংকল্পের সাহায্যে সেই সকল অফল হিত-ব্রতকে কাল্পনিক আকার দিয়া সবল ও সফল করিতে লাগিল। ইহাতে কেবল যে তাহার হিতৈষণা বৃত্তি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইল তাহা নহে, ঐ সকল পরিকল্প বা Schemes কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনাও প্রবলতর হইয়া উঠিল; এবং যখন সে পরজন্মে পুনরায় স্থূলশরীর ধারণ করিল, তখন ঐ সকল ব্রতকে সাফল্য দান করিবার সুযোগ তাহার করতলগত হইতে লাগিল।

সু-চিন্তা ও সু-ভাবনা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, কু-চিন্তা ও কু-বাসনা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। কেহ অতৃপ্ত কামুকতা বা লোলুপতা লইয়া দেহত্যাগ করিল। পরকালে ঐ কামের ও অর্থগৃধ্নুতার চিত্র তাহার চিত্তে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে তাহার কামপ্রকৃতি ও লোভপ্রকৃতি প্রবলতর হইয়া সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে। সুখের বিষয় বিধাতার বিধানে এমনটা প্রায়ই হয় না। কারণ, ইহ জীবনে যে অবাধে কাম বা লোভ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে তাহাকে কামলোকে অনেক ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। গ্রীক পুরাণের সিসিফস ও টেণ্টালাসের গল্পে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে। আমাদের পুরাণে বর্ণিত নরকযন্ত্রণা ইহারই অনুরূপ কথা। সেই জন্য রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা মৃত্যুর পর একটা Purgatory'র কল্পনা করিয়াছেন। অগ্নিদগ্ধ হইলে স্বর্ণের শ্যামিকা বিদূরিত হইয়া যেরূপ বিশুদ্ধি সাধিত হয়, ঐ

নরকাগ্নি জীবের সম্বন্ধেও সেইরূপ বিশুদ্ধি সাধন করে। তাহার ফলে আমাদের ইহ জন্মের অভিজ্ঞতা 'প্রাজ্ঞতায়' এবং পাপকর্ম্মের আনুষঙ্গিক যাতনা বিবেকে (Conscienceএ) পরিণত হয়। *

বিধাতার এমনই মঙ্গল-বিধান যে, কোন কিছুই বিফলে যায় না। এমন কি পাপ ও ব্যর্থতাও তাঁহার মঙ্গল-করের স্পর্শলাভ করিয়া ধর্ম্মের আকার পরিগ্রহ করে।

তৃতীয়তঃ, চেষ্টনা বা কৃতি (Action)। কৃতির দ্বারা কিরূপে আমাদের পরজন্ম নিরূপিত হয় ? এ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি—বৃহ, ৪।৪।৫

যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার তেমনি ফল। এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া মহাভারত বলিয়াছেন ;—

যথা যথা কর্ম্মগুণং ফলার্থী
করোত্যয়ং কর্ম্মফলে নিবিষ্টঃ।
তথা তথায়ং গুণসংপ্রযুক্তঃ
শুভাশুভং কর্ম্মফলং ভুনক্তি ॥—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব

অর্থাৎ সকাম ফলার্থী ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করে, সে তদনুরূপই শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। যেমন বীজ বপন করা যায়, বৃক্ষ তাহার অনুরূপই হয়। সেইজন্য খৃষ্টানেরা বলেন, As you sow, so you reap। মহাভারতকারও বলিয়াছেন—

নাবীজাৎ জায়তে কিঞ্চিৎ

* Thus far we see as definite principles of Karmic Law, working with Mental Images as causes, that :

Aspirations and desires become capacities : repeated thoughts become tendencies ; wills to perform become actions ; experiences become wisdom ; painful experiences become conscience.

অর্থাৎ একজন্মের চেষ্টনা বা কৃতির ফলে পর জন্মের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়মিত হয় (Actions make Environment)। পতঞ্জলি যোগ দর্শনে এই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন—

সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।—যোগ সূত্র, ২।১৩

অর্থাৎ এজন্মের কৃত কর্ম্মের বিপাকে পরজন্মের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা ইহজন্মে যে সকল কর্ম্ম করিতেছি তাহা দ্বারা অপরের সুখ বা দুঃখ, ইষ্ট বা অনিষ্ট, হিত বা অহিত সাধিত হইতেছে। তাহার ফল কিরূপ হইবে? আমি যাহার অনিষ্ট করিলাম সে আমার উত্তমর্ণ হইল এবং আমি যাহার ইষ্ট করিলাম সে আমার অধমর্ণ হইল। এইরূপে হয় আমি তাহার নিকট ঋণী হইলাম, না হয় সে আমার নিকট ঋণী হইল। ইহার ফলে কোন্ দেশে আমি জন্মগ্রহণ করিব, কোন্ কুলে, কোন্ যুগে, এবং ঐরূপে জন্মিয়া আমার আয়ু কতদিন হইবে, এবং আমার ভোগ বা অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। কর্ম্মবিধাতারা ঐ নির্দ্ধারণ সংঘটিত করেন। সেই নির্দ্ধারণের প্রণালী বুঝিতে হইলে আমাদের দু'একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কর্ম্মের সহিত জাতিগত কর্ম্মের সম্পর্ক কি তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা ঐ বিষয়ের আলোচনা করিব।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যক্তিগত ও জাতিগত কর্ম্ম

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মের বিপাক আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, পূর্ব্বজন্মের চেষ্টা বা কৃতির (Actionএর) ফলে পর জন্মের পরিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment) অর্থাৎ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ নিয়মিত হয়।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র, ২।১৩

এ নিয়মনের প্রকার ও প্রণালী কি? ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন

গহনা কর্ম্মণো গতিঃ

'কর্ম্মের গতি-নির্দ্ধারণ অতি দুরূহ'। অথচ এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমাদের উপায় নাই।

একজন সাধু আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্মবিপাকের প্রকার বুঝাইবার জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে কয়েকজন জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যবনিকা উত্তোলন করিয়া তাহাদিগের ঘটনাবলি তাঁহার নেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। বায়স্কোপের জীবন্ত চিত্রাবলী যেমন রঙ্গমঞ্চের উপর দর্শকের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়, ইহাও সেইরূপ হইয়াছিল। তখন ঐ সাধু শ্রীগুরুর কৃপায় অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, কি বীজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে উপ্ত হইয়া পর জন্মে কি বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিল—কি কারণ-কূট জন্মান্তরে প্রবর্ত্তিত হইয়া পরবর্ত্তী জন্মে কি কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। বস্তুতঃ দিব্যদৃষ্টি বলে অনেকগুলি নরনারীর 'পূর্ব্বজাতি বিজ্ঞান'

না হইলে * কর্ম্মের গহন গতি নির্দ্ধারণ একরূপে অসম্ভব। তথাপি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এই দুর্ব্বোধ্য বিষয় কতকটা বিশদ হইতে পারে।

মহাভারতের উদ্‌যোগ-পর্ব্বে ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডীর কাহিনী অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ভীষ্মের পিতা শান্তনু দাসরাজকন্যা সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলে, দাসরাজ ভীষ্মকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়েন যে, জ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি নিজে রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিবেন এবং পাছে বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদন করিলে ভবিষ্যতে সেই পুত্র রাজ-সিংহাসনের দাবি করে, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন। পিতার অনুরোধে ভীষ্ম এই কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলে তবে দাসরাজ সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ দেন। ঐ বিবাহের ফলে শান্তনুর ঔরসে সত্যবতার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ প্রথমে হস্তিনাপুরের রাজা হন এবং তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞার অনুসারে রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার রক্ষক ও চালকরূপে বিচিত্রবীর্য্যের অভিভাবকতা করিতে থাকেন। ক্রমে বিচিত্রবীর্য্য যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিবাহযোগ্য হইলে ভীষ্ম তাঁহার জন্য যোগ্য পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন যে কাশিরাজের তিনটি অপূর্ব্বরূপবতী কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বয়ম্বরা হইবেন।

* এই 'পূর্ব্বজাতি বিজ্ঞান' যে অযৌক্তিক বা অসম্ভব নহে দ্বিতীয় খণ্ডে জন্মান্তরের আলোচনায় আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে তত্ত্ববিদ্যামণ্ডলী হইতে প্রকাশিত Lives of Alcyone—Two volumes পাঠ করিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে ব্যক্তি বিশেষের ৪৮টি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে।

তিনি ঐ স্বয়ম্বর সভায় উপনীত হইয়া তখনকার প্রথানুসারে ঐ তিন কন্যাকে বাহুবলে হরণ করিলেন। অবশ্য ঐ সভায় শাল্ব প্রভৃতি অনেক বীর্য্যবান্ রাজা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ভীষ্মের দর্পিত আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কেহই ভীষ্মের বীর্য্যবহ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারিলেন না। ভীষ্ম সমস্ত রাজাকে পরাভূত করিয়া ঐ তিনটি কুমারীকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরে উপনীত হইয়া ভ্রাতার জন্য জননী সত্যবতীকে ঐ তিনটি কন্যারত্ন উপহার দিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের সহিত কন্যাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইবে স্থির হইল। তখন জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ব্রীড়ানম্র মুখে ভীষ্মকে বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন—তিনি কিরূপে বিচিত্রবীর্য্যকে পতিরূপে গ্রহণ করিবেন ?

ভীষ্ম এই কথা শুনিয়া অম্বাকে সসম্ভ্রমে শাল্বরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। অম্বা বিনীত ভাবে শাল্বের নিকট সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। শাল্ব বলিলেন যে, ভীষ্ম যখন বীর্য্যমূল্যে তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। অম্বা পুনঃ পুনঃ বলিলেন, আমি অন্যপূর্ব্বা নহি, আপনি আমায় গ্রহণ করুন। কিন্তু সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে সেইরূপ শাল্ব অম্বাকে পরিত্যাগ করিলেন।

তামেবং ভাবমানাং তু শাল্বঃ কাশিপতেঃসুতাম্
অত্যজত্তরত শ্রেষ্ঠ ! জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ ॥—উদ্যোগপর্ব্ব, ২০।

তখন অম্বা অতি দীনমনে কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে শাল্বের রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ভীষ্মই তাঁহার সমস্ত বিপত্তির কারণ। অতএব যুদ্ধ দ্বারাই হউক বা তপঃ প্রভাবেই হউক ভীষ্মকে ইহার প্রতিফল দিতেই হইবে।

সা ভীষ্মে প্রতিকর্ত্তব্যা নাহং পশ্যামি সাম্প্রতম্।
তপসা বা যুধা বাপি দুঃখহেতুঃ স মে মতঃ ॥

অম্বা বৈরনির্য্যাতনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে তাপসগণের আশ্রমে উপনীত হইলেন। ঐখানে ঘটনাক্রমে তাঁহার মাতামহের সহিত অম্বার সাক্ষাৎ হইল। মাতামহ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, "ভীষ্মকে পরাভূত করিতে পারে পরশুরাম ভিন্ন এমন বীর আর কেহই নাই। অতএব তুমি পরশুরামের শরণাপন্ন হও।" অম্বা তাহাই করিলেন। পরশুরাম তাঁহার কাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। অম্বা বলিলেন, "আমি অন্য কিছুই চাহি না, আপনি সেই নীচাশয় ভীষ্মকে সংহার করুন।"

ভীষ্মং জহি মহাবাহো যৎকৃতে দুঃখমীদৃশম্।

তখন পরশুরাম উপায়ান্তর না দেখিয়া অম্বাকে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মকে অনুমতি করিলেন যে, "শাল্বরাজ যখন ইহাকে গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।" ভীষ্ম ইহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ভীষ্মে ও পরশুরামে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কয়েক দিন যুদ্ধ হইল, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তখন পরশুরাম অম্বাকে বলিলেন, "হে ভামিনি! আমি যথাসাধ্য পৌরুষ প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারি নাই। অতএব আমি আর কি করিতে পারি?" তখন রোষাকুলিতলোচনা অম্বা পরশুরামকে বলিলেন, "আপনি যাহা পারিলেন না, আমি তাহা পারি কি না দেখি, আমি নিজে ভীষ্মকে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত করিব।"

গমিষ্যামি তু তত্রাহং যত্র ভীষ্মং তপোধন!
সমরে পাতয়িষ্যামি স্বয়মেব ভৃগূদ্বহ ॥

এই বলিয়া অম্বা রোষকষায়িত লোচনে ভীষ্মের বধসাধন উদ্দেশ্যে তপস্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। অম্বা যমুনাতীরস্থ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ

করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। অম্বার আত্মীয়গণ এবং সিদ্ধতাপসগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অম্বা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, ভীষ্মকে বিনাশ না করিয়া আমি কদাচ নিবৃত্ত হইব না।

নাহত্বা যুধি গাঙ্গেয়ং নিবর্ত্তিষ্যে তপোধনাঃ।

কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার সাধনার সিদ্ধি হইল। স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন।

হনিষ্যসি রণে ভীষ্মং পুরুষত্বঞ্চ লপ্স্যসে।
দ্রুপদস্য কুলে জাতা ভবিষ্যসি মহারথঃ॥

তখন অম্বা বৃহৎ চিতা রচনা করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন এবং রোষদীপ্ত চিত্তে ভীষ্মবধের ভাবে ভাবিত হইয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

চিতাং কৃত্বা সুমহতীং প্রদায় চ হুতাশনম্।
প্রদীপ্তেঽগ্নৌ মহারাজ রোষদীপ্তেন চেতসা।
উক্ত্বা ভীষ্মবধায়েতি প্রবিবেশ হুতাশনম্॥

ইহার ফলে কি হইল? অম্বা কিছু দিনের মধ্যেই দ্রুপদরাজের পুত্র শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের সাহায্যে ভীষ্মের হত্যাসাধন করিয়া সেই পূর্ব্বজন্মকৃত বৈর চরিতার্থ করিলেন। এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, আমরা গীতাতে ভগবানের মুখে শুনিয়াছি—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

'যে যে ভাবে বিশেষভাবে ভাবিত হইয়া দেহ ত্যাগ করে, জন্মান্তরে সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কর্ম্মের বিপাক সাধিত হয়।

তত্ত্ববিদ্যামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি ছত্রপতি শিবাজির পূর্ব্ব জন্মের ঐরূপ একটা কাহিনী বলিতেন। ঐ কাহিনী সত্য হইলে আমরা বর্ত্তমান যুগে ঐ ভীষ্ম-অম্বা ঘটিত ব্যাপার আবার প্রত্যক্ষ করি।

সে কাহিনী এইরূপ—ডোলগুর্কি নামে রুষ-রাজবংশের এক নিকট আত্মীয়, জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া রাজসম্মান ও বিষয়-বৈভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে এসিয়ার নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন। ঐ দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি তিব্বতে কোন সিদ্ধযোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং যোগ বিষয়ে কয়েকখানি দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। কিছুদিন দিল্লীতে অবস্থানের পর কয়েকটি অসহিষ্ণু গোঁড়া মুসলমানের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহারা তাঁহাকে নানারূপে উৎপীড়িত করে। বাদশাহের নিকট আবেদন করিয়াও তিনি কোন প্রতীকার প্রাপ্ত হয়েন না ; এমন কি মুসলমানেরা তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সেই গ্রন্থগুলি অগ্নিদগ্ধ করে। ইহাতে ডোলগুর্কি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করেন এবং মহাভারতোক্ত অম্বার ন্যায় বৈর-নির্য্যাতন ভাবে ভাবিত হইয়া যে অগ্নিতে তাঁহার প্রাণাধিক গ্রন্থগুলি ভস্মীভূত হইয়াছিল সেই অগ্নিতে নিজের শরীরকে আহুতি প্রদান করেন। এই ডোলগুর্কি নাকি পরে শিবাজিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজি মহারাজ ইতিহাস-পরিচিত ব্যক্তি। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন কি কৌশল, ঐকান্তিকতা, উদ্যম ও নিষ্ঠার সহিত তিনি তাঁহার জীবনব্রত মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত জীবনপ্রভাতের মধ্যাহ্ন কিরূপে মোগলসাম্রাজ্যকে বিলোড়িত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এখানেও আমরা কর্ম্মবিপাকের একটি প্রকার লক্ষ্য করিতে পারি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকায় একটী সত্যমূলক কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল ঐ কাহিনী হইতেও কর্ম্মের অনুগুণ বিপাক লক্ষ্য করা যায়। কেহ যদি একজন্মে নিকট আত্মীয়কে (যাহার প্রতি সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য) অবজ্ঞা ও অনাদর করে, তবে, অসম্ভব নহে যে, পরজন্মে সেই অবজ্ঞাত আত্মীয়ই তাহার বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এবং তাহার হৃদয়ের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া নয়নের মণি হইবে, এবং অকালে তাহার সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে অপার শোকসাগরে ভাসাইয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে।*

'থিয়সফিষ্ট' পত্রে প্রকাশিত ঐ গল্প হইতে আমরা কর্ম্মের এই বিপরিণাম বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

গল্পটী এই :—মহারাষ্ট্র প্রদেশের পার্ব্বত্য ভূভাগে এক দস্যু দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ঘটনাক্রমে একদিন এক বণিক্ প্রচুর ধন-রত্ন লইয়া সেই গিরি-সঙ্কট দিয়া দেশে ফিরিতেছিল। সে দস্যুর কবলে পড়িয়া প্রাণনাশের ভয়ে তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, এবং নিজের সমস্ত ধন-রত্নের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু নিষ্ঠুর দস্যু তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিল না এবং নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার সমস্ত সম্পদ্ হস্তগত করিল। কালে বহু বিত্তের অধিকারী হইয়া সেই দস্যু দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সম্পন্ন গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করিতে লাগিল। সে অপুত্রক ছিল; বৃদ্ধ বয়সে তাহার এক সুকুমার পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র বৃদ্ধ পিতার প্রাণের পুত্তলি হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ বহু ব্যয়ে

* If an Ego treats unkindly or neglects one to whom he owes affectionate duty and protection, or service of any kind, he will but too likely again find himself born in close relationship with the neglected one and perhaps tenderly attached to him, only for early death to snatch him away from the encircling arms.—*Karma.*

তাহার লালন পালন ও বিদ্যাভ্যাস করাইল। ক্রমে তাহার বিবাহের বয়স হইলে একটী সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল। বৃদ্ধের যেন সকল সাধ পূর্ণ হইল। তাহার হৃদয়ে আশার উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে দৈবাৎ সেই পুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইল। বৃদ্ধ বহু ব্যয় করিয়া প্রধান প্রধান বৈদ্য ডাকাইয়া এবং বিচক্ষণ দৈবজ্ঞের দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া তাহার রোগমুক্তির অশেষবিধ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে সকলেই তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।

ঐ সময় একদিন রোগী যেন কিছু স্বস্তি বোধ করিল। পিতার মুখ হর্ষে উৎফুল্ল হইল, সে স্নেহভরে পুত্রের শয্যাপ্রান্তে গিয়া উপবিষ্ট হইল। পুত্র ইঙ্গিত দ্বারা জানাইল যে, পিতার সহিত তাহার কিছু গোপনীয় কথা আছে। তখন সমস্ত অনুচর ও চিকিৎসকগণকে সরাইয়া দেওয়া হইল। সেই নির্জ্জন গৃহে পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা আমাকে চিনিতে পারেন কি ?" পিতা ভাবিলেন পুত্র প্রলাপ বকিতেছে। তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "সে কি বাবা! তোমাকে আমি চিনি না ? তুমি আমার প্রাণের ধন।" পুত্র বলিল, "তা নয়, আপনার সে দিনের কথা মনে পড়ে কি ? যে দিন অমুক গিরি-সঙ্কটে অমুক বণিক্‌কে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন ?" বৃদ্ধের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, "এ কি! ইহাকে ঐ কথা কে শুনাইল ?" সে প্রকাশ্যে বলিল, "বাবা, ও সকল কি বলিতেছ ? বৈদ্যকে ডাকিব কি ?" পুত্র বলিল, "দেখুন, আমার আর বিলম্ব নাই। যাইবার আগে শেষ কথাটা বলিয়া যাই। আমি সেই বণিক্ যাহাকে তুমি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছিলে। সেই বণিক্‌ই তোমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছিল। আমার জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত আমার জন্য যত টাকা

ব্যয় করিয়াছ হিসাব করিলে দেখিবে যে, উহার পরিমাণ সেই বণিকের নিকট হইতে অপহৃত ধনের সমান। এখন আমি চলিলাম। সেই টাকার সুদ আদায়ের জন্য আমার বালিকা পত্নীকে রাখিয়া গেলাম। ইহাকে আজীবন পালন করিও।" এই বলিয়া পুত্র নয়ন মুদ্রিত করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এই গল্প সত্য হউক বা কাল্পনিক হউক, ইহা একজন্মকৃত কর্ম্মের কিরূপে পরজন্মে বিপাক হয়, তাহার সুন্দর উদাহরণ।

এই হত্যার ব্যাপারের ফলাফল একটু আলোচনা করা যাউক। কর্ম্ম বিপাকের সাধারণ বিধি এই যে, 'হন্তা হতেন হন্যতে', অর্থাৎ হন্তা হত ব্যক্তির দ্বারা হত হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, হত ব্যক্তি স্বহস্তে হন্তাকে হনন করিবে—তবে সে হন্তার মৃত্যুর নিদান বা নিমিত্ত হইবেই হইবে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, চিকিৎসকের ভ্রমে বা কম্পাউণ্ডারের অনবধানে ঔষধের বিপর্য্যয় ঘটিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটিল। এ হত্যা অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু কর্ম্মজনিত। এখানেও সেই নিয়ম—'হন্তা হতেন হন্যতে।' এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Theosophical Rev-iew পত্রে একটি চমৎকার গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পের শিরোনামা—"Teller of Drolls"। গল্পটি এই—

অতীত যুগে সমুদ্রপারের এক দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বাহুবলে অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। ঐ-সকল বিজিত ক্ষুদ্র রাজ্যের একটী রাজ্য আচার, ধর্ম্ম ও সভ্যতার হিসাবে বিজেতৃ-রাজ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সম্রাট্ ঐ দেশ শাসনের জন্য তত্রত্য একজন নায়ককে নিযুক্ত করেন। সম্রাটের আশয় ও উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না, কিন্তু তিনি উদ্ধত ও আত্মাভিমানী লোক ছিলেন, এবং প্রবল জিদের বশবর্ত্তী হইয়া সেই বিজিত দেশকে নিজের প্রবর্ত্তিত প্রথাতে পরিচালিত

করিতে বাধ্য করেন। ইহার ফল যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইল। প্রজারা উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সম্রাটের প্রতিনিধি সেই নায়ক তাঁহাকে নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি নিজের নির্দ্দিষ্ট পথ কোনরূপেই পরিত্যাগ করিলেন না। তখন সেই নায়ক কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া সেই বিদ্রোহী প্রজাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। সম্রাট্ প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া বিদ্রোহদমনের জন্য অভিযান করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিদ্রোহী দলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি, সেই নায়ককে বন্দী করিলেন। বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে নীত হইল এবং অশেষ প্রকারে নিজের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিল। কিন্তু সম্রাট্ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি নির্দ্দয় ও নৃশংস ভাবে সেই নায়ককে হত্যা করিলেন। তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেই সম্রাট্ ও সেই নায়ক ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল প্রদেশে জন্মান্তর গ্রহণ করিল। এইবার সম্রাট্ একজন প্রবল প্রতাপ জমিদার হইলেন—নাম স্যার রিচার্ড রোস্‌ভেন্ (Sir Richard Rosven),এবং সেই নায়ক হইলেন উলিয়্যান পেনালুনা (Wiliān Penaluna) নামক একজন উচ্চস্তরের কৃষকপুত্র। কৃষিকার্য্য তাহার ভাল লাগিত না—সে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিয়া রাজপুতনার চারণদিগের ন্যায় কথা ও কাহিনী বলিয়া বেড়াইত। গ্রামবাসীরা তাহাকে আদর যত্ন করিত, তাহার বাগ্মিতায় ও গল্পকুশলতায় মোহিত হইত এবং অজ্ঞাতে তাহার পক্ষপাতী হইত।

রোসভেন যে গ্রামের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ছিলেন, সেই গ্রামের মধ্য দিয়া একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। ঐ নদীতে কোন সেতু ছিল না। শুকারুখার সময় লোকে হাঁটিয়া নদী পারাপার হইত, কিন্তু বর্ষার প্লাবন আসিলে পার হইতে গিয়া দুই চারি জন প্রতি বৎসরই মারা যাইত। তথাপি কেহ সেতু রচিবার প্রয়াস করিত না।

২০০ বৎসর পূর্ব্বে এক জমিদার নাকি ঐস্থানে সেতু রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস সে চেষ্টার ফল বড় বিষময় হইয়াছিল—গ্রামে মহামারী দেখা দিয়া অর্দ্ধেক গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছিল। ঐ ক্ষুদ্র নদীর যে জলদেবতা, তিনি নাকি সেতু দেখিয়া অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন—ঐরূপ সেতু বাঁধিলে যে, তাঁহার বার্ষিক বলি বন্ধ হইবে! রোসভেন অবশ্য এ সকল কুসংস্কার মানিতেন না। তিনি জিদ্ ধরিলেন ঐ নদীতে সেতু বাঁধিবেনই—গ্রামবাসীর কুসংস্কারকে পদদলিত করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিবেন। গ্রামের মধ্যে আতঙ্কের তুফান বহিতে লাগিল—সমস্ত প্রজার চিত্তে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। গ্রামবাসীরা উলিয়ানকে নায়ক করিয়া সেই আসন্ন বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইবার আশায় তাঁহাকে রোসভেনের নিকট দূত করিয়া পাঠাইল। উলিয়ান জমিদারকে অনেক বুঝাইলেন, কিছু কিছু ভয় দেখাইবারও ক্রটী করিলেন না; কিন্তু কোন মতেই রোসভেনের জিদ হটাইতে পারিলেন না। বিফলমনোরথ হইয়া উলিয়ান অপ্রসন্ন চিত্তে ফিরিয়া চলিলেন। তিনি এক নির্জ্জন উপবনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"জমিদার জিদ ধরিয়াছেন, সেতু বাঁধিবেনই, কিন্তু তাহার ফলে প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিবে—খুব সম্ভব তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগাইবে, মহা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবে—শত শত লোক খুন জখম হইবে। ইহার কি কোন উপায় নাই? আছে! জিদী জমিদারের প্রাণ-নাশ! হত্যা—নরহত্যা? বটে, কিন্তু নিরুপায়! এ ত হত্যা নয়—এ যে অত্যাচারীর দমন, দুর্বৃত্তের শাসন! এ যে শত শত নিপীড়িতের অব্যাহতি—এ যে মুক্তি! আর এই মুক্তির নিমিত্ত—উলিয়ান!"

উলিয়ান আর বিলম্ব করিল না। এক শাণিত ছুরিকা সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে জমিদারের প্রাসাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। বাড়ীর খিড়কি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে জমিদারের বালিকা ভাগিনেয়ীর চক্ষে পড়িয়া গেল।

বালিকা তাহাকে চিনিত। উলিয়ানকে দেখিয়াই গল্প শুনাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। রোসভেন নিকটেই ছিলেন—মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, উলিয়ান। ইহাতে তিনি প্রসন্ন হইলেন না, কিন্তু বালিকা ভাগিনেয়ীর নির্বন্ধ এড়াইতে পারিলেন না। উলিয়ান গল্প বলিতে প্রবৃত্ত হইলে চকিতে হঠাৎ তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির কপাট খুলিয়া গেল—সে গল্পচ্ছলে সেই পূর্ব্ব সম্রাট্ ও নায়কের কাহিনী বলিয়া গেল। রোসভেন মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—তাঁহার মনে হইল তিনিই বুঝি সেই জিদী সম্রাট, আর গ্রামবাসীরা সেই অত্যাচারিত প্রজাপুঞ্জ—উলিয়ান তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, "উলিয়ান! সেই পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়াই কি ছুরিকা হস্তে প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছ?" উলিয়ান অস্বীকার করিতে পারিল না। তখন দুইজনে ধীরভাবে আর একবার বুঝা পড়া হইল। জমিদার নিজের ভ্রম বুঝিলেন—জিদ করিয়া লোকমত দলিত করিয়া প্রজার হিতসাধন সম্ভব নহে, তাহা বুঝিলেন। সেতু বন্ধন স্থগিত হইল। উলিয়ান তাঁহার বন্ধুরূপে প্রধান অমাত্যের পদে বৃত হইলেন। পূর্ব্ব বৈরের হিসাব নিকাশ হইয়া গেল। কিন্তু 'হন্তা হতেন হন্যতে।' ইহার কিছু দিন পরে সেই নদীতে প্রবল বন্যা আসিল। উলিয়ান্ ঘটনাক্রমে স্রোতে পড়িয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম করিলে রোসভেন্ জলে ঝম্প দিয়া তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু নিজে তলাইয়া গেলেন। জল-দেবতা সে দিন ঐ শ্রেষ্ঠ বলি পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন কি?

এ গল্পের মধ্যে আমরা দুইটি তত্ত্ব বিবৃত দেখিলাম—প্রথম, 'হন্তা হতেন হন্যতে'; দ্বিতীয়, কর্ম্মের জের কিরূপে নিঃশেষ করিতে হয়। বুদ্ধদেব এই মর্ম্মে একটি কাহিনী বলিয়াছেন। দুই রাজবংশের মধ্যে বংশানুক্রমে একটা শোণিত-কলহ (blood-feud) প্রচলিত ছিল। এ বংশের যে

প্রধান, সে ও বংশের প্রধানকে ছলে বলে কৌশলে হত্যা করিত। প্রতিশোধে হত রাজার বংশধর হন্তা রাজাকে হত্যা করিত। তাহার প্রতিশোধে শেষোক্ত রাজার বংশধর তাহার পিতৃহন্তাকে হত্যা করিত। এইরূপে যখন বহু পুরুষ ধরিয়া এই উপচীয়মান শোণিত-কলহ চলিয়া আসিয়াছে—তখন এবারে যাঁহার হন্তা হইবার পালা, তাঁহার মনে হইল, "আচ্ছা, বংশপরম্পরায় ত এইরূপ চলিতেছে—আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ মরিয়াছেন এবং মারিয়াছেন। কিন্তু ততঃ কিং—কি লাভ হইয়াছে? যাউক, আমি এবার প্রতিশোধ লইব না—এখানেই কুলক্রমাগত বিরোধের অবসান হউক।" তাহাই হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যখন তাঁহার দ্বন্দী রাজার সাধু সঙ্কল্প অবগত হইলেন, তাঁহার চিত্তও অনুতাপে ব্যথিত হইল। তিনি উপযাচক রূপে সন্ধিস্থাপন করিয়া শত্রুকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

হত যদি হন্তার প্রতি বৈরিভাব পরিহার করিয়া হন্তাকে ক্ষমা করিতে পারে, তবেই তাহাদের মধ্যে দেনা পাওনার জের মিটিয়া যায়। কর্ম্মের বিধানে হত হন্তার মৃত্যুর অনিচ্ছাকৃত নিমিত্ত হইলেও উভয়ের মধ্যগত ঋণ উন্মূল হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

কর্ম্মের বিপাক সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপার আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরের সেবা ও উপকার করিবার সুবিধা ও সুযোগ কখনই অবহেলা করা উচিত নহে। যে কেহ ঐরূপে অবহেলা করে, তাহাকে জন্মান্তরে অনেক ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। তাহার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রতিপদে ব্যাহত হয়, তাহার উচ্চ আশা প্রায়শঃ ধূলায় লুণ্ঠিত হয় এবং তাহার জনহিতৈষণা শক্তির ও সামর্থ্যের অভাবে নিষ্ফলতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হয়। *

* Wasted opportunities reappear transmuted as limitations of the instrument and as misfortunes in the environment * * * The wasted op-

কেহ কেহ জন্মান্ধ, হইয়া অথবা জন্মসিদ্ধ পঙ্গুতা, জড়তা বা উন্মত্ততা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেন এরূপ হয়? কি পাপের এই বিষম পরিণাম? কর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, আত্মাপরাধ-বৃক্ষেরই এই বিষময় ফল। যাহারা পাপপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় প্রাকৃতিক বিধি উল্লঙ্ঘন করে, কিম্বা ব্যাধিত, পীড়িত, আর্ত্ত, ভীত, বা শরণাগতের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করে, পরজন্মে তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। কর্ম্মদেবতারা তাহাকে এমন বংশে লইয়া যান, এমন কুক্ষিতে প্রবেশ করান, এমন বীজে জন্ম দেন, যেখানে ঐরূপ ব্যাধি উত্তরাধিকার-সূত্রে সন্ততিতে সংক্রামিত হইতে পারে। তাহার ফলে সে সহজাত অন্ধতা, বধিরতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, জড়তা, উন্মত্ততা প্রভৃতি দোষ লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সারাজীবন সেই পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের নিশান বহন করে। †

এতক্ষণ আমরা ব্যক্তিগত কর্ম্মের আলোচনা করিলাম। অতঃপর জাতিগত কর্ম্মের বিপাক-প্রণালীর আলোচনা করিব।

জাতি ব্যক্তির সংহতি—একজাতিভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে যুতসিদ্ধ সংযোগ (Organic Unity), তাহাই জাতি। যেমন ব্যক্তিগত কর্ম্ম আছে, তেমনি জাতিগত কর্ম্ম আছে। যখন একজাতি সংহতভাবে অন্য

---

portunities are transformed into frustrated longings, into desires which fail to find expression, into yearnings to help blocked by the absence of power to render it, whether from defective capacity or from lack of occasion—*Karma*, *P*. 52.

‡ Congenital defects result from a defective etheric double and are life-long penalty for serious rebellions against law, or for injuries inflicted upon others * * * So again from their just administration of the Law come the in-wrought tendency to reproduce a family disease, the suitable configuration of the etheric double and the direction of it to a family in which a given disease is hereditary—*Karma P.* 31.

জাতির উপকার করে বা অপকার করে, তাহার হিত বা অহিত কল্যাণ, বা অকল্যাণ, উন্নতি বা অবনতি সম্পন্ন করে, তখন সে জাতির সেই কর্ম্ম জাতীয় কর্ম্ম। এইরূপে একজাতির সহিত অপর জাতির কর্ম্মবন্ধন গ্রথিত হয়—ঐ গ্রন্থিতে এক জাতি অপর জাতির সহিত কর্ম্মসূত্রে জড়িত হয়। ব্যক্তিগত কর্ম্মের ন্যায় জাতিগত কর্ম্মেরও ফলভোগ করিতে হয়। কারণ, 'না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম'। কিরূপে জাতীয় কর্ম্মের বিপাক হয়?

দুই জাতির সংস্পর্শে যেখানে কর্ম্ম-ঋণের আদান প্রদান হইয়াছে সেখানে একজাতি অন্যজাতির উত্তমর্ণ। এই কর্ম্ম-ঋণ উম্মূল করিবার জন্য কর্ম্মদেবতাগণ ঐ দুই জাতিকে পরস্পর সংযুক্ত করেন। যেমন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ। যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যার্থে এদেশে প্রথম আগমন করে, তখন আরও কয়েকটি প্রবল ইউরোপীয় জাতি এই দেশে প্রবিষ্ট হইয়া কুঠিয়ালি করিতেছিল। তাহাদের অনেকেরই, বিশেষতঃ ফরাসীদিগের, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজ্যবিস্তার করে, সে সম্বন্ধে বৃটিশ রাজপুরুষদিগের এবং বৃটিশ জাতির আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অথচ বিধাতা ঘটনাচক্র এমন ঘূর্ণিত করিলেন যে, অনেকটা বাধ্য হইয়াই ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইল। এ সম্বন্ধের শেষ পরিণাম কি হইবে তাহা আমরা এখনও জানি না। তবে এ সম্বন্ধ যে জাতীয় কর্ম্মের বিপাক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র 'সত্যানন্দের' গুরুর মুখ দিয়া এ সম্বন্ধের আশু ফল বিবৃত করিয়াছেন।

কোন কোন তত্ত্বদর্শীর মুখে শুনিয়াছি যে, ইংরেজ-জাতি বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিগ্রো-জাতির দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়া যে পুণ্যপুঞ্জ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষাৎ পুরস্কার এই ভারত-সাম্রাজ্য। দুষ্কৃতির দ্বারা সুকৃতি ক্ষয় করা যায়, সুযোগের অসদ্ব্যবহার করিলে

দুর্যোগের উদয় হয়, সুদিনে সংযত ও সংহত না হইলে সুদিন দুর্দিনে পরিণত হয়। ইংরাজদিগের জাতীয় কবি কিপ্‌লিং একদিন স্বজাতিকে সাবধান করিয়াছিলেন—'Lest we forget'—'ভ্রাতৃগণ! উদ্‌ভ্রান্ত হইও না'। আমিও ইংরাজ-জাতিকে সতর্ক হইতে বলি। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এদেশে অনেক অত্যাচার-অনাচার ঘটিয়াছিল—ভারতবাসীকে অনেক নির্য্যাতন নিপীড়ন সহিতে হইয়াছিল। ঐ সকল কাহিনী ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নহে। ঐ সকল জাতীয় পাপের ফলে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব পুণ্য বহুল পরিমাণে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও সময় থাকিতে তাঁহারা ভারতে স্বরাজ স্থাপন করিয়া ভারতবাসীর উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথ উন্মুক্ত করুন। কারণ, বিধিরোষ বড়ই ভয়ানক বস্তু, বিধাতার কোপ-কষায়িত দৃষ্টিপাতে সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়। ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন্ তাঁহার ডায়ারিতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"I am in dread of the judgment of God upon England for our national iniquity towards China."

অর্থাৎ "চীন জাতির সম্পর্কে (আফিং ঘটিত) আমাদের জাতীয় দুষ্কৃতির জন্য আমি বিধিরোষের ভয়ে শঙ্কিত হইয়াছি।" চীনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গ্ল্যাডষ্টোন্ যাহা বলিলেন ভারতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও সে কথা বলা চলে। অতএব ইংলণ্ড অবহিত হউন।

এই জাতীয় দুষ্কৃতির কিরূপ শোচনীয় বিপরিণাম ঘটে, শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট তাহার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ বিবৃত করিয়াছেন।* ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন স্পেনের সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্য আকাশে দেদীপ্যমান, এবং স্পেন সমগ্র পাশ্চাত্য মণ্ডলের অগ্রণী ছিল, এই সময় বিধাতা স্পেনকে

*See Mrs. Annie Besant's "Evolution of Life and Form"—Ch. II.

একটা অতুল সুযোগের ভাগী করিলেন। কলম্বসের উত্তম ও সাহসিকতার ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত এবং ক্রমশঃ নির্জ্জিত ও অধিকৃত হইল। তখন আমেরিকার বিপুল বৈভব এবং বিরাট ভূভাগ স্পেনের করতলে আসিল। কিন্তু স্পেন এই সুযোগের কি সদ্ব্যবহার করিল? যাঁহারা মেক্সিকো ও পেরু-বিজয়ের শোক-কাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্পেনের অমানুষিক অত্যাচার ও আসুরিক দুর্ব্ব্যবহারে পীড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। স্পেনের এই আসুরিক অত্যাচারে একটা প্রাচীন, নিরীহ, নিরপরাধ, শান্ত, শিষ্ট, সরল জাতি অকালে ধ্বংসের মুখে পতিত হইল। তাহাদের সেই সুকুমার সভ্যতা, শিল্প, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। এইরূপে স্পেন একটা উৎকট দুষ্কৃতি অর্জ্জন করিল। চিত্রগুপ্তের খাতায় তাহার নামে একটা বিরাট্ দেনার অঙ্ক পড়িয়া গেল। এই কর্ম্মের কি বিপাক হইল? কারণ, 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম।' শতাব্দীর পর শতাব্দী বহিয়া গেল। যে আমেরিকাকে স্পেন পর্য্যুদস্ত ও পদদলিত করিয়াছিল, সেই আমেরিকায় এক নূতন জাতির অভ্যুদয় হইল। সে জাতি মার্কিন জাতি। তাহারা ইংলণ্ড হইতে বিযুক্ত হইয়া নূতন যুক্ত-রাজ্য স্থাপন করিল এবং সমৃদ্ধিতে ও সভ্যতাতে গরীয়ান্ হইয়া উঠিল। কাল পূর্ণ হইলে এই জাতির সহিত স্পেনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাহার ফলে স্পেনে ও আমেরিকায় তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। স্পেন পদে পদে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পরাজিত হইল এবং অবশেষে আমেরিকা হইতে বিতাড়িত হইয়া কোনরূপে রক্ষা পাইল। এখন তাহার সেই বল-বিক্রম, সেই দর্প-দম্ভ, সেই লম্ফ-ঝম্প কোথায়? অতীত যুগে সে যাহাকে নিপীড়িত করিয়াছিল, এখন বিধাতা তাহারই হস্তে তাহাকে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত করিলেন। জাতীয় কর্ম্মের এই রূপেই বিপাক নিষ্পন্ন হয়। বিধাতার চক্র এই প্রকারেই প্রবর্ত্তিত হয়।

এইভাবে দেখিলে আমরা ভারতবর্ষের যুগ-ব্যাপী পরাধীনতার মধ্যে

একটা প্রচ্ছন্ন কর্ম্মসূত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই। বিধাতার এ কি বিচিত্র লীলা যে, সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া আমাদের এই পুণ্যভূমি বিদেশীর অবজ্ঞাত পাদপীঠ হইয়াছে। যবন, শক, হূন, পারশিক, পাঠান, মোগল, আফগান, ফরাসী, দিনেমার, ইংরেজ—কত বিজেতারই বিজয়প্লাবন এই দেশের বক্ষের উপর বহিয়া গেল! কতরূপে ভারতবাসী লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত, অপমানিত ও অত্যাচারিত হইল! কি দুষ্কৃতের জন্য, কি জাতীয় দুর্ব্বিপাকে ভারতের এই দুর্দ্দশা?

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে মনে হয়, আমাদের আর্য্য পূর্ব্ব-পিতৃগণ এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া সে যুগের 'নেটিভ' অনার্য্যদিগের প্রতি যে নির্য্যাতন ও নিপীড়ন করিয়াছিলেন, আমরা এতদিন ধরিয়া সেই জাতীয় অপকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। ঐ সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিয়াছেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ!
যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে
দিনে দিনে তাদেরি সমান।

জানিনা কতদিনে আমাদের এই দুষ্কৃত কালরাত্রির অবসান হইবে!*

* এ সম্বন্ধে আমি ১৯০৬ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত Philosophy of the Gods গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছিলাম—

I sometimes think that the fallen condition of the Hindu nation is the 'Karmic' retribution for the treatment, in the past, of the Non-Aryan races of India whom they had conquered. From Alexander the Great to Lord Clive, how many nations came and conquered India, oppressed and pillaged her, trod her under foot and denuded her of her treasure! And the last act of the drama is not yet complete; the bad karma of India is still being worked out.

আমাদের পুরাণাদিতে নারদের যে সকল 'কাণ্ডমাণ্ড' দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, এই জাতীয় কর্ম্মের বিপাক ব্যাপারে—জাতি জাতির মধ্যে কর্ম্ম-ঋণের আদান প্রদানে ও সমীকরণে—নারদের একটা বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে ; কিন্তু সে বিষয় এবং কর্ম্ম বিধাতারা কিরূপে জটিল কর্ম্মসূত্রের গ্রন্থি-মোচন করেন, সে প্রসঙ্গ আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ম্ম-বিধাতা

কর্ম্ম-বিপাকের প্রসঙ্গে আমরা একাধিক বার কর্ম্মবিধাতার উল্লেখ করিয়াছি। ইনি বা ইঁহারা কে ?

আমাদের বাংলা দেশে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার ষষ্ঠ দিবসে বিধাতা পুরুষ সূতিকাগৃহে প্রচ্ছন্নে প্রবেশ করিয়া জাতকের কপালে তাহার অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দেন। ঐ লিখন নাকি অদৃশ্য লেখনী দ্বারা লিখিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও ঐ লেখ মুছিয়া ফেলা আমাদের সাধ্যাতীত। এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ, প্রত্যেকের ভাগ্য বা অদৃষ্ট তাহার জন্মের বহু পূর্ব্বে জন্মান্তর-কৃত কর্ম্ম দ্বারা নিরূপিত হয়।

আর একজন ভাগ্যবিধাতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—ইনি ধর্ম্মরাজ যমের খাতাঞ্জি চিত্রগুপ্ত। ইনি লেখনীহস্তে যমালয়ের দপ্তরখানায় বসিয়া একখানা প্রকাণ্ড খাতায় প্রত্যেক মানুষের পাপপুণ্যের সঠিক হিসাব রক্ষা করেন—সে হিসাব এমন 'দুরস্ত' যে, তাহাতে কড়া ক্রান্তির ভুল হয় না। দেহান্তে জীব যমালয়ে নীত হইলে চিত্রগুপ্তের ঐ খাতা দৃষ্টে তাহার পুণ্যপাপের বিচার হয় এবং তাহার ফলে সে স্বর্গে বা নরকে কর্ম্মভোগের জন্য প্রেরিত হয়।

এ বিশ্বাস একেবারে অমূলক নহে। আমরা যে কিছু কর্ম্ম করি—তা'

সে কর্ম্ম ভাবনা, বাসনা বা চেষ্টনা যাহাই হউক না কেন—তাহারই গুপ্ত চিত্র আকাশ-পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়। থিয়সফিষ্টেরা ঐ চিত্রাবলীকে 'Akasic Records' বলেন। যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি আছে, তাঁহাদের দৃষ্টির সমক্ষে ঐ চিত্রাবলী উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়—তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন জীবের অতীত কাহিনী (ইহ জন্মেরই হউক বা জন্মান্তরেরই হউক) অভ্রান্তভাবে পাঠ করিতে পারেন। ধর্ম্মরাজ যমের নিকট ঐ সকল আকাশিক চিত্র 'করকলিতকুবলয়বৎ' সুবিজ্ঞাত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে; কিন্তু সে জন্য যে তাঁহার খাতাঞ্জি দপ্তর সরঞ্জাম কালিকলম লইয়া খাতা পাতিয়া বসিয়া কেরাণিগিরি করিবেন, ইহার দরকার আছে কি? তবে ঐ গুপ্ত চিত্রাবলীর যিনি রক্ষক—'চিত্রগুপ্ত' তাঁহার সার্থক নাম বটে।

এই আকাশিক চিত্রাবলীর রক্ষকদিগকে প্রাচীন গ্রন্থে 'লিপিক' বলা হইয়াছে। ইঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের অতি উচ্চস্তরের দেবতা। ইহাঁদের অধিকার ও কার্য্যকলাপ মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, ইঁহারাই সাক্ষাৎভাবে মানবের ভাগ্যবিধাতা ও জন্মমরণাদির ব্যবস্থা-কর্ত্তা। অবশ্য পরোক্ষভাবে পরমেশ্বরই জীবের কর্ম্মফলদাতা—

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা বসুদানঃ—বৃহ, ৪।৪।২৪

(বসুদানঃ = ফলদাতা)

তাঁহা হইতেই জীবের কর্ম্মফল—

ফলমত উপপত্তেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮

এই ফলদান ব্যাপারে ঐ লিপিকেরাই কিন্তু তাঁহার সহকারী, তাঁহার নিয়োগধারী অধিকারী পুরুষ (Functionaries)।*

* এ সম্বন্ধে ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি তাঁহার Secret Doctrine গ্রন্থে লিখিয়াছেন—The Lipika are the Spirits of the universe. (They) belong to the most occult portion of cosmogenesis, which cannot be given here * * * Of

তত্ত্বদর্শীরা বলেন যে, ঐ লিপিকদিগের অধীনে চারিজন দিক্‌পাল নিযুক্ত আছেন—ইঁহাদিগের নাম 'মহারাজ'। ইঁহারা লিপিকদিগের মহাপাত্র বা অমাত্যস্থানীয়–জীবপুঞ্জের বিচিত্র কর্ম্মের সূত্রধার, জটিল কর্ম্মগ্রন্থির নির্দ্ধারক, সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মবিধাতা।† ইঁহাদিগের অধিনায়কতাতেই ইঁহাদের অনুচর-পরিকর দেবগণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত কর্ম্মের বিপাক এবং সামঞ্জস্য বিধান করেন। কিরূপে?

যখন কোন জীবের জন্মান্তর গ্রহণের কাল উপস্থিত হয়, তখন এই কর্ম্মবিধাতারাই তাহার বিবিধ ও বিচিত্র 'সঞ্চিত' কর্ম্ম-পুঞ্জ হইতে সেই জন্মে যে সকল কর্ম্ম দেশকালপাত্রের সাহায্যে ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে পারে, তাহা বাছিয়া লইয়া তাহার 'প্রারব্ধ' কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করেন। এবং যে দেশে, যে কুলে ও যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জন্মিলে সেই প্রারব্ধ যথাযথ ভোগ হইবে, সেই দেশে, সেই কুলে ও সেই অবস্থার মধ্যে তাহার জন্ম-

its highest grade one thing only is taught, the Lipika are connected with Karma—being its direct Recorders—Vol. 1 Page 153.

They are the 'Second Seven' and They keep the Astral Records filled with the Akasic images before spoken of. They are connected with the destiny of every man and the birth of every child—Karma, Page 46

† এই মহারাজদিগের সম্বন্ধে ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কি লিখিয়াছেন—They are the protectors of Mankind and also the agents of Karma on Earth (Secret Doctrine, I, 151). These are the "Four Maharajas" or Great Kings of the Dhyan Chohans, the Devas, Who preside over each of the four cardinal points * * * These Beings are also connected with Karma as the latter needs physical and material agents to carry out its decrees. —Secret Doctrine, I, 147

(The) mighty spiritual Intelligences, often spoken of as the Lords of Karma * * * hold the threads of destiny which each man has woven, and guide the re-incarnating man to the environment determined by his past—Ancient Wisdom, PP 268 9

গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সূক্ষ্মদেহধারী জীব প্রথমতঃ পিতার শরীরে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে মাতার কুক্ষিতে নিষিক্ত হয়। ইহাকেই 'গর্ভাধান' বলে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ নিষিক্ত বীজ সকল ক্ষেত্রেই ঠিক একরূপ; অর্থাৎ, যে বীজ হইতে মানব-শিশু উৎপন্ন হয় এবং যে বীজ হইতে ছাগল, ঘোড়া, মেষ বা মহিষ প্রভৃতি পশু-শাবক জন্ম লাভ করে, ঐ সকল বীজই দৃশ্যতঃ অভিন্ন। তবে মনুষ্য-রেতঃ হইতে মানুষ এবং পশু-রেতঃ হইতে ঠিক সেই সেই পশু উৎপন্ন হয় কিরূপে? বিজ্ঞান ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু এই কর্ম্মবাদ হইতে আমরা ইহার উত্তর পাই। গর্ভাধানের সম্ভাবনা হইলে ঐ কর্ম্ম-বিধাতারা 'লিপিক'-দেবদিগের নির্দ্দেশ মত জাতকের প্রারব্ধ কর্ম্মের ঠিক অনুযায়ী একটী ইথিরীয় ছাঁচ (Etheric Mould) প্রস্তুত করিয়া মাতার কুক্ষিতে স্থাপন করেন। পুং-বীজাণু (Sperm) ও স্ত্রী-বীজাণুর (Germ) সহযোগে কলল বা ভ্রূণাণু উৎপন্ন হইবার পরে, অণুর পর অণু উপচিত ও সজ্জিত হইয়া জাতকের যে স্থূল শরীর গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, সে শরীর ঐ ইথিরীয় ছাঁচের অনুসারেই গঠিত হয়। সেই জন্য মনুষ্য-বীজ হইতে মনুষ্য এবং পশু-বীজ হইতে পশুই উৎপন্ন হয়।* এ সম্বন্ধে আরও একটু বিশেষ আছে। ধরুন, জাতককে একজন কলাবিৎ করিতে হইবে—কারণ,

* (The Lipika) give the 'idea' of the physical body, which is to be the garment of the reincarnating soul, expressing his capacities and his limitations; this is taken by the Maharajas and worked into a detailed model, which is given to one of their inferior agents to be copied; this copy is the etheric double, the matrix of the dense body, the materials for these being drawn from the mother and subject to physical heredity. —Ancient Wisdom, p. 350.

জন্মান্তরে ঐ জীবের মধ্যে সঙ্গীত-শক্তি বেশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এ স্থলে কর্ম্মবিধাতারা কি করিবেন? তাহার জন্য এমন বংশের, এমন পিতামাতার ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে উত্তরাধিকার সূত্রে সে সুকুমার স্নায়ুমণ্ডলী (Delicate nervous organisation) এবং গীতগ্রাহক শ্রুতি (Sensitive Ear) জনক-জননীর নিকটে প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ যদি তাহাকে ব্যায়ামপটু কুস্তিগির করিবার প্রয়োজন থাকে— যদি তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুসারে তাহাকে দিগ্‌বিজয়ী বীর করা আবশ্যক হয়, তবে কর্ম্মবিধাতারা তাহাকে জন্মের জন্য বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, দৃঢ়কায় পিতা-মাতার সকাশে প্রেরণ করিবেন।

এইরূপ যে জীব দুর্বৃত্ত—যাহার মধ্যে খলপ্রকৃতি প্রবল, কর্ম্ম-বিধাতারা তাহাকে দুর্বৃত্ত, দুরাত্ম পরিবারে জন্মের জন্য প্রেরণ করেন। সে ঐরূপ পিতামাতা হইতে যে কদর্য্য স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই দেহের সাহায্যে তাহার প্রকৃতিগত দুষ্প্রবৃত্তি ও দুর্বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে। ধরুন, ঐ জাতক পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে একজন 'পাঁড় মাতাল' ছিল। অতিরিক্ত পানদোষে তাহার সূক্ষ্মশরীর শ্লথ ও ক্ষীণ হইয়াছে। তাহার ফলে ইহজন্মে তাহার স্নায়ুমণ্ডল দুর্ব্বল হওয়া উচিত। ঐ স্থলে কর্ম্ম-বিধাতারা কি করেন? তাহার পুনর্জন্মের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে মদ্যপায়ী পিতামাতার সদনে লইয়া যান—যাহাদের দেহ অত্যধিক পানদোষে ক্ষত ও পীড়িত হইয়াছে। সে উত্তরাধিকার সূত্রে এমন দেহ প্রাপ্ত হয় যাহার মধ্যে মৃগী (delirium) প্রভৃতি রোগের বীজ নিহিত থাকে। *

* যাহাকে Hereditary disease ও deformity বলে, ঐ পৈতৃক ব্যাঘাত ও ব্যাধি জীবের জন্মান্তর কৃত কর্ম্মের বিপাক হইলেও কর্ম্ম-বিধাতারাই যে উহার নিমিত্ত কারণ শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত তাঁহার কর্ম্মগ্রন্থে এ কথা বেশ বিশদ করিয়াছেন—Congenital

আমি একজন তত্ত্বদর্শীর মুখে শুনিয়াছি যে, এক কামুক পূর্ব্বজন্মে তাহার পশুপ্রকৃতির উত্তেজনায় অত্যধিক ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়া চরিতার্থ বোধ না করিয়া অবশেষে এক সাত্ত্বিক-প্রকৃতির তপস্বিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহা অতি উৎকট পাপ। তাহার ফলে সে পরজন্মে পঙ্গু ও উন্মত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

এখানেও আমরা কর্ম্ম-বিধাতাদিগের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ঐ লম্পটের কর্ম্ম-বিপাক জন্য ইহজন্মে তাহার বিকল ও উন্মত্ত হওয়া আবশ্যক ছিল। সে জন্য কর্ম্ম-দেবতারা তাহাকে এমন পিতার ঔরসে জন্ম দিলেন, এমন মাতার কুক্ষিতে স্থাপন করিলেন, যেখানে ঐ পঙ্গুত্ব ও জড়ত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে তাহার শরীরে সংক্রামিত হইল।

এ সকল স্থলে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কর্ম্ম-দেবতারা প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া শাস্তিবিধান করেন না। তাঁহারা অম্লানমুখে ও অনাবিল চিত্তে কর্ম্মের বিচিত্র বিধান কার্য্যে পরিণত করেন মাত্র—যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, অক্ষুব্ধ ভাবে কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত তাহাই দিয়া দেন। কর্ম্ম-চক্রের তাঁহারা চালক মাত্র—প্রবর্ত্তক নহেন। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'— জাতক ইহজন্মে ভোগের জন্য যে প্রারব্ধ-কর্ম্ম সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা তাহারই ভোগের সুব্যবস্থা করিয়া দেন মাত্র।

defects result from a defective etheric double * * * All such arise from the working of the Lords of Karma and are physical manifestations of the deformities necessitated by the errors of the Ego, by his excesses and defects * * *

So again from Their just administration of the Law come the in-wrought tendency to reproduce a family disease, the suitable configuration of the etheric double, and the direction of it to a family in which a given disease is hereditary, and which affords the 'continuous plasm' suitable to the development of the appropriate germs.—Karma, P. 53

জন্মের ব্যবস্থা করিয়াই কি কর্ম্ম-বিধাতাদিগের কর্ত্তব্য শেষ হয়? না, হয় না। আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক জীব জন্ম-জন্মান্তরে অন্য জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে—তাহার হিত বা অহিত, শুভ বা অশুভ, উপকার বা অপকার সাধন করে। এইরূপে তাহাদের মধ্যে কর্ম্মবন্ধন সৃষ্ট হয়। একজন আর একজনের নিকট ঋণী হয়—উভয়ের মধ্যে দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করিবার প্রয়োজন উদ্ভব হয়। ঐ দেনা পাওনা উসুল জন্য কর্ম্ম-দেবতারা যে যাহার নিকট ঋণী এইরূপ ব্যক্তিদ্বয়কে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন, যাহাতে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ঋণের আসান হইয়া যায়।* সেই জন্য কর্ম্ম-বিধাতারা জীবদিগকে এমন ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে স্থাপন করেন, এমন দেশে প্রেরণ করেন, এমন কালের সংযোজন করেন এবং এমন পাত্রের সমাবেশ করেন, যাহাতে পরস্পরের দেনা পাওনা মিটিয়া যাইতে পারে।

অনেক সময় আমরা স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) দ্বারা কর্ম্ম-চক্রের মধ্যে নূতন শক্তি ও সম্ভাবনার সন্নিবেশ করি। যদ্যপি উহা কর্ম্ম-বিধানের অনুগুণ হয়, তবে কর্ম্ম-বিধাতারা তাহার সহায়তা করেন। কিন্তু কর্ম্ম-বিধানের বিগুণ হইলে, তাঁহাদিগকে ঐ সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ দ্বারা আমাদের ঐ সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে। এক কৃপণ পূর্ব্বজন্মে অনেককে ফাঁকি দিয়া এবং পীড়ন করিয়া বহু বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছিল। ইহার ফলে সে পরজন্মে অতি দীন ও দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। সে সমস্তদিন ভিক্ষা করিয়া অতিকষ্টে উদরান্নের সংস্থান করিত

* Devas bring people together and carry them apart, always for the working out of their individual Karma—Evolution of Life and Form, page, 7.

এবং শীর্ণ ও মলিন অবস্থায় জীবন যাপন করিত। একদিন হর-পার্ব্বতী আকাশমার্গে যাইতেছেন—সেই ভিক্ষুককে দেখিয়া পার্ব্বতীর চিত্ত দয়ায় দ্রব হইল। তিনি মহাদেবকে বলিলেন,—"আমি এই দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিব।" এই বলিয়া যে পথে ঐ ভিক্ষুক চলিতেছিল সেই পথের উপর ভিক্ষুকের অনতিদূরে নিজের রত্নালঙ্কার ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, ভিক্ষুক সেই রত্নালঙ্কার দেখিয়া কুড়াইয়া লয় এবং তাহাব বিক্রয়লব্ধ অর্থে ধনবান্ হয়। কিন্তু অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়। কর্ম্মের এক তিল ব্যত্যয় করে কাহার সাধ্য?

"নমস্তৎ কর্ম্মভ্যঃ বিধিরপি যেভ্যো ন প্রভবতি।"

'অর্থাৎ কর্ম্মই বলবান্। বিধিও তাহার বিফলতা করিতে পারেন না।' সেই ভিক্ষুকের হঠাৎ ইচ্ছা হইল যে, 'কানারা কিরূপে চলে আমায় দেখিতে হইবে। চক্ষু বুজিয়া একবার চলিয়া দেখি।' এই ভাবিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতে লাগিল, এবং সেই রত্নালঙ্কার পার হইয়া তবে চক্ষু খুলিল। ফলে, সে যে দরিদ্র ছিল সেই দরিদ্রই রহিল। এখানেও আমরা ঐ কর্ম্ম-দেবতাদিগের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করিতে পারি। তাঁহারা দেখিলেন, যাহার যাহা প্রাপ্য নয়, সে বুঝি তাহা পাইয়া যায়! সেইজন্য তাঁহারা ঐ ভিক্ষুকের চিত্তে অন্ধের অনুকরণ প্রবৃত্তি চালনা করিলেন। আমাদের দেশে যাহাকে 'দুষ্টা সরস্বতী' বলে, সে ইহারই অনুরূপ কথা।

এ সম্বন্ধে আরও দু' একটা দৃষ্টান্ত দিব। লোকে যাহাকে Accident বা হঠাৎ ঘটনা বলে, তাহা কিরূপে ঘটে? এই নিয়মের জগতে অ্যাকসিডেণ্ট্ (Accident) বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে কি? কর্ম্মের অমোঘ গতি হঠাৎ বা আকস্মিক কারণে কখনও ব্যাহত হইতে পারে না। একজন একটা নির্দ্দিষ্ট ট্রেণে বিদেশ যাইবার সব ঠিক্ ঠাক্

করিয়াছেন। আজ রাত্রিতে তিনি বোম্বাই মেলে কাশী যাইবেন। মোট ঘাট সব বাঁধা প্রস্তুত। ট্যাক্সি চড়িয়া হাওড়া অভিমুখে চলিলেন। হঠাৎ পথে ট্যাক্সির কল বিগড়াইয়া গেল। অথবা হাওড়ার পুলের নিকট গাড়ীর জমাট তাঁহাকে এমন বাধা দিল যে, তিনি এক মিনিটের জন্য ট্রেণ ফেল হইলেন। বাধ্য হইয়া ভগ্নচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। সে রাত্রে তাঁহার কাশী যাওয়া হইল না। পরদিন সংবাদ পত্রের টেলিগ্রাফ স্তম্ভে দেখিলেন, অন্য গাড়ীর সহিত কলিসন হওয়ায় তাঁহার ফেল-করা রেলগাড়ীখানা চূরমার হইয়া গিয়াছে এবং তিনি হঠাৎ বাঁচিয়া গিয়াছেন। তিনি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "ভাগ্যে যাই নাই!" আর একজন সিঙ্গাপুর যাইবার জন্য জাহাজে 'বার্থ-রিজার্ভ' করিয়া যাইবার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম করিয়াছেন। আজ বেলা ৫ টার সময় খিদিরপুরের জেটিতে গিয়া জাহাজে চড়িতে হইবে—রাত্রি ১১ টার সময় জাহাজ খুলিবার কথা। হঠাৎ বেলা তিনটার সময় প্রবল কম্প দিয়া তাঁহার জ্বর আসিল। তিনি লেপ মুড়ি দিয়া প্রায় আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া রহিলেন। এই আকস্মিক কারণে সে যাত্রা তাঁহার সিঙ্গাপুর যাওয়া স্থগিত হইল। যথাকালে জাহাজ নঙ্গর উঠাইয়া যাত্রা করিল। অনেক যাত্রী জাহাজে চলিয়াছেন, কিন্তু তিনি অনুপস্থিত। ২।৩ দিন জাহাজ খানি বেশ চলিল। সমুদ্রে পড়িয়া জাহাজ তরঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে রেঙ্গুনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে হঠাৎ একটা তুমুল ঝড় বঙ্গোপসাগরকে বিক্ষুব্ধ ও বিলোড়িত করিয়া সেই জাহাজের দিকে অগ্রসর হইল। জাহাজ সেই ঝড়ের প্রবল বেগ সহ্য করিতে পারিল না। সহসা বানচাল হইয়া সমুদ্রের তলে অদৃশ্য হইল। আমাদের বন্ধু ৩।৪ দিন পরে কুইনাইন সেবনে কোনরূপে জ্বর-মুক্ত হইয়া সংবাদ-পত্র খুলিয়া দেখিলেন, সেই জাহাজ (যাহাতে তাঁহার আরোহী হইবার কথা ছিল), জলমগ্ন হইয়াছে। তখন তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "Providen-

tial Escape—বিধি-বিহিত রক্ষা !" এসকল অ্যাকসিডেণ্ট (Accident) কাহার কৃত ?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাংড়াতে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল,—যে ভূমিকম্পের ফলে অনেক অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং শত শত নরনারী অকালে প্রাণ হারাইয়াছিল—সেই ভূমিকম্প উপলক্ষে এইরূপ কয়েকটী ঘটনা আমাদের গোচরে আসিয়াছিল। ঐ ভূমিকম্প সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার কোন পূর্ব্বলক্ষণ কেহ পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারে নাই। ভূমিকম্পের পূর্ব্বদিন দেখা গিয়াছিল, কয়েক জন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনে কাংড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আর কয়েক জন বিনা প্রয়োজনে কাংড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কর্ম্মের বিধানে যাহাদের "অ্যাকসিডেণ্টে" (Accident) মরা উচিত, তাহারাই কর্ম্মদেবতার প্রেরণায় কাংড়ায় আসিল এবং যাহাদের বাঁচা উচিত তাহারা কাংড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এ সম্বন্ধে আমার পিতৃদেবের মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—একদিন কাল বৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে কয়েক জন পথিক একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। দুর্য্যোগটা হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় এবং নিকটে অন্য কোন আশ্রয় না থাকায় তাহারা ঐ মন্দিরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে ঘোর ঘনঘটা। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের বেশ চমক হইতেছে। বজ্র যেন উদ্যত হইয়া আছে, কিন্তু পড়িতেছে না। যাহারা সেই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন 'বুদ্ধিমান্' ছিলেন। তিনি সকলকে সু-বুদ্ধি দিয়া বলিলেন "দেখ, বজ্র নল্‌পাইতেছে, কিন্তু পড়িতেছে না। আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন মহাপাপী আছে, যাহার মাথায় ঐ বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু আমরা পুণ্যাত্মারা এই মন্দিরের মধ্যে আছি বলিয়া আমাদের খাতিরে

বজ্র পড়িতে পারিতেছে না। এস, আমরা এক এক জন করিয়া মন্দিরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াই। যাহার মাথায় বজ্র পড়িবার, সে বাহিরে গেলেই বজ্রটা তাহার মাথায় পড়িবে।" তাঁহার সঙ্গীরা এ কথায় সম্মত হইল। তখন এক এক করিয়া সেই মন্দিরের লোকেরা মাথা পাতিয়া বজ্রাঘাতের প্রতীক্ষা করিয়া বাহিরে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু তথাপি অশনিপাত হইল না। শেষ কালে দেখা গেল মন্দিরের এককোণে একটা লোক লুকাইয়া আছে, সে কিছুতেই বাহির হইতে চায় না। অপরে ধরিয়া তাহাকে মন্দিরের বাহির করিল। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মুক্ত আকাশের তলে গিয়া দাড়াইল। তাহার সঙ্গীরা তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া মন্দিরে ফিরিয়া গেল এবং বলাবলি করিতে লাগিল, "এই লোকটাই পাপী, সেই জন্য লুকাইয়া ছিল; দেখনা—এখনই ইহার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।" হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করিয়া বজ্রপাত হইল। কিন্তু সেই বজ্র মন্দিরের অদূরে দণ্ডায়মান সেই ভয়ার্ত্ত পথিকের মাথায় পড়িল না—মন্দিরের মধ্যে পড়ায় মন্দিরস্থ সকলে মরিয়া গেল, সেই একা রক্ষা পাইল। *

এই যে সকল 'হঠাৎ' ঘটনা, ইহারা অ্যাকসিডেণ্ট (Accident) নহে—ঐ সকল ঘটনারই ঘটক ও প্রবর্ত্তক ঐ কর্ম্ম-বিধাতারা। রেলের দুর্ঘটনা, জাহাজ-

* If a man's Karma does not permit of a violent death, say by a railway collision, the Devas will take advantage of circumstances to make him miss the train. If he is not destined to find a watery grave by shipwreck, he will be made to change his plan at the last moment and to miss going by the ship which is to go down. But if his Karmic requirement is the other way, then he will be guided to his doom and will meet with his "accident". Thus Karma works.

—Philosophy of the Gods. Page 77.

ডুবি, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক ঘটনার সুযোগ লইয়া তাঁহারা অনেক নরনারীর কর্ম্ম-বিপাক একযোগে সুসিদ্ধ করেন এবং এইরূপে তাহাদের কর্ম্ম-ঋণ নিঃশেষ করিয়া দেন।

এতক্ষণ আমরা ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ম্ম-বিধাতাদিগের ব্যাপারের আলোচনা করিলাম। অতঃপর সমষ্টি বা জাতিগত কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর কিছু আলোচনা করিব।

আমরা দেখিয়াছি—জাতি ব্যক্তির সমষ্টি। যেমন ব্যষ্টি-মানুষের কর্ম্ম ও তাহার বিপাক আছে, সেইরূপ সমষ্টি-মানুষ—জাতিরও কর্ম্ম এবং তাহার বিপাক আছে। এই বিপাকের প্রকার ও প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্ম-ঋণ আদান প্রদানের জন্য অধমর্ণ-জাতি ও উত্তমর্ণ-জাতির পরস্পর সম্বন্ধ ও নৈকট্য স্থাপিত হয়। ঐ অধ্যায়ে আমরা এই সম্পর্কে দুই একটী উদাহরণও দিয়াছি। এই সম্বন্ধ-স্থাপন কিরূপে সাধিত হয়? বলা বাহুল্য, উহা আক্সিডেণ্ট (Accident) নহে, উহার মধ্যেও কর্ম্ম-বিধাতাদিগের করস্পর্শ আছে। তাঁহারাই এক জাতিকে অন্য জাতির সংস্রবে আনয়ন করেন, এক জাতির দ্বারা অন্য জাতিকে বিজিত করেন, এক জাতির দ্বারা অন্য জাতিকে দলিত বা দমিত করেন, একজাতির সংস্পর্শে অন্যজাতিকে উন্নত বা অবনত করেন। এইরূপে জাতীয় কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিহিত হয় এবং জাতিগত বৈষম্য শমিত হয়।*

এ দৃশ্য বিরল নহে যে, একটা প্রতাপী সভ্যজাতির অত্যাচারে বা

---

* Suppose one nation commits a crime against another nation. If so, this must meet with Karmic retribution and the scale re-adjusted. By whom and how? By the Devas who bring the nations together to balance up the accounts that are between them and so restore equilibrium and make each nation reap as it has sown.—

Philosophy of the Gods. P. 78, 79.

আওতায় একটা নিরপরাধ অসভ্যজাতি বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া ক্রমশঃ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল। অষ্ট্রেলিয়ায় মেওরিদিগের (Maoris) এবং আমেরিকায় রক্তাঙ্গদিগের (Red Indians) এই দশা হইয়াছে। ইহাও জাতিগত কৰ্ম্ম। এ জাতীয় কর্ম্মের বিপাক কি? এরূপ স্থলে কৰ্ম্ম-বিধাতারা ঐ সকল অসভ্যদিগকে অচিরে সেই সেই সভ্যজাতির নিম্নতম স্তরে জন্মদান করেন—তাহারা ঐ সভ্যতার Slum Population হয়—নরাকারে পশু—কেহ শান্ত, কেহ দুরন্ত—কিন্তু প্রায় সকলেই বুদ্ধিহীন, বিবেকহীন, সংযমহীন, সম্ভ্রমহীন। ইহাদের লইয়া ঐ সভ্যজাতি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়—তাহাদের গিলিতেও পারে না, উগরাইতেও পারে না। নানা উপায়ে তাহাদিগকে সভ্য-ভব্য শিষ্ট-শান্ত করিবার চেষ্টা করে—কিন্তু কিছুই ফল হয় না। এবং তাহাদিগের সঙ্গ ও সাহচর্য্যের ফলে সেই উন্নত সভ্যতা ক্রমশঃ অবনত ও অবসন্ন হয়। এইরূপে কৰ্ম্ম-বিধাতারা কৰ্ম্ম-ঋণের আদান প্রদান করেন।

সময়ে সময়ে দেখা যায় একটা প্রবলজাতি এক দুর্ব্বল জাতির হস্তে পরাভূত হইল। প্রাচীন যুগে পারস্য ও গ্রীসের সংঘর্ষে আমরা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পারসিকেরা যে বিপুল বাহিনী লইয়া গ্রীস্ আক্রমণ করিয়াছিল, মুষ্টিমেয় গ্রীক্ সেনা তাহার সম্মুখে ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় উড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা হইল না। জগতের ইতিহাসে তখন এমন সময় আসিয়াছিল, যখন ইরানীয় সভ্যতাকে হতমান করিয়া গ্রীক সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক ছিল। সেই জন্য কৰ্ম্ম-বিধাতারা পারস্যের সিংহাসনে একজন অক্ষম, অলস, অদক্ষ নৃপতিকে বসাইলেন এবং তাঁহার ইরানী-রাজন্যবর্গের মধ্যে দুর্ব্বল, ভীরু ও অপটু ব্যক্তিদিগকে জন্ম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস দেশে থার্মপিলির (Thermopylœ) গিরিসঙ্কটে পারসিক বাহিনীকে প্রতিহত করিবার জন্য তিন শত দুর্দ্দম

বীরকে সংস্থাপন করিলেন এবং স্যালামিসের (Salamis) জল-যুদ্ধে ইরানীয় নৌ-বহরকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য এথেন্সের (Athens) নাবিক পরিবারে কয়েকজন সুদক্ষ রণ-নায়ককে জন্ম দিলেন। মধ্যযুগে স্পেন ও ইংলণ্ডের 'আর্মাডা' (Armada) ঘটিত ব্যাপারেও আমরা এই নাটকেরই পুনরভিনয় দর্শন করি। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের রাজ-ছত্রতলে অধৃষ্য বীরবৃন্দকে সমবেত দেখি, আর স্পেনীয় আর্মাডার (Armada) তরণী-বক্ষে অকর্ম্মণ্য কাপুরুষের উচ্ছৃঙ্খল রণনৃত্য প্রত্যক্ষ করি। ভারত-মুকুটের জন্য মোগল ও মহারাট্টার অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের মধ্যেও এই সত্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একদিকে শঠ, ধূর্ত্ত, প্রতারকের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সাহায্যকারী দুর্ব্বল, দুর্বৃত্ত, অধম ও অবিশ্বাসী ভৃত্যমণ্ডল; অন্যদিকে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ, বিশ্বাস-পুষ্ট, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা শিবাজীমহারাজ ও তাঁহার অনুগত, অনুরক্ত, অদম্য অনুচরগণ। অজেয় মোগলবাহিনীতে কে ঐ সকল নিষ্কর্ম্মাদিগকে পাঠাইল ? কেই বা মহারাট্টা-সেনা-নিবাসে ঐ সকল কৃতকর্ম্মা বীরপুঙ্গবদিগকে নেতৃত্ব দিল ? ঐ কর্ম্ম-বিধাতারা। *

এ যুগের রুষ-জাপান-যুদ্ধেও আমরা এই সত্য প্রত্যক্ষ করি। ঐ যুদ্ধ বিরাট্ ও বামনের যুদ্ধ। কিন্তু বিরাট্ই পরাভূত ও পর্য্যদস্ত হইয়াছিল। যুদ্ধকালে দেখা গেল, রুষিয়ার প্রকাণ্ড বাহিনী নায়কহীন, অ-কর্ণধার তরণীর ন্যায় তাহা সহজেই বিপ্লুত হইল। অন্যপক্ষে ক্ষুদ্র জাপানের গৃহে গৃহে বীর, পল্লীতে পল্লীতে শূর দেখা দিল।

এইরূপ যুদ্ধব্যাপারের সহিত আমাদের পৌরাণিকেরা দেবর্ষি নারদের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। কলহই না'কি তাঁহার বিনোদ, বিবাদই না'কি

* সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'রাজসিংহের' ভূমিকায় এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন এবং রাজসিংহের বিশ্বস্ত অনুচর মানিকলালের পার্শ্বে ঔরঙ্গজেবের অবিশ্বাসী ওমরাহ মবারককে চিত্রিত করিয়া এই তথ্য স্ফুটীকৃত করিয়াছেন।

তাঁহার ব্যসন—অথচ তিনি দেবর্ষি! প্রথম দৃষ্টিতে ইহা বেশ বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু জাতীয়-কর্ম্মের সামঞ্জস্য যদি বিধাতার বিধানে বিহিত হয়, তবে নারদের মত নিরপেক্ষ 'পক্ষপাত বিনির্মুক্ত দেবর্ষি'—যিনি রাগ-দ্বেষ ও মায়া-মোহের অতীত, যাঁহার নিকট ভেদাভেদ 'সপদিগলিত', 'পুণ্যপাপ বিশীর্ণ,' সুখ-দুঃখ যাঁহার নিকট তুল্য-মূল্য,—যিনি আত্মরত, আত্মতৃপ্ত—যিনি 'আনন্দধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি' বিশ্বভ্রমণে ব্যাপৃত —জাতিগত কর্ম্মের এই সামঞ্জস্য বিধানে এবং জাতিগত ঋণের এই আদান প্রদানে তাঁহার মঙ্গল-হস্ত নিয়োজিত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলতঃ নারদের যে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আমরা অবগত আছি, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, তিনি এই কর্ম্ম-বিধাতাদিগের অন্যতম—হয় ত' মুখ্যতম।

নবম অধ্যায়

—০:০:০—

দৈব ও পুরুষকার

কর্ম্মবাদের আলোচনায় আমাদের মনে সহজেই এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, জন্মান্তরকৃত কর্ম্মই যদি জীবের ইহজন্মের জাতি, আয়ুঃ, ভোগ প্রভৃতিকে নিয়মিত করে, তবে মনুষ্য-জীবনে প্রযত্ন বা পুরুষকারের স্থান কোথায়? মানুষ কি অদৃষ্টের দাস, না প্রভু? সে চেষ্টার দ্বারা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কতটা পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে? এক কথায়—সে কি একেবারে দৈবাধীন, না তাহার কোন স্বাধীনতা আছে? এ সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলে আমাদের প্রথমে দৈব ও পুরুষকারের আলোচনা করিতে হইবে।

দৈব কি? গ্রীকেরা যাহাকে Fate বা ভাগ্য বলিতেন, দৈব কি তাহাই? গ্রীক্ পুরাণে দেখা যায়, প্রাচীন গ্রীকেরা তিন জন ভাগ্য দেবতা মানিতেন। ইঁহাদের নাম পার্কি (Parcæ)। ইঁহারা সহোদরা। জ্যেষ্ঠা এট্রোপস্ (Atropos), মধ্যমা লাকেসিস্ (Lachesis) এবং কনিষ্ঠা লোথো (Lotho)। লোথো জাতকের জন্ম-ক্ষণের অধিষ্ঠাত্রী। লাকেসিস্ জীবন-সূত্রের সূত্র-ধারিণী এবং এট্রোপস মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনিই নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে মানুষের জীবন-গ্রন্থি কর্ত্তন করেন। গ্রীক্দিগের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের যত কিছু সুখ দুঃখ, সুযোগ দুর্য্যোগ, শুভাশুভ

তাহা এই তিন ভাগ্যদেবীর সাক্ষাৎ দান। তাঁহাদেরই বিধানে নিখিল মানব-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। *

গ্রীক্ কাব্য নাটকের আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই বিশ্বাস গ্রীসের জাতীয় জীবনে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল। উরিপাইডিস (Euripides), সফোক্লিশ (Sophocles) প্রভৃতির বিশ্ববিশ্রুত নাটকাবলীতে মানুষ Fate বা ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কিরূপে নির্জ্জিত ও নিগৃহীত হইতেছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহুদিদিগের মধ্যে ফ্যারিসি (Pharisee) ও এসিনি (Essene) সম্প্রদায় সুবিখ্যাত। ইঁহারা কোন বিষয়েই মানবের স্বাধীনতা মানিতেন না। মুসলমানেরা যাহাকে 'কিসমৎ' বলেন, তাহা ইহারই অনুরূপ কথা। যাঁহারা 'কিসমৎ' মানেন তাঁহাদের মত এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট। ধাতার নিত্যবিধানে যাহা কিছু ঘটিবার তাহা পূর্ব্বাবধি স্থির হইয়া আছে। মানুষ বাধ্য হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে। আমাদের দেশে যে কেহ কেহ বলেন,—'ভবিতব্যং ভবত্যেব' অর্থাৎ, ভগবতী ভবিতব্যতার অমোঘ গতি ও অকাট্য বিধান, এই 'কিসমৎ' সেই ধরণের কথা। খৃষ্টীয় জগতে সেণ্ট অগাষ্টাইন (St. Augustine) এই ভবিতব্যতা বা Pre-destination প্রথম প্রচার করেন। তিনি বলিতেন, জীব ভবিতব্যতার দাস। বিধাতা পূর্ব্বাহ্ণেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কে কে পরিত্রাণ পাইবে এবং কে কে নরকে যাইবে। সে তালিকায় তিলার্দ্ধ সংযোগ-বিয়োগ করিবার

* Clotho the youngest of the sisters presided over the moments in which we are born and held a distaff in her hand. Lachesis spun out all the events and actions of our life, and Atropos the eldest of the three cut the thread of human life with a pair of scissors. They were the arbiters of the life and death of mankind and whatever good or evil befalls us in the world, immediately proceeds from the Parcaes. —Lemprier's Classical Dictionary.

যো' নাই। যাহার নরকে যাইবার, সে যাইবেই—যাহার পরিত্রাণ পাইবার, সে পাইবেই। এ যুগে খৃষ্টানদিগের মধ্যে ক্যালভিন (Calvin) কর্ত্তৃক ঐ ভবিতব্যতাবাদ সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। তিনিও বলিতেন, "ভাগ্যই প্রধান,— প্রযত্ন বা পৌরুষ সম্পূর্ণ নিষ্ফল"।* যেমন এ দেশের কথা, "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।" এ কথা কি ঠিক?

অন্যপক্ষে, পৌরুষবাদীরা বলেন, "ভাগ্য বা অদৃষ্ট বলিয়া কোন কিছু নাই। মানুষ প্রযত্নের দ্বারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। সে অবস্থার দাস নহে, অবস্থার প্রভু। সে ভাগ্যের বিধাতা, সে অদৃষ্টের নিয়ামক।" এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা হইয়াছে—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষাঃ বদন্তি॥

অর্থাৎ, 'সৌভাগ্য-লক্ষ্মী উদ্যোগী প্রযত্নশীল পুরুষকেই বরণ করেন। যাহারা কাপুরুষ তাহারাই ভাগ্যের দোহাই দেয়।' এই মতই কি ঠিক?

তাহা যদি হয়, তবে সকলের চেষ্টার সমান ফল হয় না কেন? অবশ্য যেখানে চেষ্টার তারতম্য আছে, ক্ষমতার ইতরবিশেষ আছে, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা-দুর্ব্বলতার প্রভেদ আছে, সেখানকার কথা আমরা ধরিব না; কিন্তু যেখানে শক্তিশালী যোগ্য ব্যক্তি প্রাণপণ প্রযত্ন করিয়া বিফল হইতেছে এবং অধম, অযোগ্য ব্যক্তি বিনা প্রযত্নে সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কি আমাদের গোচরে আসে নাই? জীবন-যুদ্ধে কেহ জয়ী, কেহ পরাজিত কেন? যদি পুরুষকারই প্রধান হয়, তবে এ সমস্যার সমাধান কি?

* The Greek Tragedians made it their business to exhibit the helplessness of man in his strife against fate. * * Among the Jews the Pharisees and Essenes left no place for human freedom.

In Islam El Burkevi states "It is necessary to confess that good and evil take place by the predestinaton and predetermination of God. All

বিষ্ণুপুরাণকার প্রহ্লাদের মুখে এই প্রশ্নই উত্থাপন করিয়াছেন—

ন চিন্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঞ্ছতি।
তথাপি ভাব্যমেবৈতৎ উভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ॥
সর্ব্বএব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমাঃ।
তথাপি পুংসাংভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ॥
জড়ানামবিবেকানাম্ অশূরাণামপি প্রভো।
ভাগ্যভোজ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি॥—বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৪৩-৫৫

অর্থাৎ, 'কে না রাজ্যের বাঞ্ছা করে, কে না ধনাগমের ইচ্ছা করে? তথাপি যাহার যাহা ভবিতব্য, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। সকল মানুষই বড় হইবার জন্য উদ্যমশীল; কিন্তু ভাগ্যই সবাকার সম্পদের হেতু, উদ্যম নহে। কারণ, দেখা যায় অলস, ভীরু, নির্ব্বুদ্ধি, দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ঐশ্বর্য্য ভাগ্যের দান, প্রযত্নের ফল নহে।'

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি হইতে আমরা এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হই—

দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।

that has been and all that will be was decreed in eternity and written on the preserved table." * * * Orthodox Mahomedans believe that by the force of God's eternal decree man is constrained to act thus or thus.

The doctrine of Predestination was first formulated in the Church by Augustine. The Pelagian idea that man is competent to determine his own character, conduct and destiny was repugnant to him. * * Individuals are the objects of predestination—a certain fixed number. so certain that no one can be added to it or taken from it.

The theory of Calvin is Augustinian not only in its substance but in the methods and grounds by which it is sustained.—Encyclopedia Brittanica. 11th Edition (Article on Predestination).

তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদৈহিকম্ ॥ ৩৪৭
কেচিৎ দৈবাদ্ধঠাৎ কেচিৎ কেচিৎ পুরুষকারতঃ।
সিদ্ধন্ত্যর্থা মনুষ্যাণাং তেষাং যোনিস্তু পৌরুষম্ ॥ ৩৪৮
যথা হ্যেকেন চক্রেন রথস্য ন গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৩৪৯

—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, আচারাধ্যায়।

ইহার মর্ম্ম এই যে, পুরুষকার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় না; তাহার সহিত জন্মান্তরের সুকৃতি চাই। যেমন এক চাকা দ্বারাই রথ চলে না, সেইরূপ দৈব ভিন্ন পৌরুষ সফল হয় না। নৌকায় পাল তুলিলেই হয় না; তাহার সহিত অনুকূল বায়ু চাই। ক্ষেত্রে বীজ পুঁতিলেই হয় না, বৃষ্টির দ্বারা সেই বীজে জলসেক হওয়া চাই। অতএব দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই অপেক্ষা আছে। দৈববাদী যে পুরুষকারকে একেবারে উড়াইয়া দেন, তাঁহার কথাও ঠিক নহে; আর পৌরুষবাদী যে দৈবকে একেবারে "ন স্যাৎ" করেন, তাঁহার কথাও ঠিক নহে। আমরা বুঝিলাম, এ মতে দৈব অর্থে 'কিসমৎ' বা ভাগ্য নহে; দৈব=জন্মান্তরকৃত সুকৃত বা দুষ্কৃত-জনিত অদৃষ্ট।

যাঁহারা দৈব না মানিয়া পুরুষকারকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিতে চান, তাঁহাদের আর একটা প্রশ্নের সমাধান করা উচিত। সেটা হইতেছে জগতের বৈষম্য-সমস্যা। প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, জগৎ নিতান্তই বৈষম্যময়; আমরা দেখিয়াছি কি ভোগ, কি চরিত্র, কি আচরণ—সকল বিষয়েই মানুষে মানুষে প্রচুর বৈষম্য আছে। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ নির্ব্বুদ্ধি। কেহ জন্মাবধি সম্পদের ক্রোড়ে লালিত, যেন অন্নপূর্ণা তাঁহার সুবর্ণ ঝাঁপি হইতে তাহার মস্তকে সর্ব্বদা স্বর্ণচম্পক বৃষ্টি করিতেছেন।

আর একজন জন্মান্ধ, জন্মপঙ্গু—সমস্ত বাধা ও ব্যাঘাতের যৌতুক লইয়া জগতের বাসরে উপনীত হইয়াছে। অথচ ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। তিনি 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু'। অতএব যদি আমরা স্বীকার না করি যে, প্রত্যেক জীব নিজের কর্ম্মফল সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ন্যায়পর ভগবান্ জীবের সেই কর্ম্মফল অপেক্ষা করিয়াই জগতের মধ্যে এই বৈষম্য বিধান করেন, তবে এই বৈষম্য-সমস্যার কখনই সমাধান করিতে পারিব না।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি - ব্রহ্মসূত্র. ২ ১'৩৪

অন্য পক্ষে, যাঁহারা 'কিসমৎ-বাদী,' যাঁহারা বলেন, সমস্তই দৈবাধীন, মানুষের কোথায়ও পৌরুষ প্রকাশের কিছুমাত্র অবকাশ নাই—তাঁহাদের মতের বিপক্ষেও কয়েকটি প্রবল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, আমাদের সমস্ত কর্ম্মই যদি দৈবাধীন, যদি পাপ-পুণ্য কোন বিষয়েই আমাদের স্বাধীনতা না থাকে, যদি মানুষ ভবিতব্যতার নিগড়ে আবদ্ধ বলিয়াই যে চুরি করিবার সে চুরি করে, যে হত্যা করিবার সে হত্যা করে, যে দান করিবার সে দান করে, যে সত্য বলিবার সে সত্য বলে —তাহা হইলে আর মানুষের দায়িত্ব থাকিল কোথায়? অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের জন্য আবার দায়িত্ব কি? কারণ, যাহা ভবিতব্য—যাহা বিধাতৃ-বিহিত পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ, হিতাহিত, সুকৃত-দুষ্কৃত—জীব যখন সহস্র চেষ্টাতেও তাহার অন্যথা করিতে পারে না, তখন কর্ম্মের জন্য তাহাকে দায়ী করা কি অতিশয় অনুচিত নহে?

আর এক কথা। দৈববাদে পুণ্য পাপের স্থান কোথায়? মানবের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণরূপে দৈবাধীন হয়, যদি ক্রিয়মাণ কর্ম্ম পক্ষে তাহার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা না থাকে, তবে ত' মানুষ ইচ্ছাহীন জড়পদার্থ মাত্র, যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকা মাত্র। উত্তাপ দানে অগ্নির যদি না পুণ্য থাকে,

লোহাকর্ষণে চুম্বকের যদি না পাপ থাকে, তবে এ মতে শুভাশুভকারীরও পুণ্য পাপ থাকিতে পারে না।

দৈববাদীরা হয়তো বলিবেন, "যেমন আগুনে হাত দিলে—ইচ্ছায় হউক, কি অনিচ্ছায় হউক—হাত পুড়িবেই, সেইরূপ কর্ম্ম করিলেই—তা' জীবের দায়িত্ব থাকুক বা না থাকুক—তাহার ফল ফলিবেই ফলিবে।" এ উত্তর সদুত্তর নহে, কারণ, আমরা যখন 'কর্ম্মের নিবৃত্তি'র বিষয় আলোচনা করিব, তখন দেখিতে পাইব, অনাসক্ত ভাবে অহংকার বর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, সে কর্ম্ম আর ফলপ্রসূ হয় না।

আরও কথা আছে। যদি আমাদের প্রধান কর্ম্মগুলি দৈবাধীন বা Pre-destined হয়, তবে অপ্রধান কর্ম্মগুলিও দৈবাধীন না হইবে কেন? এইরূপে ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মই যদি দৈবাধীন বা Pre-destined হইল, তবে আর 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্ম রহিল কোথায়? ইহজীবনে আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি—এ মতে, ইহা তো কর্ম্ম নয়, ইহা ফল বা ভোগ মাত্র। ভোগের আবার ভোগ কি? 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্ম যদি ফল হয়, তবে তো ইহজন্মেই কর্ম্ম নিঃশেষ হইয়া যাওয়া উচিত। কারণ, যখন সে কর্ম্ম ফলপ্রসব করিবে না, তখন তাহার ফলে আবার জন্মান্তর হইবে কিরূপে? জন্মান্তরের 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্মই যখন এ জন্মের 'প্রারব্ধ' এবং ঐ প্রারব্ধ যখন এইরূপে ভোগদ্বারা নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন জন্মান্তর ঘটাইবে এরূপ কর্ম্মের আর জের রহিল কোথায়? এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িতেছে—একবার চিত্রকূট হইতে ফিরিবার সময় পথে এক বৃদ্ধ নেপালী তান্ত্রিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কথায় বুঝিলাম, তিনি 'কারণ ও কামিনীতে' বেশ প্রসক্ত। ইহার একটু মৃদু প্রতিবাদ করিলে তিনি নিজের সাফাইয়ে বলিলেন, 'নেপাল ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত। ভারতই কর্ম্মভূমি, নেপাল ভোগভূমি। অতএব তিনি নেপালে বসিয়া

যে ব্যভিচার করেন, সে'টা ত' কর্ম্ম নহে—ভোগ। ভোগের ভোগ হয় না। অতএব নেপালে অনুষ্ঠিত ব্যাপার পুণ্যও নহে, পাপও নহে।' অবশ্য সেই তান্ত্রিকের এ উত্তরে আমি বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য না হইলেও 'উপনয়'টা, নিতান্ত ভ্রান্ত নহে। সত্যই ত' যদি কোন কর্ম্ম—কর্ম্ম না হইয়া ভোগ মাত্র হয়, তবে সে কর্ম্ম আবার ফল প্রসব করিবে কেন ?

ভাগ্যবাদীরা এই আপত্তির একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, "যেমন রবারের 'বল' আকাশে ছুঁড়িয়া দিলাম—তাহার ফলে সেটা মাটিতে পড়িল। সেই পড়ার ফলে সেই গোলক আবার আকাশে উঠিবে, আবাব পড়িবে। ইহাও তদ্রূপ। কর্ম্মের স্বভাবই এই, সে স্থিতি-স্থাপকতাশীল। কর্ম্ম করিলাম, তাহার ফলে কর্ম্মাত্মক ভোগ হইল। ঐ ভোগের ফলে আবার কর্ম্ম, আবার ভোগ—এইরূপ চিরদিন চলিবে।" উত্তরে বক্তব্য, এই রবারের গোলার দৃষ্টান্ত সদ্‌দৃষ্টান্ত নহে। কারণ, গোলক যখন প্রথম নিক্ষেপ করা হয়, সেটা তো একটা কর্ম্ম বটে, সে ত' আর ভোগ নহে। কর্ম্মের স্থলে কোন জন্মের কর্ম্ম প্রথম কর্ম্ম এবং কোনটাই বা ভোগ? ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম যদি ভোগ হয়, তবে পূর্ব্ব জন্মের ক্রিয়মাণ কর্ম্মও 'ভোগ' না হইবে কেন ? আর এক কথা—রবারের 'বল' কয়েকবার উঠিয়া পড়িয়া সংস্কার (Momentum) নিঃশেষ হইলে স্থির হইয়া যায়। কিন্তু কর্ম্মের ত' আদি অন্ত নাই।

কিন্তু দৈববাদীর বিপক্ষে ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর আপত্তি উঠান যায়। দৈববাদ যদি সত্য হয়, মানুষের যদি ক্রিয়মাণ-কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ স্বাধীনতা না থাকে, তবে আমরা যাহাকে Conscience বা এখনকার ভাষায় 'বিবেক' বলি তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। এই বিবেক উচিত-

অনুচিত বিষয়ে উপদেশ মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকে না, 'ইহা কর্ত্তব্য—কর, ইহা অকর্ত্তব্য—করিও না', এইরূপ বিস্পষ্ট অনুজ্ঞা প্রচার করে। যখনই আমরা কোন পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমাদের হৃদয়-কন্দর হইতে একটা নিষেধাজ্ঞা (দার্শনিক-প্রবর Kant যাহাকে Categorical Imperative বলিতেন) প্রচারিত হয়। ঐ বাণীর সহিত আমরা যদি না অবিরোধে কার্য্য করি, তবে আমাদের অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয় না। যদি ক্রিয়মাণ কর্ম্মে আমাদের কোন স্বাধীনতা না থাকে, তবে বিধাতা আমাদের মনো-গুহায় এই নিষেধ বাণী ধ্বনিত করেন কেন? অতএব 'বিবেক'-উচ্চারিত অনুজ্ঞাদৃষ্টে বুঝা যায়, ক্রিয়মাণ-কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা আছে। অন্যথা বিবেকের এই অমোঘ আদেশবাণী প্রচারিত হয় কেন?

আর এক কথা। সকল জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই অনুজ্ঞার ভাবে কতক গুলি বিধি-নিষেধ উপদিষ্ট দেখা যায়। আর্য্যঋষির মতে 'চোদনা'লক্ষণ ধর্ম্ম। চোদনা অর্থে অনুজ্ঞা—সংস্কৃত ভাষায় বিধিলিঙের প্রয়োগ দ্বারা যাহা সূচিত হয়। 'সত্যং ব্রূয়াৎ' 'সত্য বলিবে', 'মা হিংস্যাঃ' 'হিংসা করিবে না' ইত্যাদি শাস্ত্রের আদেশ যদি আমাদের পক্ষে একান্তই অসাধ্য-সাধন হইত, তবে শাস্ত্র-কারেরা কখনও ঐরূপ উপদেশ দিতেন না। যদি কেহ আমাকে বাঘের দুধ যোগাইতে বলে, অথবা বিদ্যুতের আলো নিবাইতে বলে, তবে সেটা ত' প্রলাপবাক্য। শাস্ত্র কখনও প্রলাপবাক্য বলেন না। সেই জন্য দার্শনিক কাণ্টের ভাষায় বলিতে হয় যে, "Shall" implies "Can"। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, শাস্ত্রে যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত নহে। বিধির করণ ও নিষেধের অকরণ বিষয়ে মনুষ্যের শক্তি-সামর্থ্য আছে। তাহা যদি হইল, তবে আর মানবের কর্ম্ম দৈবাধীন কিরূপে?

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি মানুষের সকল কর্ম্মই অদৃষ্টাধীন হইত, কোন

বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা না থাকিত, তবে শাস্ত্রে এতরূপ কর্ম্ম-কাণ্ডের ব্যবস্থা কেন? বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, স্মৃতিতে অধিকার ভেদে নানাপ্রকার ক্রিয়া কলাপের বিধান কেন? মানুষের আপন আপন রুচি-প্রবৃত্তি মত বাছিয়া লইবার শক্তি সামর্থ্য আছে বলিয়াই ত'? মানুষের ক্রিয়মাণ কার্য্যে স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই ত? অতএব স্বীকার করিতেই হয় যে, ক্রিয়মাণ কর্ম্মে আমাদের স্বাধীনতা আছে। সে জন্যই বিবেকের বাণী এবং শাস্ত্রকারের বিধি-নিষেধ। কারণ, আমরা ব্রহ্ম-সিন্ধুর বিন্দু, সেই চিন্ময়ের চিৎকণ—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫ ৭

অতএব জীবাত্মা যখন সেই পরমাত্মার আভা বা অংশ, তখন সে স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। Free-will বা স্বাধীন ইচ্ছায় তাহার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। এই যুক্তিহীন দৈববাদ স্বীকার করিয়া কেন আমরা সেই অধিকারের সঙ্কোচ করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদের প্রচারে সমাজে যে অকর্ম্মণ্যতা, নিশ্চেষ্টতা এবং উদাসীনতার সম্ভাবনা, তাহার প্রশ্রয় দিব?

এ মতের প্রচারে মনুষ্য সমাজে কিরূপ জড়তা ও উদ্যমহীনতার সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'রৈবতক কাব্যে' মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ইহা কি আমাদের প্রণিধান-যোগ্য নহে?

পাপ পুণ্য সব
মিথ্যা কথা? এত আশা, এতই উদ্যোগ,
এত ধ্যান, এত জ্ঞান নিষ্ফল সকল,—
যা' আছে কপালে তাহা ঘটিবে নিশ্চয়!
ভাবিলেও মনে, প্রভু, কি যেন জড়তা—
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আসি হয় সঞ্চারিত!

ঋষিদিগের প্রচারিত অদৃষ্টবাদে এই দৈব ও পুরুষকারের কেমন সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

দশম অধ্যায়

অদৃষ্টবাদ

ভাগ্যবাদী ও পৌরুষবাদীর বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, তাঁহাদের মতে ক্রিয়মাণ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে মানুষের কোনরূপ স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই। তাঁহারা বলেন, মানুষ যে কোন পুণ্য-পাপ সুকৃত-দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করে, সে সমস্তই দৈবকৃত—তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মাচরিত কর্ম্ম-সমষ্টির অবশ্যম্ভাবী ফল। যে নরঘাতক, সে ভাগ্যের অপ্রতিবিধেয় প্রেরণায় নরহত্যারূপ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। সে কর্ম্ম তাহাকে অবশ্যই করিতে হয়; সহস্র চেষ্টা, অযুত উদ্যমেও সে তাহার অন্যথা করিতে পারে না। এইরূপ সুকর্ম্ম সম্বন্ধেও—যে পরের উপকারকারী, সে পরোপকাররূপ সুকর্ম্ম ভাগ্যের অপ্রতিবিধেয় প্রেরণাতেই অনুষ্ঠান করে। সে কর্ম্মও তাহাকে অবশ্যই করিতে হয়; কোন চেষ্টা না করিলেও, সর্ব্ববিধ উদ্যমের অভাবেও সে তাহার অন্যথা করিতে পারে না।

অন্যপক্ষে, পুরুষকারবাদীদের মতে মানুষের সর্ব্বকার্য্যেই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁহারা বলেন, মানুষের জন্মান্তর থাকে থাকুক্, কিন্তু জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা তাহার ইহজন্মে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কোনরূপেই নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের ভোগাভোগ, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য সম্পূর্ণভাবে তাহার আপন

হস্তগত। সে ইচ্ছা করিলেই পুণ্যার্জ্জন করিতে পারে, ইচ্ছা করিলেই পাপাচরণ করিতে পারে। সে কোন মতেই অবস্থার দাস নহে। দুঃখ, কষ্ট, দুরবস্থা সমস্তই তাহার নিশ্চেষ্টতা, উদ্যমহীনতার ফল। প্রযত্ন, পৌরুষ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োগ করিলে সকলেই সুখ-সম্পদ্ ভোগ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে। এক কথায়, মানুষের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টাধীন, ইচ্ছা-সাপেক্ষ। এই মতের পোষকতা করিয়া ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন (Tennyson) বলিয়াছেন,—'Man is man and master of his fate.'

আমরা দেখিয়াছি, এই দুই মতের কোনটিই যুক্তিসহ নহে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, দৈববাদ সত্য হইলে মনুষ্যজীবন হইতে সর্ব্ববিধ উদ্যম ও প্রযত্নের বিলোপ করা উচিত। কারণ, এ সমস্তই মিথ্যা-জ্ঞানের বিড়ম্বনা মাত্র।

অতঃপর আমরা অদৃষ্টবাদের আলোচনা করিব। আশা করি সে আলোচনার ফলে প্রতিপন্ন হইবে, এই মতবাদে অদৃষ্টবাদ ও পৌরুষবাদের যাহা সত্যাংশ তাহা সংগৃহীত হইয়াছে এবং যাহা ভ্রমাংশ তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই অদৃষ্টবাদে দৈব ও পুরুষকারের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অদৃষ্টবাদী কর্ম্মাতিরিক্ত কোন দৈব মানেন না। তাঁহারা বলেন—

কল্পিতং মোহৈতৈর্ম্মন্দৈর্দৈবং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।

—যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু প্রকরণ, ৪।১০

অর্থাৎ, 'বাস্তবিক দৈব বলিয়া কোন কিছু নাই। নির্বুদ্ধি মন্দমতি লোকেরা দৈব বলিয়া একটা কল্পনা করে মাত্র।' যেমন প্রাচীন গ্রীকেরা তিন জন

অদৃষ্ট-দেবীর কল্পনা করিতেন। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ আরও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—

যে সমুদ্যোগমুৎসৃজ্য স্থিতাঃ দৈবপরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থং কামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ॥—যোগ বাঃ, মুমুক্ষু, ৭।৩

দৈবং সংপ্রেরয়তি মাং ইতি দগ্ধধিয়াং মুখম্।
অদৃষ্টশ্রেষ্ঠ্যদৃষ্টীনাং দ্রষ্টৄ্। লক্ষ্মীর্নিবর্ত্ততে।— যোগ বাঃ, মুমুক্ষু, ৫।২০

অর্থাৎ 'যাহারা প্রযত্ন পরিহার পূর্ব্বক দৈবপরায়ণ হইয়া বসিয়া থাকে, সেই আত্মদ্বেষ্টারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সমস্তই নষ্ট করে। পুরুষকারের অবহেলা করিয়া দৈবকে সার ভাবিয়া যাহারা ভাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে, সেই দগ্ধবুদ্ধিদিগের মুখ দেখিয়া লক্ষ্মী ফিরিয়া যান।' বস্তুতঃ বুঝিয়া দেখিলে, যাহাকে দৈব বলা হয়, তাহা পৌরুষেরই নামান্তর। যেটা প্রাক্তন বা পূর্ব্ব জন্মকৃত পৌরুষ, তাহাই ইহজন্মে দৈবরূপে প্রকাশিত হয়—

প্রাক্তনং পৌরুষং যত্তদ্ দৈব-শব্দেন কথ্যতে।—যোগ বাঃ মুমুক্ষু, ৬।৩৫
প্রাক্তনং চৈহিকং চেতি দ্বিবিধং বিদ্ধি পৌরুষং।—যোগ বাঃ, মুমুক্ষু, ৪।১৯

অর্থাৎ, 'পৌরুষ দ্বিবিধ—প্রাক্তন ও অদ্যতন—আমুষ্মিক ও ঐহিক—পূর্ব্ব জন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত।' এইরূপ ভাবে বুঝিলে দৈবকে আর একটা সর্ব্বনাশী বিভীষিকা বলিয়া বোধ হইবে না—একটা বাহ্যশক্তি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে আমাদিগকে পেষণ ও পীড়ন করিতেছে, এরূপ মনে হইবে না। আমরা বুঝিতে পারিব দৈবের যে নিগড়, তাহা আমাদেরই স্ব-রচিত

এবং ঐ আত্মকৃত বাধা আমরা উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা ছেদন করিতে পারি *

সেই জন্য বলা হয়, কার্য্যসিদ্ধির জন্য দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই যোজনা আবশ্যক।

দৈবে পুরুষকারে চ কার্য্যসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি হইতে একচক্র রথের যে উপমা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পাঠকের স্মরণ হইবে। একখানা দাঁড়ে কি নৌকা চলিতে পারে? দুই পাশে অন্ততঃ দুখানা দাঁড় থাকা চাই। এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি একটা গল্প বলিয়া থাকেন। এক মালিকের বাগানে একটা অতি সুমিষ্ট আম গাছ ছিল। কিন্তু মালিদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় ঐ গাছের ফল কখনও মালিকের ভোগে আসিত না। নিরুপায় হইয়া তিনি সমস্ত পুরাতন মালি বিদায় করিয়া দিলেন এবং ঐ বাগান এক অন্ধ ও এক খঞ্জের জিম্মায় রাখিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, ঐ আম্রফল অন্ধের দৃষ্টিগোচর হইবে না, অতএব তাহার হস্ত হইতে রক্ষিত হইবে এবং ঐ খঞ্জের দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহার অনধিগম্য থাকিবে। কিছুদিন এইরূপেই চলিল বটে, কিন্তু যখন যুক্তি করিয়া অন্ধ ও খঞ্জ একজনের চক্ষু আর একজনের চরণের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিল, তদবধি আর কেহ ঐ ফলের সাক্ষাৎ

* এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া Sir Edwin Arnold একস্থলে লিখিয়াছেন—

Ho! Ye who suffer know
Ye suffer from yourselves
None else compels

অর্থাৎ Karma is not destiny imposed from without but a self-made destiny.

পাইল না। দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধেও ঐরূপ। একের সহায়তা ভিন্ন অপর কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।*

পাছে দৈবের প্রতি অতিমাত্র নির্ভর করিয়া মানুষ পুরুষকারের অবহেলা করে, সেইজন্য বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছেন—

পৌরুষং সর্ব্বকার্য্যানাং কর্ত্তৃ রাঘব নেতরৎ।
ফলভোক্তৃ চ সর্ব্বত্র ন দৈবং তত্র কারণং।।—যোগ বাঃ, মুমুক্ষু, ৯।২

অর্থাৎ, 'পৌরুষই সর্ব্বত্র সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা, দৈবকারণ নহে।' এই উপদেশ খুব সঙ্গত। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যাহাকে আমরা দৈব বলি, তাহা প্রাক্তন পৌরুষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

কর্ম্মের বিপাক আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে,

* স্বামীজির একশিষ্য 'মহাপুরুষ বাণী' নাম দিয়া তাঁহার যে সকল উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে স্বামীজির মত বেশ বিস্পষ্ট দেখা যায়। স্বামীজি বলিতেছেন,—দৈব ও পুরুষকার উভয়ই চাই; কিন্তু পুরুষকারই প্রধান। দেখ, আমার দৈব বা প্রারব্ধে আছে, তোমা হইতে আহার পাইব। তুমি আহার্য্য আমার সম্মুখে ধরিলে অথবা মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে, কিন্তু ঐখানে গিয়াই আমার দৈব শেষ হইল। এখন পুরুষকার—চর্ব্বন ও গিলন—দরকার; নতুবা দৈবে ভোগ জন্মাইতে পারিল না।

শিষ্য—ইহা হইল অনুকূল দৈবের কথা; প্রতিকূল দৈবের স্থলে পুরুষকার দৈবকে কতদূর বাধা দিতে পারে?

স্বামীজি—খুব পারে।

শিষ্য—তবে দৈব আর পুরুষকার একই হইল—যাহা পূর্ব্বকৃত পুরুষকার, তাহাই এখন দৈব?

স্বামীজি—হাঁ, ইহাই ঠিক।

—মহাপুরুষ বাণী, ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা।

সঞ্চিত কর্ম্মের ফলে আমাদের প্রকৃতি বা চরিত্র গঠিত হয় এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে আমাদের জাতি, আয়ুঃ, ভোগ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়মিত হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই, ঐ সকল কর্ম্মফল (যাহাকে অদৃষ্ট বলা যায়)—পুরুষকার বা প্রযত্ন দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে কিনা?

প্রথম, সঞ্চিতের ফল—যদ্দ্বারা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। ধরুন, সঞ্চিতের ফলে একজন পাপপ্রবণ চিত্ত, মলিন বুদ্ধি এবং দুর্ব্বল চিন্তাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোন বিষয়েই তাহার মতি স্থির হয় না। দুর্ব্বাসনায় তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই আন্দোলিত থাকে। কঠিন বিষয়ে তাহার বুদ্ধি প্রবেশই করিতে পারে না। তাহার এই যে স্বভাব, প্রযত্ন দ্বারা সে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে কি না? আমরা বলি, নিশ্চয়ই পারে। কারণ, আমরা যাহাকে স্বভাব বলি, তাহা কয়েকটি অভ্যাসের গুচ্ছ (Bundle of Habits) ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমরা পুনঃ পুনঃ যে ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টার অনুষ্ঠান করি, তাহাই অভ্যাসে পরিপক্ক হয়, এবং কয়েকটা অভ্যাস পুঞ্জীভূত হইয়া আমাদের স্বভাব গঠন করে। ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

চিত্তনদী উভয়তঃ বাহিনী বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায়।

এই চিত্তের প্রবাহকে যদি আমরা পাপের খাত ছাড়িয়া কল্যাণের খাতে প্রবাহিত করি, তবে কু-অভ্যাসের স্থলে সু-অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কয়েকটা সু-অভ্যাস সঞ্চিত হইয়া আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

আমাদের শরীরগত অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আমার বদ্ অভ্যাস আছে আমি ভোরে উঠিতে পারি না। প্রাতরুত্থান আমার অনভ্যস্ত। অথবা আমার অভ্যাস আছে, আমি অঙ্গ-

চপল—অন্যমনস্ক হইলেই অনিচ্ছায় পা নাচাইতে থাকি। কিন্তু আমি যদি অবহিত হইয়া দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য সহকারে কয়েকদিন ভোরে উঠিবার অভ্যাস করি এবং কিছুকাল অঙ্গ-চাপল্যের সংযমন করি, তবে ঐ সকল কু-অভ্যাস সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কথায় বলে—শরীর হন মহাশয়, যা' সহয়াও তাই সয়।

বিজ্ঞানের ভাষায়, ইহাকে শরীরের 'Automatism' বলে। শরীরের এই স্বতঃ-প্রবণতার সুযোগ লইয়া, আমরা শারীরিক অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিতে পারি। যাহাকে আমরা চিত্ত বা মনঃ বলি, সেটাও আমাদের শরীর—স্থূল শরীর নয়, সূক্ষ্ম শরীর। ঐ শরীরেরও Automatism বা স্বতঃ-প্রবণতা আছে। উহার সুযোগ লইয়া, আমরা প্রযত্ন দ্বারা চিত্তগত অভ্যাসেরও পরিবর্ত্তন করিতে পারি। যেমন সোণাকে গলাইলে, প্রস্তুত স্বর্ণালঙ্কারের রূপ পরিবর্ত্তন করা যায়, সেইরূপ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে লঘু যোগবাশিষ্ঠে কয়েকটী সুন্দর উপদেশ আছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

> অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়।
> স্বমনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাংবর!
> শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ।
> পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

'অশুভতে নিবিষ্ট মনকে পৌরুষ দ্বারা শুভতে অবতারণ কর। বাসনা-নদী শুভাশুভ উভয় মার্গেই বহমান; পৌরুষ ও প্রযত্ন দ্বারা শুভমার্গে তাহাকে সুস্থির কর।' এইরূপে যখন চিত্তনদী পাপের খাত পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণের খাতে বহমান হইবে, তখন কুচিন্তা, দুর্বাসনা এবং

কদভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের প্রকৃতি স্বচ্ছ, সবল এবং সুন্দর হইতে থাকিবে। *

সঞ্চিত কর্ম্মের ফলে যে প্রকৃতি বা স্বভাব লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, প্রযত্ন ও পৌরুষ দ্বারা সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা যায় কি না,—এতক্ষণ আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। সে আলোচনার ফলে দেখিলাম, আমরা স্বভাবের যে দীনতা, দুর্ব্বলতা বা মলিনতা লইয়া জন্মগ্রহণ করি, উহা আমাদিগের স্ব-কৃত—এবং চেষ্টার দ্বারা তাহার সংশোধন করা যায়। আমাদের প্রকৃতিরূপ যে কোষের মধ্যে আমরা ইহজন্মে আবদ্ধ হইয়াছি, সে কোষকার আমরাই—এবং পুরুষকার দ্বারা সেই কোষের ছেদন ও ভেদন করিতে পারি।† এ সম্বন্ধে স্যার এডউইন আরনল্ড (Sir Edwin Arnold) 'হিতোপদেশ' হইতে একটা শ্লোকের যে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধান যোগ্য।

* এ সম্বন্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট তাঁহার Ancient Wisdom গ্রন্থে কয়েকটী সার কথা বলিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

We are continually making habits by the repetitions of purposive actions guided by the will ; then the habit becomes a limitation, and we perform the action automatically. Perhaps we are then driven to the conclusion that the habit is a bad one, and we begin laboriously to unmake it by thoughts of the opposite kind ; after many inevitable lapses into it, the new thought-current turns the stream, and we regain our freedom, often again to gradually make another fetter. So old thought-forms persist and limit our thinking capacity, showing as individual and as national prejudices. The majority do not know that they are thus limited, and go on serenely in their chains, ignorant of their bondage ; those who learn the truth about their own nature become free.

† The chains that bind him are of his own forging, and he can file them away or rivet them more strongly ; the house he lives in is of his own building, and he can improve it, let it deteriorate or rebuild it, as he will —Ancient Wisdom, p. 327.

Look! the clay dries into iron,
But the potter moulds the clay;
Destiny to-day is master—
Man was master yesterday.

আমরা দেখিয়াছি, প্রারব্ধের ফলে আমাদের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ নিয়মিত হয়। এক কথায় মানুষের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment)—প্রারব্ধ দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়। অতঃপর আমাদের আলোচনা করিতে হইবে—প্রারব্ধের ঐ ফল পরিবর্ত্তিত করা যায় কি না।

প্রথমতঃ আমাদের আলোচ্য এই—প্রারব্ধ কি জীবের ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নিয়ামক? অর্থাৎ, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের কতটা স্বাধীনতা ও কতদূর স্বাতন্ত্র্য আছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) আছে। আছে বলিয়াই আমরা পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী; আছে বলিয়াই আমরা ক্রিয়মাণ সুকৃতের দ্বারা সঞ্চিত দুষ্কৃতের, এবং ক্রিয়মাণ দুষ্কৃত দ্বারা সঞ্চিত সুকৃতের নিয়মন করিতে পারি। যেমন গতি-বিজ্ঞানে দেখি, এক শক্তি এক ভাবে প্রসৃত হইয়া কোন দিকে অগ্রসর হইতেছে; বিপরীতভাবে ভিন্ন শক্তির তদভিমুখে প্রয়োগ করিয়া আমরা প্রথমোক্ত শক্তির গতিরোধ করিতে পারি। সেইরূপ, অধ্যাত্ম-জগতেও ক্রিয়মাণ সুকৃত-দুষ্কৃতের প্রয়োগ করিয়া সঞ্চিত দুষ্কৃত সুকৃতের নিরোধ করা অসম্ভব নহে। ইহাকেই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ করা বলে। জ্ঞানী পুরুষেরা সুকৌশলে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের যথাযথ প্রয়োগ করিয়া সঞ্চিত কর্ম্মের ফলাফল নিরোধ করিতে পারেন।

কেহ কেহ কৌষীতকী ব্রাহ্মণের নিম্নোক্ত শ্রুতি অবলম্বন করিয়া মানুষের কর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে মনুষ্য প্রত্যেক

সৎ বা অসৎ কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রেরণায় আচরণ করে—তাহাতে তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র অভিরুচি থাকে না। শ্রুতিটি এই—

এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।

অর্থাৎ, ঈশ্বর যাহাকে ইহলোক হইতে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান এবং যাহাকে অধোনীত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কিন্তু এ শ্রুতির ভিন্নরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। তাঁহার অভিমত অর্থই সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, "ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া জীবের পাপ-পুণ্য অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ অবস্থার ব্যবস্থা করেন"। এবং তিনি ঐ মতের সমর্থন জন্য উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের ২।১।৩৪ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। অতএব আমরা বলিতে চাই, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা আছে।

এই ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-সামর্থ্যকে পুরুষকার বলে। সাধারণ জীবে এই পুরুষকার বড়ই দুর্ব্বল। সাধারণ জীব প্রায়ই অদৃষ্ট-পরবশ; কিন্তু জীব যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহার পুরুষকারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে; ততই সে অদৃষ্টের বশ্যতা হইতে মুক্ত হইতে থাকে। অবশেষে তাহার পুরুষকারের মাত্রা এতই বর্দ্ধিত হয় যে, সে হেলায় সমস্ত কর্ম্ম-পাশ ছিন্ন করিতে পারে; অদৃষ্টের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া জ্ঞানাগ্নির যথাযথ প্রয়োগ করিয়া নিখিল কর্ম্ম-বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চদশীকার তৃপ্তিদীপে একটা কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য—

অবশ্যংভাবিভাবানাং প্রতীকারো যদি ভবেৎ।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥

এই শ্লোকে পঞ্চদশীকার দৈবের প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া বলিতেছেন, "ভবিতব্যতার যদি খণ্ডন সম্ভব হইত, তবে নল, রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কখনই দুঃখের ভাগী হইতেন না।" তাঁহারা ত' উন্নত পুরুষ, কেহ কেহ দিব্য পুরুষ। তাঁহাদের ত' পুরুষকার বেশ প্রবল, তবে তাঁহারা দুঃখের বারণ করেন নাই কেন? ইহার উত্তর কঠিন নহে। ব্রহ্মসূত্র জীবন্মুক্ত পুরুষের কর্ম্মক্ষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ভোগেনত্বু ইতরে ক্ষপয়িত্বা—৪।১।১০

ইহার ভাব এই যে, তাঁহারা ভোগদ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয় করেন এবং দ্রুততর কর্ম্মক্ষয়ের উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে "কায়ব্যূহ" রচনা করেন। ইহার ভাব এরূপ নহে যে, শক্তিশালী জীবন্মুক্ত পুরুষ ইচ্ছা করিলে প্রারব্ধের পবিবর্ত্তন করিতে পারেন না। তবে করেন না বটে, কারণ, তাঁহার পক্ষে যখন সুখ দুঃখ সমান, সুভোগ-দুর্ভোগ তুল্যমূল্য—তখন তিনি ক্রিয়মাণ কর্ম্মের দ্বারা প্রারব্ধকে নিরোধ করিবার জন্য শক্তির অপব্যবহার করেন না। অবশ্য ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। কারণ, আমরা দেখিব যে, জীবন্মুক্ত অপেক্ষা যাঁহারা ক্ষুদ্রতর সাধক (যেমন বিশ্বামিত্র, ধ্রুব, সাবিত্রী) তাঁহারাও এইরূপ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, প্রযত্ন ও পৌরুষ দ্বারা প্রবল দৈবের খণ্ডন করিয়াছিলেন।

অতএব জীবের ক্রিয়মাণ কর্ম্ম স্থলে আমরা সাধারণতঃ দুইটা বিরোধী শক্তির সংগ্রাম দেখিতে পাই—দৈব ও পুরুষকার। যোগবাশিষ্ঠকার এই সংগ্রাম মেষের যুদ্ধের সহিত তুলিত করিয়াছেন। দুই প্রতিযোগী মেষের মধ্যে যেটা প্রবল হয়, সেই অপরকে পরাজিত করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করে।

কখন একের জয় হয়, কখন অন্যের জয় হয়। এ তুলনা অতীব সমীচীন। দৈব ও পুরুষকারের যুদ্ধ ইহা অপেক্ষা বিশদ ভাবে বুঝান যায় না।

> দ্বৌহুড়াবিব যুদ্ধেতে পুরুষার্থৌ সমাসমৌ !
> প্রাক্তনশ্চৈহিকশ্চৈব শাম্যত্যত্র চিবীর্য্যবান্‌ ॥—যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু, ৫।৫
> দ্বৌহুড়াবিব যুদ্ধেতে পুরুষার্থৌ পরস্পরম্‌।
> য এব বলবাং স্তত্র স এব জয়তি ক্ষণাৎ ॥ ঐ, ঐ, ৬।১০
> ঐহিকঃ প্রাক্তনং হন্তি প্রাক্তনোহ্যতনংবলাৎ ॥— ঐ, ঐ, ৬।১০

'কখন ঐহিক প্রাক্তনকে পরাজয় করে, কখন বা প্রাক্তন কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।'

অতএব দেখা গেল যোগবাশিষ্ঠের মতে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের দ্বারা প্রারব্ধ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যোগবাশিষ্ঠ আরও বলিতেছেন—

> দৈবং পুরুষকারেণ যো নিবর্ত্তিতুমিচ্ছতি।
> ইহ বাহমুত্র জগতি স সম্পূর্ণাভিবাঞ্ছিতঃ ॥—যোগবাঃ মুমুক্ষু, ৭।২
> হ্যস্তনী দুষ্ক্রিয়াহভ্যেতি শোভাং সৎক্রিয়য়া যথা।
> তথৈবং প্রাক্তনী তস্মাৎ যত্নাৎ সৎকার্য্যবান্‌ ভবেৎ ॥—যোগবাঃ মুমুক্ষু, ৮।৪

অর্থাৎ, জন্মান্তরীন দুষ্কৃতজনিত দুর্ভাগ্য ইহজন্মকৃত সুকৃতের দ্বারা নিয়মিত করা যায়। ইহা হইতে বুঝা গেল প্রারব্ধের ফল অবশ্যম্ভাবী হইত, যদি না সে সম্বন্ধে আমরা ঐহিক পৌরুষের প্রয়োগ করিতাম। জন্মান্তরে আমরা যে শক্তির মোক্ষণ করিয়াছি তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী হইত, যদি না আমরা ইহজন্মে পৌরুষ প্রয়োগ করিয়া নূতন শক্তির সন্নিবেশ করিতাম এবং সেই শক্তির দ্বারা পূর্ব্বজন্মে প্রবর্ত্তিত শক্তির প্রতিরোধ করিতাম। যে হেতু আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন, অতএব আমরা সর্ব্বদাই নূতন শক্তির প্রয়োগ করিতে পারি, এবং অনেক স্থলে করিয়াও থাকি। কর্ম্মদেবতাদিগের

ব্যাপারের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, সময়ে সময়ে প্রারব্ধের বিগুণ হইলে আমাদের প্রযুক্ত ঐ নূতন শক্তির প্রতিরোধ করিবার জন্য কর্ম্ম-দেবতাদিগের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হয়। অতএব সে সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনা করিব না।

গতিবিজ্ঞানের আর একটী নিয়ম আমাদের এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে। কোন শক্তির ক্রিয়া নিরোধ করিতে হইলে যে Plane বা ভূমিকায় ঐ শক্তি আপতিত হইতেছে, সেই Plane বা ভূমিকাতেই বিরোধী শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, অর্থাৎ, উপযোগী উপায় (appropriate means) অবলম্বন করিতে হইবে। পাপের ফলে দুঃখ হইতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। যাহার অনিষ্ট করিয়াছি, তৎপ্রতীকার জন্য তাহারই ইষ্ট করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্মবিধানের প্রতিবিধান করা যায়।

এই জন্য দেখা যায় আয়ুর্ব্বেদে 'দোষজ' ও 'কর্ম্মজ' ব্যাধির ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কফ, বাত ও পিত্তের বৈষম্যে বা দোষে যে রোগের উৎপত্তি, ঔষধ প্রয়োগে তাহার প্রতিকার হয়। কিন্তু যে ব্যাধি "কর্ম্মজ" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃত-জনিত, সেখানে সহস্রমারী চিকিৎসকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ও বিফল হয়।

একটা প্রাচীন গল্প আছে যে, একজনের পুত্রের কোষ্ঠিতে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইবে। তাহার পিতা অশেষ প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ঐ দৈবনির্দ্দিষ্ট ঘটনা হইতে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দিন এক অতর্কিত ছিদ্র দিয়া সেই দৈব জলের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাহাকে জলমগ্ন করিল।

এখানে ঐ পুত্রের পিতা উপযোগী উপায় অবলম্বন করেন নাই; যে ভূমিকায় বিরুদ্ধ শক্তির প্রয়োগ করা উচিত ছিল, সে ভূমিকায় তাঁহার শক্তি

প্রয়োগ করেন নাই। তিনি ভৌতিক উপায় দ্বারা নৈতিক বিধানের প্রতিবিধান করিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বামিত্র, সাবিত্রী, ধ্রুব প্রভৃতি যথোচিত উপায় (appropriate means) অবলম্বনকরিয়া অদৃষ্টের বিধানকে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমরা এই তিনজনের কাহিনীর আলোচনা করিব এবং দেখিতে পাইব যে, এই তিনজনই ক্রিয়মাণ কর্ম্ম দ্বারা যথাক্রমে প্রারব্ধজনিত জাতির, আয়ুর ও ভোগের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রামায়ণের বালকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ব বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বামিত্র যুবা-বয়সে প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ধর্ম্মশীল নৃপতি —যথাসাধ্য প্রজার হিতসাধন করিতেন—

রাজাসীদ্ এষ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ॥—বালকাণ্ড, ৫১।১৭

একদা তিনি চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং নানা জনপদ, নদ নদী, পর্ব্বত কানন বিচরণ করিয়া পরিশেষে বশিষ্ঠ-দেবের পুষ্পলতাকীর্ণ, পক্ষি-কূজিত, মৃগসেবিত, শান্তরসাস্পদ আশ্রমে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠ রাজা বিশ্বামিত্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। নিঃসম্বল ঋষি কিরূপে সেই বিপুল জনতার পান-ভোজনের ব্যবস্থা করিবেন—বিশ্বামিত্র এই সন্দেহে প্রথমতঃ আতিথ্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন, কিন্তু বশিষ্ঠের নির্ব্বন্ধে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। বশিষ্ঠ তখন তাঁহার বিচিত্রবর্ণা হোমধেনু শবলাকে আহ্বান করিলেন। শবলা তৎক্ষণাৎ নিজের শরীর হইতে বিবিধ ও বিচিত্র ভূরি ভূরি খাদ্য সৃষ্টি করিল। বিশ্বামিত্র শবলার এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন, "রত্নে রাজারই অধিকার, অতএব আপনি

আমাকে এই ধেনুরত্ন প্রদান করুন। ইহার বিনিময়ে যে কিছু ধনরত্ন, বিত্ত, পশু চাহেন দিব।" কিন্তু বশিষ্ঠ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, তিনি কোন কিছুরই বিনিময়ে শবলাকে দিবেন না—

নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটি শতৈর্গবাম্।
রাজন্! দাস্যামি শবলাং রাশিভীরজতস্যবা॥ —বালকাণ্ড,৫৩।২

তখন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া বলপূর্ব্বক শবলাকে হরণ করিলেন এবং সৈন্যদিগের সাহায্যে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তখন শবলা বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে নিজের শরীর হইতে বহুবিধ অস্ত্রধারী বীর সৃষ্টি করিল এবং তাহাদের বাহুবলে বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্জ্জিত ও পরাজিত হইল। তখন বিশ্বামিত্র নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, রাহুগ্রস্ত দিবাকর এবং ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন—

সমুদ্র ইব নির্ব্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাংগতঃ॥—বালকাণ্ড, ৫৫।৯

—এবং আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য হিমালয়ের অরণ্যে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। কালে তাঁহার সাধনার সিদ্ধি হইল; তিনি দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেই সকল অস্ত্রাগ্নিতে সেই তপোবন দগ্ধ করিতে লাগিলেন—

যৈস্তৎ তপোবনং নাম নিদগ্ধং চাস্ত্রতেজসা।

বিশ্বামিত্রের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ বিধূম কালাগ্নির ন্যায় তাঁহার দণ্ড উত্তোলন করিলেন। তখন প্রবল জলধারা যেমন অনায়াসে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, বশিষ্ঠের দণ্ড সেইরূপ বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্রানল নির্ব্বাপিত করিল। তখন হতমান বিশ্বামিত্র দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানি মে॥ —বালকাণ্ড, ৫৬।২৩

তখন বিশ্বামিত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিব, এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ তিনি রাজর্ষি পদে উন্নীত হইলেন। কিন্তু তথাপি সময়ে সময়ে কাম ক্রোধের বেগ তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র নিজের রজঃপ্রধান প্রকৃতি শোধিত করিয়া সত্ত্ব-প্রধান হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—

অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তাবদ্ যাবদ্ধি মেহপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জ্জিতম্॥—বালকাণ্ড, ৬৪।১৮।

যে কথা সেই কাজ। বিশ্বামিত্র তাহাই করিলেন। তপস্যার অগ্নিতে তাঁহার সমস্ত চিত্ত-মল বিশোধিত হইল। দেবতারা তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভের অনেক উপকরণ উপস্থিত করিলেন; কিন্তু বিশ্বামিত্র কিছুতেই বিচলিত হইলেন না—

ন হ্যস্য বৃজিনং কিঞ্চিৎ দৃশ্যতে সুক্ষ্মমপ্যত।

তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষি! তোমার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে, তুমি তীব্র তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ, তুমি দীর্ঘ আয়ুঃ গ্রহণ কর।"

ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক!

ইহাই পুরাণোক্ত বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ব ইতিহাস। এই কাহিনী হইতে আমরা দেখিলাম যে, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র পৌরুষ দ্বারা সেই জন্মেই নিজের জাতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা গেল, পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া প্রারব্ধ-নির্দ্দিষ্ট জাতির পরিবর্ত্তন করা যায়। অবশ্য, এই জাতি-পরিবর্ত্তন ব্যাপারে তাঁহাকে অনেক বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, অনেক সাধন, সংযম ও

তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, 'প্রকৃতিঃ দুস্ত্যজা'। বিশ্বামিত্রের শবলাসংক্রান্ত এবং মেনকাঘটিত আচরণে আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার প্রকৃতি বিশেষ রজোনুবিদ্ধ ছিল। সেই প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রজোলেশহীন, সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণপ্রকৃতিতে পরিণত করিতে অনেক উদ্যম ও আয়োজনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

অতঃপর আমরা মহাভারতোক্ত সাবিত্রীর আখ্যানের আলোচনা করিব এবং দেখিব, শুদ্ধিমতী সাবিত্রী এক বৎসরের ব্রতানুষ্ঠানে কিরূপে সত্যবানের প্রারব্ধ-নির্দ্দিষ্ট আয়ুর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মদ্ররাজ অশ্বপতি সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিয়া এক তেজস্বিনী কন্যা লাভ করেন। ইনিই লোকবিশ্রুতা পাতিব্রতার আদর্শ সাবিত্রী। ক্রমে সাবিত্রীর বিবাহের বয়স হইল। কিন্তু সেই কাঞ্চনী প্রতিমার তেজো-দীপ্ত রূপরাশি দেখিয়া কেহই তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে পারিল না—

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ॥ —বনপর্ব্ব, ২৯৪।২৮

তখন অশ্বপতি নিরুপায় হইয়া কন্যাকে অনুমতি দিলেন, "তুমি স্বয়ং আপনার সদৃশ পতির অন্বেষণ কর" এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগকে সঙ্গে দিয়া রথারোহণে সাবিত্রীকে দেশভ্রমণে প্রেরণ করিলেন। সাবিত্রী এক তপোবনে বনবাসী রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং পিতার অনুমতি লইবার জন্য রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। অশ্বপতির সভায় সেই সময় দেবর্ষি নারদ উপস্থিত ছিলেন। নারদ সত্যবানের পরিচয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাবিত্রী না জানিয়া মহৎ অনিষ্টের আচরণ করিয়াছেন—"

অহোবত মহাপাপং সাবিত্র্যা নৃপতে কৃতম্।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কারণ ?" ঋষি বলিলেন, "সত্যবান্ সমস্তগুণের

আধার। তিনি বদান্য, তেজস্বী, ধীমান্, ক্ষমাশীল, শান্ত, দান্ত, সংযত, সত্যবাদী, দ্যুতিমান্, বীর্য্যবান্, সুশীল, সুন্দর—সমস্তই, কিন্তু তাঁহার এক গুরুতর দোষ আছে—

এক এবাস্য দোষোহি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম ॥
একো দোষোঽস্তি নান্যোঽস্য সোঽদ্যপ্রভৃতি সত্যবান্।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥—বনপর্ব্ব, ২৯৫।২২-২৩

—দোষ এই, তিনি অল্পায়ুঃ। অদ্য হইতে একবৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রযত্ন দ্বারা এ মৃত্যু নিবারণ করিবার নহে।"

তখন অশ্বপতি সাবিত্রীকে বলিলেন, "এরূপ অল্পায়ুঃ ভর্ত্তা কখনই গ্রহণ করিও না। অন্য বর গ্রহণ কর।"

সাবিত্রী বলিলেন, "যাঁহাকে মনে মনে একবার বরণ করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না। সত্যবান্ই আমার পতি; আমি তাঁহারই পত্নী—"

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ অগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥—বনপর্ব্ব, ২৯৫।২৭

পিতা দেখিলেন, কন্যার পণ টলিবার নহে; তখন তিনি সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।"

তখন যথাশাস্ত্র সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সাবিত্রী সমুদয় রত্নালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ও কাষায়বস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং আদর্শ বধূরূপে সেই বনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কি শয়নে, কি জাগরণে, সর্ব্বদাই নারদের সেই অমোঘ বাণী তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বৎসর শেষ হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে

সত্যবানের আয়ুঃপূর্ণ হইয়া আসিল। সাবিত্রী দিন গণিতেছেন—সত্যবানের পরমায়ু শেষ হইতে আর চারদিন মাত্র বাকী—

চতুর্থেঽহনি মর্ত্তব্যমিতি সংচিন্ত্য ভামিনী।
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাঽভবৎ ॥—বনপর্ব্ব, ২৯৭।৩

তখন সাবিত্রী ত্রিরাত্রব্রত গ্রহণ করিয়া দিন রাত উপবাসী রহিলেন। শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী ব্রত ভঙ্গ করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না।

চতুর্থ দিবসে উপবাসক্লিষ্টা সাবিত্রী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় লক্ষিতা হইতে লাগিলেন। আজ সেই চতুর্থ দিবস! সত্যবানের নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুদিন! সত্যবানের নিয়ম ছিল, পিতা মাতার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে তিনি সূর্য্যোদয়ের পর কুঠার স্কন্ধে অরণ্যে যাইতেন। সাবিত্রী কখনও স্বামীর সঙ্গে বনে যান নাই। আজ তিনি শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অনুমতি লইয়া স্বামীর সঙ্গিনী হইলেন এবং বলিলেন, "কুসুমিত বন দেখিতে তাঁহার বড় সাধ—"

বনং কুসুমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥

*　　*　　*

সহ ত্বয়া গমিষ্যামি নহি ত্বাং হাতুমুৎসহে ॥

বনে কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে করিতে সত্যবানের ভীষণ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল এবং তিনি মৃত্যুর ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া সাবিত্রীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া কালনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। পরমুহূর্ত্তে সাবিত্রী দেখিলেন, সত্যবান্‌কে লইবার জন্য পাশহস্তে স্বয়ং যম দণ্ডায়মান। যম বলিলেন, "সাবিত্রী তোমার ভর্ত্তার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, আমি তাহাকে লইতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া যম সত্যবানের সূক্ষ্মশরীর আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ দিকে যমালয়ের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—

ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎপাশবদ্ধং বশংগতম্ ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥—বনপর্ব্ব, ২৯৮।১৭

সাবিত্রী যমের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যম তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—

নমে প্রতিহতা গতিঃ—

"আমার স্বামী যেস্থানে নীত হইবেন আমিও সেস্থানে গমন করিব। ইহাই সনাতন বিধি"—

যত্রমে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥—বনপর্ব্ব, ২৯৮।২২

যম বলিলেন, "জীবিত কি মৃতের অনুসরণ করে? সাবিত্রী ফিরিয়া যাও।"

সাবিত্রীর সেই এক উত্তর—

যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।

যম বলিলেন, "যে বর চাও দিব। তোমার অপুত্রক পিতার পুত্র হইবে। রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুর আবার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; কিন্তু সত্যবানের জীবন ফিরাইয়া দিতে পারিব না।"

সাবিত্রী বলিলেন, "পতিবিহীনা হইয়া আমি সুখ কামনা করি না; পতিবিহীনা হইয়া আমি স্বর্গ কামনা করি না; পতিবিহীনা হইয়া আমি ঐশ্বর্য্য কামনা করি না; পতিবিহনে আমি জীবন্মৃত। অতএব আমার জীবনে কি প্রয়োজন? আমার পতিকে ফিরাইয়া দিন, এই বর আমি চাই।"

বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
যথা মৃতা হ্যেবমহং পতিংবিনা।—বনপর্ব্ব, ২৯৮।৫৩

যম নিরুপায়। তিনি ত' ধর্ম্মরাজ। সাবিত্রীর নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও ধর্ম্মের তেজঃ তাঁহাকে পরাজিত করিল। তিনি বলিলেন, "তথাস্তু"—

এষ ভদ্রে ময়া মুক্তো ভর্ত্তা তে কুলনন্দিনি !

"এই আমি তোমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিলাম; তুমি ইঁহাকে স্বচ্ছন্দে লইয়া যাও।"

তখন মোহাচ্ছন্ন সত্যবানের দেহে চেতনার সঞ্চার হইল এবং তিনি সুপ্তোত্থিত হইয়া সাবিত্রীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সাবিত্রীর ত্রিরাত্র-ব্রত উদ্যাপিত হইল। তিনি প্রযত্ন ও পৌরুষ দ্বারা প্রারব্ধ-নির্দ্দিষ্ট স্বামীর অল্পায়ুঃ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিলেন—

চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুর্মে ভর্ত্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্।
ভর্ত্তুর্হি জীবিতার্থং তু ময়া চীর্ণং ত্বিদং ব্রতম্ ॥—বনপর্ব্ব, ২৯৯,৪২

সাবিত্রীর এই পতিব্রতা-কীর্ত্তি ভারতীয় সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া মহাভারতকার স্বয়ং বলিয়াছেন—

এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূঃ শ্বশুর এব চ।
ভর্ত্তুঃ কুলং চ সাবিত্র্যা সর্ব্বং কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধৃতং ॥—বনপর্ব্ব, ৩০০।১

অতঃপর আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে ধ্রুব-চরিত্রের আলোচনা করিব। সেই আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বিশ্বামিত্র যেমন পুরুষকার দ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সাবিত্রী যেমন পুরুষকার দ্বারা আয়ুর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ধ্রুব সেইরূপ পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধ-নিরূপিত ভোগের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উত্তানপাদ রাজার দুই পুত্র ছিল—ধ্রুব ও উত্তম। ধ্রুব 'দুয়ো'রাণী সুনীতির গর্ভজাত, এবং উত্তম 'সুয়ো'রাণী সুরুচির গর্ভজাত—

ন নাতি-প্রীতিমান্ তস্যাং তস্যাশ্চাভূদ্ ধ্রুবঃ সুতঃ।—বিষ্ণুপুরাণ, ১।১১।৩

একদিন শিশু ধ্রুব ভ্রাতা উত্তমকে পিতার অঙ্কে আরূঢ় দেখিয়া আপনিও তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে লালসা করে—

রাজাসনস্থিতস্যাঙ্কং পিতুর্ভ্রাতরমাস্থিতম্।

দৃষ্ট্বোত্তমং ধ্রুবশ্চক্রে তমারোঢুং মনোরথং ॥—১।১১।৪

কিন্তু ধ্রুবের বিমাতার ভয়ে স্ত্রীবশ পিতার তাহাকে ক্রোড়ে করিতে সাহস কুলায় নাই—

প্রত্যক্ষং ভূপতি স্তস্যাঃ সুরুচ্যা নাভ্যনন্দত।

ইহাতে বিমাতা সুরুচি তীব্র বাক্যবাণে ধ্রুবের কোমল হৃদয় বিদ্ধ করিয়া তাহাকে টিটকারি দিয়া উপহাস করিল—

ক্রিয়তে কিং বৃথা বৎস। মহান্ এব মনোরথঃ।

অন্যস্ত্রীগর্ভজাতেন অসম্ভূয় মমোদরে ॥

উচ্চৈমনোরথস্তেঽয়ং মৎপুত্রস্যৈব কিং বৃথা।

সুনীত্যাম্ আত্মনো জন্ম কিন্ত্বয়া নাবগম্যতে ॥—১।১১।৭,১০

"বৎস! তোমার একি উচ্চ দুরাশা? তুমি ত' আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই—তবে সিংহাসনে বসিতে চাও কেন? এ দুর্লভ আসন আমার পুত্রেরই যোগ্য। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, তোমার জন্ম সুনীতি হইতে?"

তং দৃষ্টবা কুপিতং পুত্রম্ ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধরং।

সুনীতি রঙ্কমারোপ্য মৈত্রেয়ৈতদ অভাষত ॥

ধ্রুব ক্রুদ্ধ হইয়া জননীর সকাশে গেলে জননী তাহাকে অনেক প্রকারে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

নোদ্বেগস্তাত কর্ত্তব্যঃ কৃতং যৎ ভবতাপুরা।
তৎ কোপহর্ত্তুং শক্নোতি, দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া ॥
রাজাসনং তথাচ্ছত্রং, বরাশ্বা বরবারণাঃ
যস্য পুণ্যানি তস্যৈব তে তস্মাৎ শাম্য পুত্রক ॥
—১।১১।১২, ১৭-৮

সুনীতি বলিলেন—"বৎস! তুমি ইহাতে দুঃখ করিও না। তুমি জন্মান্তরে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছ কে তাহার অন্যথা করিতে পারে? এবং যে কর্ম্ম কর নাই, কে তাহারই বা ফল দিতে পারে? দেখ, রাজ্য ও রাজভোগ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরই লাভ হয়। তোমার পুণ্য নাই, সে জন্য লাভ হয় নাই। ইহাতে দুঃখ কেন? আর—

যদিবা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব
তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে।
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ ॥—১।১১।২২-৩

'আর যদিই বিমাতার বাক্যে এত দুঃখ হইয়া থাকে, তবে অভীষ্ট-ফলপ্রদ পুণ্য-সঞ্চয়ে যত্নপর হও। সুশীল, ধর্ম্মাত্মা, মৈত্রীভাবশালী হও, সকল প্রাণীর হিতানুষ্ঠান কর। তবেই জল যেমন নিম্ন ভূমিকে আশ্রয় করে, এইরূপ তুমি সকল সম্পদের আস্পদ হইবে।

এই উপদেশগুলি অতি সারগর্ভ। ইহার মধ্যে দৈববাদ ও পুরুষকারের অপূর্ব্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয়। মানুষের অবস্থা জন্মান্তরীণ সুকৃত দুষ্কৃতের ফল। ধ্রুবের জন্মান্তর-কৃত পুণ্য সঞ্চয় ছিল না। সেই জন্য সে রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টের নিয়মন করা যায়। ক্রিয়মাণ সুকৃত দ্বারা সঞ্চিত দুষ্কৃতের রোধ করা যায়। সেই জন্য ধ্রুবের জননী উপদেশ দিলেন, 'পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নশীল হও, তবেই অভীষ্ট লাভ করিবে।' মানুষের ক্রিয়মাণ কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণ অদৃষ্টাধীন হইত, মানুষের সঞ্চিত কর্ম্ম যদি ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অবশ্য-নিয়ামক হইত, তবে এ উপদেশে কোন সার আছে বলা যাইত না। আর এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া ধ্রুব অতি ত্বরায় সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রতিকূল অদৃষ্ট-শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারিত না।

ধ্রুব পুরুষকারের অবতার। সে জননীর উপদেশ-বাণী শিরোধার্য্য করিয়া দৃঢ়তা সহকারে বলিল—

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতা মপি পূজিতম্॥
নান্যদত্তমভীপ্স্যামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম॥—১।১১।২৫, ২৮

'আমি এরূপ যত্ন করিব, এরূপ অধ্যবসায় ও পুরুষকার প্রয়োগ করিব, যাহাতে সকল জগতের পূজিত সর্ব্বোত্তম স্থান লাভ হয়। জননি! অন্যের দান গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি না। আমার পিতাও যে স্থান প্রাপ্ত হন নাই, এরূপ স্থান আমি স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জন করিব।'

ধ্রুব কার্য্যতঃ তাহাই করিল।

নির্জগাম গৃহাৎ মাতুরিত্যুক্ত্বা মাতরং ধ্রুবঃ।
পুরাচ্চ নিষ্ক্রম্য ততস্তদ্ বাহ্যোপবনং যযৌ॥

ধ্রুব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তপস্যার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং মুনিগণের নিকট ধ্যানের উপদেশ লাভ করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল। এইরূপে পুরুষকারের প্রয়োগ করিয়া সে ছয় মাসের মধ্যে এতাদৃশ পুণ্যোপচয়-সম্পন্ন হইল যে, স্বয়ং বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ হইলেন এবং তাহাকে উচ্চতম ধ্রুবলোকে কল্পকাল অবস্থান করিবার অধিকার দিলেন। ভগবান্ বলিলেন—

সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাৎ বৃহস্পতেঃ।
সিতার্ক তনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্॥
কেচিৎ চতুর্যুগং যাবৎ কেচিৎ মন্বন্তরং সুরাঃ।
তিষ্ঠন্তি ভবতো দত্তা ময়া বৈ কল্পসংস্থিতিঃ॥—১।১২।৯১, ৯৩

'রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি সকল গ্রহ, সকল

তারাগণের ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোকে তোমার স্থান হইবে। কাহারও স্থিতি চতুর্যুগ-পর্য্যন্ত, কেহ মন্বন্তর-স্থায়ী; কিন্তু তুমি কল্পান্ত কাল ধ্রুবলোকে অবস্থান করিবে।'

মানুষের কার্য্য যদি অদৃষ্টাধীন হইত, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের যদি কোন স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা না থাকিত, মানুষ যদি ইহ-জন্মে পুরুষকার দ্বারা জন্মান্তরীয় অদৃষ্টের নিরোধ করিতে না পারিত, তবে কি এরূপ ঘটিতে পারিত? তবে কি ধ্রুব স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা উৎকট পুণ্যোপচয়-সম্পন্ন হইয়া কল্পকাল সর্ব্বোত্তম ধ্রুব-লোকে বসতি করিবার উচ্চ অধিকার সঞ্চয় করিতে পারিত?

সতি মূলে:তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র

'প্রারব্ধের ফলে জীবের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ নিয়মিত হয়।' এ কথা সত্য বটে, কিন্তু আমরা দেখিলাম, প্রযত্ন ও পৌরুষ দ্বারা প্রারব্ধ-জনিত ঐ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ—সমস্তেরই পরিবর্ত্তন করা যায়; এবং করা যায় বলিয়াই, মানুষ অদৃষ্টের ক্রীড়া-পুতুল নহে—সে ভাগ্যের নিয়ামক।

একাদশ অধ্যায়

কর্ম্মের নিবৃত্তি

আমরা দেখিয়াছি, কর্ম্ম অনাদি। কোন্ অতীত কল্পে, কি সূত্রে, কেমন করিয়া কর্ম্মের আরম্ভ হইল, তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

তাসাম্ অনাদিত্বম্ আশিষো নিত্যত্বাৎ—যোগসূত্র।

কর্ম্ম যেমন অনাদি, কর্ম্ম কি সেইরূপ অনন্ত? আমরা জানিয়াছি, ভোগ ভিন্ন কর্ম্ম ক্ষয় হয় না।

শুভাশুভঞ্চ যৎকর্ম্ম বিনা ভোগান্ন তৎক্ষয়ঃ।

খ্রীষ্টীয় সাধু সেণ্ট পলের (St. Paul) ভাষায় বলিতে গেলে—Whatever a man soweth that he shall also reap অর্থাৎ 'যেমন বপন, তেমনি ফলন' অথবা 'যেমন চাষ, তেমনি গ্রাস।'

পূর্ব্ব জন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছি, ইহজন্মে তাহার ভোগ করিতেছি; আবার ইহজন্মে যে কর্ম্ম করিব, পরজন্মে তাহার ভোগ করিব। এইরূপ কর্ম্ম-বীজ হইতে জন্ম-বৃক্ষ, আবার জন্ম-বৃক্ষ হইতে কর্ম্ম-বীজ, আবার জন্ম, আবার ভোগ—এইরূপ কর্ম্মধারা অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। এ ধারার কি নিবৃত্তি নাই? অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জীবকে কি এই কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইবে, অথবা এ নাটকের যবনিকা আছে? *

* অন্যথা অনাদিকাল-প্রবৃত্তানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ—শঙ্করঃ

আমরা জানিয়াছি, কর্ম্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। প্রথমতঃ আমাদের আলোচ্য এই যে, ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নিবৃত্তি হইতে পারে কি না? ইহ জন্মে আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহাই ক্রিয়মাণ কর্ম্ম। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বিষয়ে আমাদের যখন স্বাধীনতা আছে, তখন সর্ব্ববিধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, 'নৈষ্কর্ম্ম্য' অবলম্বন করিয়া, এ পাপ চুকাইয়া দিই না কেন? কর্ম্মই যখন আমাদের বন্ধ-হেতু—কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ—পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ যে কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, যখন তাহার ফল ভুগিতে হইবেই—

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্

—তখন স্বেচ্ছায় এ পাশ গলায় বাঁধি কেন? আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করি, আর নূতন কর্ম্মের কর্ত্তা হইব না—উদাসীন-নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব। তাহা হইলেই কি ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে?

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, ব্যাপারটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নহে। সে জন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥—৩।৫

'কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জীব ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয়।' যতদিন দেহ, ততদিন কর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ—গীতা, ১৮।১১

'দেহধারী জীব কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না।' যে হেতু—

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ্ হ্যকর্ম্মণঃ।

'কর্ম্ম ব্যতিরেকে শরীর-যাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না।'

আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু চেষ্টনাই কর্ম্ম নহে—ভাবনা এবং বাসনাও কর্ম্ম। আমি হাত পা গুটাইয়া স্থূলদেহের কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার কি 'নৈষ্কর্ম্ম্য' হইল? আমি দেহকে কর্ম্মবিরত করিয়া মনকে কর্ম্মনিরত করিলাম; বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া, অন্তরে কাম্য বস্তুর ধ্যান করিতে লাগিলাম। ফলে আমি মিথ্যাচারী হইলাম।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥—গীতা, ৩।৬

অতএব বুঝা গেল, কর্ম্মনিবৃত্তির এ পথ নহে। অন্য পন্থা আছে কি?

বীজের সহিত আমরা কর্ম্মের তুলনা করিয়াছি। উর্ব্বর ক্ষেত্রে সজীব বীজ বপন করিলে, তাহা অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু যদি কোন উপায়ে ক্ষেত্রকে ঊষর করা যায় এবং বীজকে দগ্ধ বা ভর্জ্জিত করা যায়, তবে আর তাহা হইতে অঙ্কুর হয় না। আমার চিত্তক্ষেত্রকে ঊষর করিবার এবং কর্ম্ম-বীজকে নির্জ্জীব করিবার কোন উপায় আছে কি?

ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।

'বুদ্ধিযোগ দ্বারা পাপপুণ্য উভয়েরই বারণ করা যায়।' এই বুদ্ধিযোগ কি?

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥—গীতা, ৪।১৯-২০

'যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে 'পণ্ডিত' বলেন।' যিনি 'পণ্ডিত' তিনিই বুদ্ধিযোগযুক্ত।

'তিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরালম্ব হইয়াছেন, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন না।'

এইরূপ কর্ম্মের কৌশলকে কর্ম্ম-যোগ বলে—

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

এই কর্ম্মযোগে আরোহন করিতে হইলে পর পর তিনটী সোপান অতিক্রম করিতে হয়।*

প্রথম, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন।

গীতা বলিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।—২।৪৭

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার; ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখিও না।'

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।— ৩।১৯

'অতএব অনাসক্ত হইয়া (ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া) কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।'

যিনি এই ভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহার নিকট জয়-পরাজয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান হয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।—গীতা, ২।৪৮

যাঁহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে এইরূপ সমান জ্ঞান হইয়াছে, তিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মপাশে বদ্ধ হন না—

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।—গীতা, ৪।২২

কর্ম্মযোগের ইহাই প্রথম সোপান।

কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় সোপান—কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ। কর্ম্ম যে

* আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে আমি এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এখানে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিলাম মাত্র।

পাশরূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কার-বুদ্ধি—আমি করিতেছি, এই অভিমান।

এই অহঙ্কার-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে—এইরূপ মনে করিতে হইবে যে, আমি কিছুই করিতেছি না—ইহা ধারণা করিতে হইবে যে, কর্ম্ম ব্যাপারে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে মাত্র।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।

* * *

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥—গীতা, ৫।৮-৯।

'যিনি সকল কর্ম্ম প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আপনাকে অকর্ত্তা দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী, তিনিই বুদ্ধিযুক্ত।'

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্ত্তারম্ স পশ্যতি ॥—গীতা, ১৩।৩০

এইরূপে যিনি আমিত্বের নিষ্কাসন করিয়াছেন তাঁহার কি হয়?

গীতা বলেন—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥—১৮।১৭

'যাঁহার অহঙ্কার বুদ্ধি নাই, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হন না।'

কর্ম্মযোগের তৃতীয় সোপান—ঈশ্বরার্পণ—ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণ।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥—গীতা,১৮।৫৭

'চিত্তদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও।'

গীতা আরও বলিতেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥—গীতা, ৯।২৭

'যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে—অশন, যজন, দান, তপস্যা,—সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিবে'। এইরূপ করিলে কি হইবে? তাহা করিলে তুমি শুভ অশুভ সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে—

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।

সেই জন্য গীতা বলিতেছেন—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥—৫।১০

'ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না; যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না।'

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥—গীতা, ৫।৭

'যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, সংযতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মার সহিত একীভূত হইয়াছে,—তিনি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না।

ইহাকেই বেদান্তের ভাষায় অ-শ্লেষ বলে—

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ।

ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩-৪

অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইলে কেবল ক্রিয়মাণ পাপ নয়, ক্রিয়মাণ পুণ্যেরও অশ্লেষ হয়। ইহা উপনিষদের সেই প্রাচীন উপদেশ—

যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।

তদ্‌যথা ঈষিকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েৎ এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে,

সর্ব্বে পাপ্মানোঽতঃ নিবর্ত্তন্তে। উভেউ হৈবৈষ এতে তরতি।

'যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না।

যেমন ঈষিকা-(নল) তুলা অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানী পাপপুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন।'

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ এই শেষোক্ত উপমার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম আর ফলপ্রসূ হয় না। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর আচরিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না।'

সম্যগ্-জ্ঞানাধিগমাদ্ উৎপন্ন-সম্যগ্-জ্ঞানস্য ধর্ম্মাদীনাম্ অকারণ-প্রাপ্তৌ এতানি সপ্তরূপাণি বন্ধনভূতানি সম্যগ্‌জ্ঞানেন দগ্ধানি। যথা নাগ্নিনা দগ্ধানি বীজানি প্ররোহণ-সমর্থানি, এবম্ এতানি ধর্ম্মাদীনি বন্ধনানি ন সমর্থানি—সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য।

বাচস্পতি মিশ্র অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

ক্লেশ-সলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্ম-বীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্বজ্ঞান-নিদাঘ-নিপীত সকল সলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ।

অর্থাৎ 'জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্য্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে ঊষর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই কর্ম্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে ঊষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?'

এইরূপ ভাবে যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহার ক্রিয়মাণ কর্ম্ম আর কর্ম্ম থাকে না—অ-কর্ম্ম হয়।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ সর্ব্ব-কর্ম্মকৃৎ॥—গীতা, ৪।১৮

'যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই কর্ম্ম-যোগী, তিনিই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন।'

এতক্ষণ আমরা কর্ম্মযোগীর 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্মেরই কথা বলিলাম। তাঁহার 'সঞ্চিত' কর্ম্মের কি গতি হয়? তাহার নিবৃত্তি হয় কিনা? বেদান্তসূত্র হইতে আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হইলে ক্রিয়মাণ বা আগামী কর্ম্মের যেমন 'অশ্লেষ' হয়, সঞ্চিত বা অতীত কর্ম্মের সেইরূপ 'বিনাশ' হয়—

তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষ-বিনাশৌ—৪।১।১৩

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

তদধিগমে ব্রহ্মাধিগমে সতি উত্তরপূর্ব্বয়োঃ অঘয়োঃ অশ্লেষ-বিনাশৌ ভবতঃ। উত্তরস্য অশ্লেষঃ, পূর্ব্বস্য বিনাশঃ * * অশ্লেষ ইতি চ আগামিষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বমেব ন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মবিদ্ ইতি দর্শয়তি। অতিক্রান্তেষু তু যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানাৎ কর্তৃত্বং প্রতিপেদে ইব, তথাপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ তান্যপি প্রবিলীয়ন্তে ইত্যাহ বিনাশ ইতি।

অর্থাৎ 'ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অশ্লেষ ও সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ হয়। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সম্বন্ধে যখন তাঁহার কর্তৃত্বই থাকে না, তখন অশ্লেষ ত' হইবেই। অতীত কর্ম্ম সম্বন্ধে অনুষ্ঠান-কালে অজ্ঞানবশে তাঁহার কর্তৃত্ব বুদ্ধি ছিল বটে, কিন্তু এখন বিদ্যার বলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় তাহারও বিনাশ হয়।'

গীতা এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥—৪।৭৩

'হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে।'

জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সঞ্চিতের এই দাহ-প্রক্রিয়ার এখানে একটু আলোচনা

করিলে অসঙ্গত হইবে না। সাধনার উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া সাধক যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করেন, তাহার আলোকে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের অতীত কাহিনী সমস্ত দৃষ্টিগোচর হয়—এক কথায় তিনি জাতিস্মর হন। কোন্ কোন্ জীবের তিনি বা কোন্ কোন্ জীব তাঁহার কি অনিষ্ট করিয়াছে, কাহার কাহার নিকট তিনি কি পরিমাণে ঋণী, অথবা কে কে তাঁহার নিকট কতটা ঋণী, তাহারা এখন কোথায় কি ভাবে আছে, কে কে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে, কে কেই বা ভুবর্লোকে বা স্বর্লোকে বসতি করিতেছে—এ সমস্তই অবগত হন; এবং প্রযত্ন ও পৌরুষ প্রয়োগ করিয়া ক্রিয়মাণ কর্ম্ম দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করেন। ধরুন, জন্মান্তরে তিনি একজনের উপর অত্যাচার করিয়া তাহার বিত্ত অপহরণ করিয়াছিলেন—জাতিস্মর হইয়া দেখিলেন, সে এখন এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থকৃচ্ছ্র ভোগ করিতেছে। তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবেন এবং নানা ভাবে সেই অপহৃত অর্থ চক্রবৃদ্ধির হারে প্রত্যর্পণ করিবেন। অথবা তিনি দেখিলেন, একজন জন্মান্তরে তাঁহাকে অতিশয় যাতনা দিয়াছিল—সেই জন্য তাহার উপর জাতক্রোধের বীজ তাঁহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে। ঐ বীজ ভবিষ্যতে অঙ্কুরিত হইয়া সেই ব্যক্তির সহিত তাঁহার বৈরিতা রচনা করিবে এবং তাহার ফলে সে ব্যক্তি বিপন্ন হইবে। তিনি ইহা লক্ষ্য করিবা মাত্র তাঁহার প্রাপ্য ঐ কর্ম্ম-ঋণ 'মকুব' করিয়া দিবেন এবং জীঘাংসার স্থলে ঐ ব্যক্তির উপর মৈত্রী ও করুণার ভাব পোষণ করিবেন। এইরূপে জ্ঞানী বিপরীত শক্তির প্রয়োগ করিয়া প্রবর্ত্তিত পূর্ব্ব শক্তির প্রতিরোধ করেন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সঞ্চিতকে দগ্ধ করেন। *

* Thus he may neutralise forces coming out of the past by sending against them forces equal and opposite, and may in this way "burn up his Karma by Knowledge".—Ancient Wisdom, p. 356.

সময়ে সময়ে দেখা যায়, সাধু ব্যক্তি—উচ্চশ্রেণীর সাধক—পতিত বা পতিতার সঙ্গী হইয়াছেন, দুর্বৃত্ত বা হীনের সাহচর্য্য করিতেছেন বা অন্তরঙ্গ হইয়াছেন। অজ্ঞ জন এ দৃশ্যে আশ্চর্য্য হয়—নানা অপবাদ রটনা করে। কিন্তু সেই সাধু অবিচলিত চিত্তে স্বকার্য্য সাধন করেন—তাঁহার জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্ম-ঋণের হিসাব নিকাশ করেন। ইহাও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সঞ্চিত-দাহের দৃষ্টান্ত।*

গীতা বলিলেন, 'সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে'—এখানে 'সমস্ত' বলাতে কি বুঝিব? কেবল 'সঞ্চিত' কর্ম্ম, না 'সঞ্চিত' ও 'প্রারব্ধ' উভয়ই? শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

আত্মজ্ঞানস্বরূপোগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি পুণ্যানি পাপানি প্রারব্ধেতরাণি ভস্মীকরোতি।

অর্থাৎ, 'আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধ ভিন্ন আর সমস্ত সুকৃত-দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপকে) ভস্মীভূত করে।'

শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরও ঐ মত—

যেন কর্ম্মণা শরীরম্ আরব্ধং তৎপ্রবৃত্তফলত্বাদ্ উপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যানি অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি, অজ্ঞানসহভাবীনি চ অতীতানেক জন্মকৃতানি চ তান্যেব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

অর্থাৎ, 'সঞ্চিত কর্ম্মের যে অংশ প্রবৃত্ত-ফল (যাহাকে 'প্রারব্ধ' বলে) তদ্‌ভিন্ন যে কিছু কর্ম্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে (অজ্ঞান অবস্থায়) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়।'

* Strange and puzzling lines of action adopted by occultists have sometimes this explanation—the man of knowledge enters into close relations with some person, who is considered by the ignorant by-standers and critics to be quite outside the companionships that are fitting for him, but the occultist is quietly working out a Karmic obligation which would otherwise hamper and retard his progress.
—Ancient Wisdom, p. 271

সেই ভস্মান্ত সঞ্চিত কর্ম্মের আর ফলভোগ করিতে হয় না, তদ্বারা আর জন্মান্তর উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক, ২।২।৮

'সেই পরাবর ব্রহ্ম-বস্তুর দর্শন হইলে, (সঞ্চিত) কর্ম্মের নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়।'

আর প্রারব্ধ কর্ম্ম ? শ্রীশঙ্করাচার্য্য যাহাকে 'প্রবৃত্ত-ফল' বলিয়াছেন ? প্রারব্ধ কর্ম্মের অশ্লেষ বা বিনাশ হয় না, ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় করিতে হয়—

প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট উপদেশ আছে—

ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে।—৪।১।১৯

অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় উক্তঃ। ইতরে তু আরব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—শঙ্কর।

অর্থাৎ 'অপ্রবৃত্ত-ফল যে পুণ্য পাপ—জ্ঞানের বলে তাহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ বা প্রবৃত্ত-ফল যে কর্ম্ম, তাহা ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হয়।'

ঐ পাদের ১৫ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জন্মান্তর-সঞ্চিত কিংবা জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহজন্মকৃত যে সুকৃত-দুষ্কৃত, জ্ঞানাধিগমে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যে প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা এ জন্মের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, ভোগ ভিন্ন তাহার ক্ষয় হয় না।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ —৪।১।১৫

অপ্রবৃত্তফলে এব পূর্ব্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃত-দুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়তো ন ত্বারব্ধকার্য্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যামেতদ্ ব্রহ্ম-জ্ঞানায়তনং জন্ম নির্ম্মিতম্—শঙ্করভাষ্য

এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্য তত্ত্বজ্ঞানীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা

তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্র, যাঁহারা মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু সিদ্ধির উচ্চ চূড়ায় এখনও আরোহণ করিতে পারেন নাই,—যেমন নল-রাজা, যুধিষ্টির প্রভৃতি—প্রারব্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ ভোগ হয়? লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই শ্রেণীর অনেক সাধককেই ইহজীবনে অতিগুরু দুঃখের পসরা বহন করিতে হয়। যেন বিধাতা বাছিয়া বাছিয়া ত্রিতাপের ত্রিশূলে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করেন—তাঁহাদিগকে অত্যধিক দুঃখ-দুর্দ্দশার ভাগী করেন। ইঁহাদিগের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে, 'যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।' কেন এরূপ হয়? কর্ম্মের এ কি বিচিত্র বিধান!

কর্ম্ম সম্বন্ধে অমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখিলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে না। কর্ম্ম-বিধাতা-দিগের বিধান এই যে, যাহার যতটা ভার সহিবার যোগ্যতা, তাহার অধিক-ভার তাঁহারা তাহার উপর চাপান না। কারণ, সামর্থ্যের অধিক চাপাইলে সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং জন্মান্তরের যে মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ—সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সে জন্য বাইবেলে একটী বেশ কথা আছে যে, ভগবান্ মুণ্ডিত মেষের জন্য বায়ুর বেগ মন্দীভূত করেন, নতুবা শীতার্ত্ত হইয়া সে বিপ্লুত হইবে।*

অতএব সাধারণ জীবের জন্য ব্যবস্থা এই যে, তাহার জন্মান্তরকৃত দুষ্কৃতের অল্প মাত্রাই ইহ জন্মে ভোগের জন্য প্রারব্ধের মধ্যে নিবিষ্ট হয়। কারণ, সাধারণ জীব অত্যধিক কষ্টের বেগ সহিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখা যায়, কেহ সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া অ-সাধারণ হইতে আরম্ভ

* Heaven tempers the wind to the shorn lamb.

করিয়াছেন, এবং অচিরে জীবন্মুক্তির সমীপস্থ হইবেন, তখন কর্ম্মবিধাতারা তাঁহার উপচীয়মান সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঞ্চিত দুষ্কৃতের মধ্য হইতে আরও আরও দুষ্কৃত বাছিয়া লইয়া প্রারব্ধের সহিত যোগ করিয়া দেন। ফলে, সাধারণ জীবন যাপন করিলে যে সকল দুষ্কৃতের ফলভোগ একাধিক ভাবী জন্ম ব্যাপিয়া ভোগ করিতে হইত, সে সমস্তই ইহ জন্মের প্রারব্ধের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং এই শ্রেণীর সাধক বিধাতার দান বলিয়া অম্লানমুখে সেই সব দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন।

এই কর্ম্ম-নিবৃত্তির প্রসঙ্গে প্রাচীন দার্শনিকেরা আর একটা প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইলে যখন অভিমান ও অহঙ্কার তিরোহিত হইয়া যায়, তখন জীবন্মুক্ত সাধকের শরীর কিরূপে বিধৃত থাকে? সাংখ্যকারিকায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কুমারের চাক ঘুরাইয়া কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে। ঘট প্রস্তুত হইয়া গেলেও ঘটের যে Momentum বা বেগাখ্য সংস্কার, সেই সংস্কার বশে চক্র ঘুরিতে থাকে। এইরূপ জীবন্মুক্তের যে শরীর-যাত্রা তাহা সংস্কার বশেই নিষ্পন্ন হয়—সে কেবল শারীর কর্ম্ম—তাহার সহিত তাঁহার চিত্তের যোগ থাকে না—

শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্। —গীতা, ৪।২১

ঈশ্বরকৃষ্ণের উক্ত কারিকা এবং বাচস্পতিমিশ্রের টীকা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণ প্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমবদ্ধৃতশরীরঃ ॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৭

যথোপরতেঽপি কুলালব্যাপারে চক্রং বেগাখ্যসংস্কারবশাদ্ ভ্রমন্ তিষ্ঠতি কাল পরিপাকবশাত্তূপরতে সংস্কারে নিষ্ক্রিয়ং ভবতি। শরীরস্থিতৌচ প্রারব্ধপরিপাকৌ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারঃ।

অর্থাৎ, 'জীবন্মুক্তের শরীর ধারণপক্ষে অভুক্ত প্রারব্ধরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মই সংস্কার স্থানীয়।

শঙ্করাচার্য্য এ কথা অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

বাধিতমপি তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎকালম্ অনুবর্ত্তত এব্য

—৪।১।১৫ সূত্রের ভাষ

কিন্তু তিনি বলেন, এ বিষয় লইয়া বিতর্ক করা উচিত নহে।

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদা কঞ্চিৎ কালং শরীরং ধ্রিয়তে ন বা ধ্রিয়তে ইতি। কথং হি একস্য স্বহৃদয়প্রত্যয়ং ব্রহ্মবেদনং দেহধারণং বা অপরেণ প্রতিক্ষেপ্তু শক্যেত।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মজ্ঞান স্বহৃদয়বেত্ত। ব্রহ্মজ্ঞানীর কতদিন এবং কিরূপে শরীর ধারণ হয় তাহা লইয়া বিবাদ করা সঙ্গত নহে।' কারণ, এসম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ এই যে—

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে। অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে, তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ—ত্রিবিধ কর্ম্মেরই নিবৃত্তি হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহার আর জন্মান্তরের প্রয়োজন থাকে না।*

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর মনুসংজ্বরেৎ।—বৃহ, ৪।৪।১২

* Karma can then no longer hold it ; Karma can then no longer bind it ; th wheel of cause and effect may continue to turn, but the soul has become the liberated Life—Karma, p 66.

জন্মান্তর

প্রথম অধ্যায়

জন্মান্তরের প্রমাণ

প্রথম খণ্ডে, কর্ম্মবাদের আলোচনায়, আমাদিগকে অনেকবার জন্মান্তরের দোহাই দিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ যদি জন্মান্তর অসিদ্ধ হয়, তবে কর্ম্মবাদ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। আর্য্যঋষির মনীষাপ্রসূত তত্ত্বমন্দিরের ধারণ-স্তম্ভ দুইটি—কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর। আমরা কর্ম্মবাদের আলোচনা শেষ করিয়াছি, অতঃপর জন্মান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মহাভারতকার বলিয়াছেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।

মৃত্যু মানবজীবনের নিত্য ঘটনা—অতি পরিচিত ব্যাপার।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ—গীতা

জন্মিলেই অবধারিত মৃত্যু। মরণ জীবনের যমজ ভাই।

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর! দেহেন সহ জায়তে।

সেই জন্য ভক্তকবি রামপ্রসাদ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে?" এ প্রশ্ন মানবের চিরন্তন প্রশ্ন। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের নিভৃত তপোবনেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল,—

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম।

এই যে সে দিন এ যুগের মহা কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ জীব বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিল—দিনের পর দিন সে দৃশ্য দেখিয়া সেই প্রাচীন প্রশ্ন আবার প্রবল ভাবে মানুষের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে—বল্ দেখি ভাই কি হয় মলে ?

যাঁহারা জড়বাদী, দেহের অতিরিক্ত দেহী মানেন না, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পরমাণুর যদৃচ্ছাজাত সংযোগে এই জগৎ গঠিত হইয়াছে, যাঁহারা বলেন চিন্তা মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র, যাঁহাদের মতে দেহের নাশেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। কিন্তু সে উত্তর যুক্তিসহ নহে, এবং প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ঘটনার সহিত তাহার মিল নাই। ঐ মতের অসারতা প্রতিপাদন করিবার স্থান এ নহে। এখানে আমরা সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না। সম্প্রতি আমরা মানিয়া লইব যে,—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চান্যে। —কঠ, ১।২০

'জীব মৃত হইলে মানুষের মধ্যে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কেহ বলে থাকে, কেহ বলে থাকে না'—এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। আমরা মানিয়া লইব যে, জীব অবিনাশী—দেহের নাশে তাহার নাশ হয় না। আমরা মানিয়া লইব যে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্য আছে, দেহভঙ্গেও সেই চৈতন্যের অবসান হয় না। আমরা স্বমতের পোষণ জন্য এ স্থলে কেবল আর্য্য ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব।

আমরা জানি, আর্য্যঋষিরা দেহের অতিরিক্ত দেহী মানিতেন। তাঁহাদের মতে শরীর অনিত্য, কিন্তু যিনি শরীরী—শরীরের অধিষ্ঠাতা, সেই জীব নিত্য। শরীর নশ্বর, বিনাশী ; কিন্তু তিনি অবিনাশী, অবিনশ্বর। শরীরের নাশে তাঁহার নাশ হয় না।

মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরম্ আত্তং মৃত্যুনা।
তদস্য অশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্।—ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

'এই শরীর মর্ত্ত্য, মৃত্যুগ্রস্ত; ইহা অশরীর, অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান।' আর্য্যঋষিদিগের শিক্ষা এই যে, জীব অজর, অমর, অক্ষর।

স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ।—কৌষীতকী।

জীবের জন্ম-মৃত্যু নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, অপচয়-উপচয় নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ॥
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥—গীতা ২।২০

'জীব অজ নিত্য পুরাতন সনাতন।'

সম্প্রতি আমরা আর্য্য ঋষির এই উপদেশ সত্য বলিয়া মানিয়া লইব। ঐ মতের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা যাইতে পারে, তাহা করিব না। কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠিবে, দেহের নাশ হইলে আত্মার কি গতি হয়? যাঁহারা চৈতন্যবাদী, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর ত্রিবিধ। প্রথম উত্তর এই যে, জীব মহাচৈতন্যের বিন্দু—দেহনাশে ঐ বিন্দু সিন্ধুতে মিশাইয়া যায়। ঘটের নাশে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিত হয়, সেইরূপ দেহের নাশে জীব-চৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্যে একাকার হইয়া যায়। তখন জলবিম্ব জলে মিশাইলে জীবের আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। বৌদ্ধেরা যাহাকে নির্ব্বাণ বলেন, হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে বিদেহমুক্তি বলা হইয়াছে, সে এই ধরণের কথা। কিন্তু সে মতেও ঐ নির্ব্বাণমুক্তি অতি উচ্চ অধিকারীর প্রভূত সাধনার চরম পরিণতি। ইহা সাধারণ জীবের আয়ত্ত নহে। তাহা যদি হইল, তবে দেহের নাশে আত্মার আর কি গতি হইতে পারে? খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ বিশ্বাস

এই যে, দেহনাশের পর আত্মা লোকান্তরে গমন করিয়া কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে উচ্চ বা নিম্ন লোকে, স্বর্গে বা নরকে চিরদিনের জন্য বসতি করে। হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি মৃত্যুর পর জীবের লোকান্তরগতি অস্বীকার করেন না ; কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, জীব কিছুকাল লোকান্তরে অবস্থান করিয়া পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে, অর্থাৎ জীবের জন্মান্তর হয়। এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, একবার নয়, দুইবার নয়, জীব পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করে।

অবশ্য জীবের এমন এক দিন আইসে, যখন আর তাহাকে ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সে গতাগতির অতীত হইয়া উচ্চতর লোকে স্থিতি লাভ করে। 'ন পুনরাবর্ত্তন্তে'। কিন্তু সে বহু সাধনার কথা, সাধারণ মানুষের কথা নহে। সাধারণ মানুষের পক্ষে উক্তরূপ লোকান্তর-গতি এবং কিছু কাল সেখানে অবস্থানের পর জন্মান্তর। এই জন্মান্তরের প্রমাণ কি ?

জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রমাণের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে এই মতবাদ যে একেবারে অসম্ভব নহে, বিজ্ঞানে যাহাকে working hypothesis বলে সেই ভাবে যে এই মতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তৎপক্ষে পাঠকের চিত্ত প্রবণ করিবার জন্য আমরা কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করিব।

হাক্সলির নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক, বোধ হয় ঐ যুগের ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁহার 'বিবর্ত্তবাদ ও ধর্ম্মনীতি' Evolution and Ethics গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"তরলমতি ভিন্ন অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্ত্তনবাদের

ন্যায় জন্মান্তরবাদও সত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উপমান (Analogy) প্রমাণের দৃঢ় যুক্তির দ্বারা ইহারও সমর্থন করিতে পারা যায়।" পাশ্চাত্য মত যাঁহাদের সোণার কাঠি রূপার কাঠি, হাক্সলির সারগর্ভ কথাগুলির * প্রতি তাঁহারা প্রণিধান করুন। তরলমতির মত তাঁহারা যেন এই সার সত্যকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া না দেন।

এ সম্বন্ধে আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মত উদ্ধৃত করিব। ইনি পোলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক লুটোলস্কি (Lutoslawski)। ইনি প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের উপাসক ছিলেন এবং হেকেল, বুকনার প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া জড়বাদের পক্ষপাতী হয়েন। পরে তিনি দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও তর্কবিদ্যার (Philosophy, Psychology and Logic) আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। এখন তাঁহার নাম য়ুরোপময় বিশ্রুত হইয়াছে। † কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনে কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—যাহার ফলে তিনি জড়বাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার এই Conversion কাহিনী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের Hibbert Journalএ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি উহা আমাদের আলোচ্য নহে।

* Professor Huxley in his "Evolution and Ethics," (p.61, Edition of 1894) observes "None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity. Like the doctrine of Evolution itself, that of transmigration has its roots in the world of reality, and it may claim such support as the great argument of "Analogy" is capable of supplying"

† Prof. Lutoslawski's conversion is a most remarkable one in recent times. He is a professor at the Polish University, Wilno, and a psychologist and logician of European reputation. He has now completed his sixtieth year. He had devoted several years to the study of Chemistry before he took up the study of Philosophy, Psychology and Logic He is an abstract thinker disciplined by both Science and Philosophy. William James once wrote to him, 'you belong to the theoretic life as few men do'.

এই অধ্যাপক লুটোস্লস্কি বলেন যে, জন্মান্তরের যাথার্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় নাই (Absolute certainty of his pre-existence and re-incarnation)। "এ বিষয়ে আমার স্থির নিশ্চয় হইয়াছে যে, এই পৃথিবীতে এবার জন্ম ধারণের পূর্ব্বে আমি জন্মিয়াছিলাম এবং মৃত্যুর পর আবার জন্মাইব। মানব জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা যতদিন না আমার আয়ত্ত হয়, ততদিন বার বার আমাকে এখানে আসিতে হইবে—স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-পরাধীন, নানা অবস্থার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত মানুষের জ্ঞাতব্য আমাকে আত্মসাৎ করিতে হইবে। তবেই আমার নরজন্মের বিরাম হইবে।" *

আর একজন পাশ্চাত্য মনীষার মত উদ্ধৃত করিব। ইনি কবি-সম্রাট্ গেটে (Goethe)। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, গেটে একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কবি ছিলেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনিই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যরথী (most potent literary force of the nineteenth century)। এ হেন গেটের মত উপেক্ষণীয় নহে। গেটে এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, আমি এখন যেমন আছি এইরূপ সহস্রবার ছিলাম। আবার সহস্রবার এই পৃথিবীতে আসিব।' † সেই গীতার প্রাচীন কথা,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!

---

* I cannot give up my conviction of a previous existence on earth before my birth, and that I have the certainty to be born again after my death, until I have assimilated all human experience, having been many times male and female, wealthy and poor, free and enslaved, generally having experienced all conditions of human condition.

† On the occasion of Weiland's funeral (Jan. 25. 1813) Goethe said to Folk—"I am sure that I, such as you see me here, have lived a thousand times and I hope to come again another thousand times."

"হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে।"

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, গ্রীক মনীষী পিথাগোরস, (Pythagoras) প্লেটো (Plato) প্রভৃতিও জীবের জন্মান্তর স্বীকার করিতেন। সেই জন্য অজ্ঞানময় মধ্যযুগে (যখন য়ুরোপ হইতে সত্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল), সেই যুগে পিথাগোরসকে অনেক বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছিল। এমন কি মহাকবি সেক্স্পীয়রও (Shakespeare) একাধিক-বার এই মতবাদকে লইয়া রহস্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন রহস্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে। উত্তরাধিকার-সূত্রে যে মহাকবি সেক্স্পীয়রের আসন অধিকার করিয়াছেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত পাঠককে পূর্ব্বেই উপহার দিয়াছি। অতএব জন্মান্তরবাদ উপেক্ষা করিয়া, অসম্ভব ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া, উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। ধীর-স্থির ভাবে, প্রণিধান সহকারে ইহার আলোচনা করা উচিত।

জন্মান্তর কি সত্য মত? ইহার কি কিছু প্রমাণ আছে? প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম *। যাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষ। জন্মান্তর কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি? যদি না পারি, তবে জন্মান্তরবাদ অনুমানসিদ্ধ কিনা? সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে আমরা ইহার সত্যতা প্রমাণিত করিতে পারি কিনা? ভ্রম-প্রমাদশূন্য তত্ত্বদর্শী আপ্ত-ব্যক্তির উপদেশের নাম আগম। এইরূপ আপ্ত-উপদেশ দ্বারা জন্মান্তর সিদ্ধ হয় কিনা? ঐরূপ উপদেশের সাধারণ নাম শাস্ত্র। শাস্ত্রে ঈশ্বরবাক্য বা ঈশ্বরতুল্য সর্ব্বজ্ঞ ঋষি-দিগের বাক্য নিবদ্ধ আছে; সেই জন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য। শাস্ত্রে জন্মান্তর সম্বন্ধে কি উপদেশ আছে?

* প্রত্যক্ষ=Perception অনুমান=Inference এবং আগম=Authority, (আপ্ত বাক্য)

অবশ্য সকলে আগমের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। যাঁহারা হেতুবাদী (Rationalists), তাঁহারা হয় প্রত্যক্ষ, না হয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সত্যের অবধারণ করিতে চাহেন। তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রের প্রমাণ উপস্থিত করা নিষ্ফল। তথাপি আমরা প্রথমে জন্মান্তর সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্যেরই আলোচনা করিব।

শাস্ত্রের সার—গীতা, 'সর্ব্ব-শাস্ত্রময়ী গীতা।' উপনিষদ্ রূপ গাভীসমূহ দোহন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধিত তৃষিত জীবের জন্য এই গীতারূপ অপূর্ব্ব অমৃত সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই গীতা সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মার জন্মান্তর খ্যাপন করিয়াছেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

'জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলেই জন্ম নিশ্চিত।' এই রূপে জীব পুনঃ পুনঃ জাত ও মৃত হইতেছে। জন্ম মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—এইরূপে পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর ঘূর্ণিচক্রে জীব আন্দোলিত হইতেছে। ইহাকেই বলে জীবের গতাগতি—ভ্রাম্যমান সংসারচক্রের আবর্ত্তন। জীব দেহান্তে সুকৃতের ফলে স্বর্গভোগ করিতেছে কিংবা দুষ্কৃতের ফলে নরকভোগ করিতেছে। কিন্তু সে ভোগ স্থায়ী নহে। ভোগ-অন্তে তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। সেখানে সে আবার কর্ম্ম করিতেছে। তাহার ফলে, সে আবার স্বর্গে উঠিতেছে, নরকে ডুবিতেছে। কিন্তু সে ওঠা-পড়া চিরদিনের নহে। কিছুকাল পরে তাহাকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে।

এই ভাব লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন—

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥—গীতা, ৯।২০-১২

'সেই সমস্ত পুণ্যকারী জীব পুণ্যফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে যাইয়া দেবভোগ সমূহ ভোগ করে। পরে বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্য ক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এইরূপ যাহারা সকাম কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করে, সেই কামকামী ব্যক্তিদিগকে পুনঃপুন গতাগতি করিতে হয়।'

বলা বাহুল্য, পুণ্যকারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, পাপকারীর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

'পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোক (স্বর্গাদি) লাভ হয়, পাপের দ্বারা পাপ-লোক (নরকাদি) লাভ হয়।'

পাপকারীকেও পাপলোকে দুঃখ ভোগের পর পাপক্ষয় হইলে ইহলোকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। কারণ, এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি ; স্বর্গ নরক, পুণ্যলোক পাপলোক—ভোগ-ভূমি। জীব ইহলোকে যে কর্ম্ম করে—তা' সে কর্ম্ম পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক—পরলোকে তাহার ভোগ হয়। পুণ্যের ফলে সুখভোগ হয় এবং পাপের ফলে দুঃখভোগ হয়। পতঞ্জলি বলিয়াছেন ঃ—

তে হ্লাদ-পরিতাপ-ফলাঃ পুণ্যাপুণ্য-হেতুত্বাৎ।

'পুণ্যের ফলে হ্লাদ (সুখ) ; আর অপুণ্য (পাপের) ফলে পরিতাপ দুঃখ)।' ইহাই বিধাতার বিধান। কিন্তু পাপাত্মাই হউক আর পুণ্যাত্মাই হউক—জীবকে পরলোকে কর্ম্ম-ভোগান্তে আবার ইহলোকে

ফিরিতেই হয়। ইহাকেই বলে, 'আবৃত্তি'—পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি।

কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, যদিও গীতা পুরাণাদি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে জন্মান্তরের ভূয়ঃ উপদেশ আছে, কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে জীবের জন্মান্তর গ্রহণের কোনই উল্লেখ নাই। তাঁহাদের এ ধারণা নিতান্ত অমূলক। কারণ বেদের শীর্ষস্থানীয় যে উপনিষদ্—তাহাতে জন্মান্তরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—

> হন্ত তেদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনং।
> যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥
> যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
> স্থাণু মন্যেঽনুসংযন্তি যথা-কর্ম্ম যথা-শ্রুতম্॥—কঠ ২।২।৬-৭

'হে গৌতম! তোমাকে আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম উপদেশ করিব এবং মৃত্যুর পর আত্মার যে গতি হয়, তাহাও বলিব। কোন কোন জীব শরীর ধারণ করিবার জন্য মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে,—কেহ বা স্থাণু (স্থাবর-যোনি) প্রাপ্ত হয়।'

যাহার যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে তাহার গতি হয়।

উপনিষদ্ অন্যত্র বলিতেছেন—

> অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাঃ বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
> যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥
> ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছে্রয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
> নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥
>
> —মুণ্ডক ১।২।৯-১০

"অবিদ্যায় মোহিত মূঢ় ব্যক্তিরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। কর্ম্মাসক্তি বশতঃ তাহারা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

তাহার ফলে আতুর হইয়া উচ্চলোক হইতে প্রচ্যুত হয়। যাহারা কর্ম্ম-কাণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে ও তাহার অধিক শ্রেয়ঃ আছে ইহা জানে না, তাহারা অতিশয় মূঢ়। তাহারা স্বর্গলোকে পুণ্যভোগ করিয়া পরে ইহলোকে কিংবা আরও হীন লোকে ফিরিয়া আইসে।”

এই অর্থে ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তেঽথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে তদস্য তৃতীয়ং জন্ম।—ঐতরেয় ৪।৪

‘তাহার এই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্ম্মের জন্য এখানে তাহার প্রতিনিধি-স্বরূপ অবস্থান করে এবং তাহার অন্য আত্মা অর্থাৎ সে স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া বয়ঃস্থ হইয়া প্রয়াণ করে। সে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। এই তাহার তৃতীয় জন্ম।’

(প্রথম জন্ম মাতৃকুক্ষিতে, দ্বিতীয় জন্ম পুত্ররূপে; সেই জন্যই বলা হয়, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ”—আত্মাই পুত্ররূপে জাত হন।)

অন্যভাবে প্রশ্ন উপনিষদ্ ঐ একই উপদেশ দিয়াছেন—

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে।—প্রশ্ন ৫।৩-৪

‘সে যদি ওঁকারের একটীমাত্র মাত্রা ধ্যান করে, তবে সে শীঘ্রই পৃথিবীতে ফিরিয়া আইসে। ঋক্‌মন্ত্র সকল তাহাকে মনুষ্যলোকে উপনীত করে। সে এখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করে। আর যদি সে ওঁকারের দ্বিমাত্রা মনে ধ্যান করে, তবে সে যজুঃ মন্ত্র

দ্বারা অন্তরিক্ষ সোমলোকে উন্নীত হয়। সে সোমলোকে বিভূতি অনুভব করিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আইসে।'

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপদেশও আমাদের প্রণিধান-যোগ্য—

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।

তদেব শ্লোকো ভবতি।—
তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য॥
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥—বৃহ ৪।৪।৫-৬

'যাহার যেরূপ কার্য্য, যেরূপ আচরণ, সে সেইরূপ হয়। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয় পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য হয়, পাপ কর্ম্মের দ্বারা পাপ হয়। জীবকে 'কামময়' বলা হইয়াছে। তাহার যেমন কামনা, সেইরূপ ভাবনা হয়। যেরূপ ভাবনা, সে সেইরূপ কর্ম্ম করে। যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোকটী প্রচলিত আছে। 'তাহার মন যেখানে আসক্ত, সে কর্ম্মের দ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে সে যে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে আবার কর্ম্ম করিবার জন্য তাহাকে সেই লোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়।'

এই সকল স্পষ্ট বচনের প্রত্যাখ্যান করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক সাহিত্যে জীবের জন্মান্তরের উপদেশ নাই?

আপত্তিকারীরা কিন্তু উপনিষদের প্রমাণেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বলেন,—'হিন্দু জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগ্বেদ, তাহাতে কোথাও জন্মান্তরের উল্লেখ নাই ; অতএব জন্মান্তরবাদ বেদ-বিরুদ্ধ।' যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, বেদ বলিলে কেবল বেদের সংহিতা-অংশ বুঝায় না। বস্তুতঃ বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড বেদের লক্ষ্য অভ্যুদয়—এবং জ্ঞানকাণ্ড বেদের লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স। কর্ম্মকাণ্ড বেদের ফল স্বর্গ এবং জ্ঞানকাণ্ড বেদের ফল অপবর্গ বা মুক্তি। বেদের যে অংশ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদন করে, তাহার নাম সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এবং যে অংশ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদন করে, তাহার নাম আরণ্যক ও উপনিষদ্। অতএব বেদের চারি বিভাগ,—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। আমি অন্যত্র প্রতিপাদন করিয়াছি যে, বৈদিগ যুগের সূত্রপাত হইতেই ভারতীয় ঋষিসমাজে কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যক ও উপনিষদ্ প্রচলিত ছিল *। অতএব এ স্থলে সে বিষয়ের বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন।

বেদের সংহিতাভাগে জন্মান্তরের উল্লেখ নাই বলিয়া জন্মান্তরবাদ অবৈদিক, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কারণ, বৈদিক যজ্ঞসমূহে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হইত, বেদের সংহিতা ভাগে মাত্র সেই মন্ত্রসমূহই সংকলিত হইয়াছে। ঋষি-সমাজে প্রচলিত অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন-স্থান বেদের সংহিতা নহে। বৈদিক যুগে ঋষি-সমাজে ব্রহ্মতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব-উপদেশ প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তী কালে বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ অংশেই সেই সকল তত্ত্ব-উপদেশ সংকলিত হইয়াছিল। জীবের উৎক্রান্তি, জীবের পরলোকগতি, জীবের জন্মান্তর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জ্ঞান যথাস্থানেই সংকলিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌ই

* উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব) – উপক্রমণিকা।

তাহাদের প্রকৃত সংকলন-স্থান—সংহিতা নহে। অতএব সংহিতায় জন্মান্তরের উল্লেখ না দেখিয়া জন্মান্তরবাদকে বেদবিরুদ্ধ বলা অসঙ্গত। টডহান্টারের বীজগণিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবদ্দশায় সংকলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভিক্টোরিয়ার কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে কি আমরা সিদ্ধান্ত করিব যে, ভিক্টোরিয়া বলিয়া কোন রাজ্ঞী ইংলণ্ডে কখনও রাজত্ব করেন নাই? রাজা রাণীর কথা ইতিহাস-গ্রন্থে থাকিবে, গণিতে নহে। ইতিহাস-গ্রন্থে ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ না থাকিলে তাঁহাকে কাল্পনিক ব্যক্তি অনুমান করা সঙ্গত; কিন্তু বীজগণিতে তাঁহার উল্লেখের আশা করা অসঙ্গত। বেদের সংহিতাভাগ মন্ত্রের সংকলন গ্রন্থ। তাহাতে জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উল্লেখ থাকিবে কেন?

দ্বিতীয় কথা। উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত এই জন্মান্তরবাদ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সাধারণ্যে ইহার প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত এই জন্মান্তরতত্ত্ব তত্ত্বদর্শী রাজর্ষি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই তত্ত্বকে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' নামে অভিহিত করা হইত। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের বিবরণ এইরূপ—

কোন সময়ে অরুণের পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের পরিষদে উপস্থিত হইলে ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে জীবের উৎক্রান্তি, পরলোক-গতি ও জন্মান্তর সম্বন্ধে পর পর পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শ্বেতকেতু একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে মহা লজ্জিত হইয়া শ্বেতকেতু পিতা অরুণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতাকে ঐ পঞ্চ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন, আমিও জানি না। তখন পিতা পুত্রে রাজা জৈবলির সমীপস্থ হইলেন এবং শ্বেতকেতুর পিতা

রাজাকে বলিলেন, 'আপনি আমার পুত্রকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর বলুন।'

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব। তং হ চিরং বস ইত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার। তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি।

অর্থাৎ গৌতমের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, 'কিছুদিন অপেক্ষা করুন।' তাহার পর কহিলেন, 'হে গৌতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা বরিলেন, এ বিদ্যা আপনার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই।' পরে রাজা গৌতমকে সেই গোপনীয় পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদেশ করিলেন। জীব কিরূপে স্বর্গলোক হইতে মেঘের দ্বারা বৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং পরে পিতার দেহে প্রবেশ করিয়া অনন্তর মাতার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়, রূপকের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব মাসান্ অন্তঃশয়িত্বা যাবদ্ বাথ জায়তে।—ছান্দোগ্য ৫।৯।১

'সেই জীব উল্বাবৃত অবস্থায় দশ বা নয় মাস গর্ভের মধ্যে শয়ন করিয়া পরে জন্মগ্রহণ করে।' পরে যতদিন আয়ুঃ পৃথিবীতে থাকিয়া কর্ম্মানুসারে হয় দেবযান পথে উত্তর মার্গে, নয় পিতৃযান পথে দক্ষিণমার্গে উৎক্রান্ত হয়। যে জীব দেবযান-পথে গমন করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যে পিতৃ-যান পথে স্বর্গাদিলোকে গমন করে, তাহাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ক্রমে আবার মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয়। এবং তাহার স্বকৃত কর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধম যোনিতে জন্ম লাভ হয়।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

—ছান্দোগ্য ৫।১০।৭

'যাহারা সুকৃতাচারী, তাহাদের শুভ যোনিতে জন্ম হয়, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনিতে। আর যাহারা দুষ্কৃতাচারী, তাহাদের অশুভ যোনিতে জন্ম হয়, কুকুর যোনি বা শূকর যোনি বা চণ্ডাল যোনিতে।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়েও এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ আছে।

ইয়ং বিদ্যা ইতঃপূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণে উবাস। তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি।
—বৃহ, ৬।২।৮

এই বিদ্যার উপদেশকর্ত্তা রাজর্ষি বলিতেছেন, 'এই বিদ্যা ইতিপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণে বাস করেন নাই। সেই বিদ্যা আমি তোমাকে উপদেশ করিব।'

যে বিদ্যা, যে জন্মান্তরবাদ এইরূপ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যজ্ঞে ব্যবহার্য্য মন্ত্রের সংগ্রহ মধ্যে তাহার উল্লেখ না থাকাতে বিচিত্র কি? সেজন্য জন্মান্তরকে বেদবিরুদ্ধ বলা কি সঙ্গত? অতএব জন্মান্তর সম্বন্ধে আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম।

জন্মান্তর সম্বন্ধে আমরা হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ পাঠ করিলাম। অন্যান্য ধর্ম্মের প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে এই সম্বন্ধে কি উপদেশ পাওয়া যায়? পারসিকদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র "দেসাত্তির' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মানুষ ইহ জীবনে যে দুঃখ ও শোক অনুভব করে, তাহার কারণ পূর্ব্বদেহকৃত বাক্য বা কর্ম্ম। ন্যায়পর বিধাতা এইরূপে তাহাদের শাস্তি বিধান করেন।*

বৌদ্ধধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ যে বিশেষভাবে উপদিষ্ট, ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এমন কি ইহা বলা অত্যুক্তি নহে যে, বৌদ্ধধর্ম্মমন্দির ঐ ভিত্তি-প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে যে, বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমতলে

---

* Those who, in the season of prosperity, experience pain and grief, suffer them on account of their words or deeds in a former body, for which the Most Just now punisheth them.
(The Desatir, The book of the prophet, the great Abad.)

সম্বোধি লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি এই গাথাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং ॥৮॥
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ॥৯॥—ধম্মপদ।

'দেহরূপ-গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, তাহাকে না পাইয়া, কতবার জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারেই পরিভ্রমণ করিলাম। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি দুঃখকর! হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না; তোমার সকল ফাঁসি ভগ্ন হইয়াছে, গৃহকূট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণগত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।'

বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ঐ ধম্মপদের অনেক স্থলেই জন্মান্তরের উল্লেখ আছে। ধম্মপদের ২৪শ অধ্যায়ের (যাহার নাম 'তণ্‌হা বগ্‌গ') প্রথম শ্লোক এই—

মনুজস্‌স পমত্তচারিনো তণ্‌হা বড্‌ঢতি মালুকাবিয়।
সো প্লবতী হুরাহুরং ফলমিচ্ছং ব বনস্মিং বানরো ॥১॥

'প্রমত্ত-চিত্ত মনুষ্যের তৃষ্ণা 'মালবার' লতার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বনে ফলাভিলাষী বানর যেমন অহরহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে, সে ব্যক্তিও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করে।'

কিন্তু এই জন্মান্তর-ধারার বিরাম আছে, এই সংসার-চক্রের নিবৃত্তি আছে। ঐ বিরাম-সিদ্ধির জন্যই বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গ আর্য্যমার্গের উপদেশ করিয়াছিলেন।

মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্‌ঝে মুঞ্চ ভবস্‌স পারগূ।
সব্বত্থ বিমুত্তমানসো ন পুন জাতি জরং উপেহেসি॥

'সম্মুখে, পশ্চাতে বা মধ্যে যে কিছু আছে ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া পরপারে চলিয়া যাও। সর্ব্বরূপে বিমুক্তচিত্ত হইলে তোমাকে জন্ম ও জরা ভোগ করিতে হইবে না।'

নিট্‌ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীততন্‌হো অনঙ্গণো।
উচ্ছিজ্জ ভবসল্লানি অন্তিমোয়ং সমুস্‌সয়ো॥

—ধম্মপদের তণ্‌হা বগ্‌গ॥ ১৮

'বীততৃষ্ণ পাপহীন নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি সংসার-রূপ শল্য ত্যাগ করেন। তাঁহার এই অন্তিম দেহ—আর দেহান্তর হইবে না।'

প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মে জন্মান্তরের স্থান নাই; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যখন সজীব ধর্ম্ম ছিল, যখন খৃষ্টীয় উপদেশকেরা যথার্থই খৃষ্ট-সেবকের পিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং যখন তাঁহাদের নাম ছিল 'Christian Fathers', তখন তাঁহারা স্পষ্ট ভাবে পুনর্জ্জন্মের উপদেশ করিতেন। জিরোম (Jerome), অরিজেন (Origen) প্রভৃতির রচনায় এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * কিন্তু Christএর নিজের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেও জন্মান্তরের উপদেশ স্পষ্ট ভাষায় না হইলেও ইঙ্গিতে উপদিষ্ট হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যিশুর অনতিপূর্ব্বে জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট (John the Baptist)

* Is it not more in conformity with reason that every soul for certain mysterious reasons (I speak now according to the opinion of Pythagoras and Plato and Empedocles, whom Celus frequently names), is introduced into a body and introduced according to its deserts and former actions?

—Origen. Contra Celscea. 1, xxxii.

If we examine the case of Esau, we may find he was condemned because of his ancient sins in a worse course of life.

Jerome's letter to Aritus.

নামে একজন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঊষা যেমন সূর্য্যের পূর্ব্বসূচী, তিনি সেইরূপ যিশুখৃষ্টের পূর্ব্বসূচী ছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে তখনকার ইহুদী সমাজে অনেক বিতর্ক উঠিয়াছিল। যিশুখৃষ্ট শিষ্যদিগের নিকট একাধিকবার ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন যে, ইহুদীদিগের পূর্ব্বযুগের ধর্ম্ম-শিক্ষক ইলায়াসই (Elias) জন রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি আমরা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম। ঐ সকল উক্তি পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।*

মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের দুই এক স্থলে জন্মান্তরের অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এক স্থলে হজরত মহম্মদ বলিতেছেন—'খোদা জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রেরণ করেন, যত দিন না তাহারা তাঁহার সমীপে ফিরিয়া যায়।' † ইহাকে জন্মান্তরের ইঙ্গিত বলিলে কি অসঙ্গত হয়?

মুসলমানদিগের মধ্যে একটা ধ্যানী সাধক সম্প্রদায় আছে, ইহাদিগকে সুফী বলে। ইহারা মুসলমান বৈদান্তিক। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মান্তর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশ প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান আচার্য্য জালালুদ্দিন রুমী। তিনি তাঁহার 'মেসনাভি' গ্রন্থে জীবের

* When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, He asked his disciples, saying 'Whom do men say that I, the Son of Man, am?' And they said; "Some say that Thou art John the Baptist: some, Elias and others Jeremias, or one of the prophets"—S. Matthew. xvi 13, 14.

And His disciples asked Him saying: "Why then say the scribes that Elias must first come?" And Jesus answered and said unto them: "Elias truly shall first come and restore all things. But I say unto you, that Elias is come already, and they know him not, but have done unto him whatsoever they list. Likewise shall also the Son of Man suffer of them" Then the disciples understood that he spoke unto them of John the Baptist.—S. Matthew. xvii. 10-13.

† God generates beings and sends them back over and over till they return to Him.—Al Quran, xxx—1.

বিবর্ত্তন অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জীব প্রথমে স্থাবর হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেখান হইতে বিবর্ত্তন গতিতে সে উদ্ভিদ্ হয়। বহু যুগ উদ্ভিদ্ দেহে অবস্থান করিয়া পরে পশুযোনিতে প্রবেশ করে। পশু হইতে বিবর্ত্তন গতিতে সে মানব হয়, কিন্তু এখানেই তাহার ঊর্দ্ধ গতি স্থগিত হয় না। মানব ক্রমশঃ উন্নত হইয়া দেবতা হয়। কিন্তু দেবত্বই মানবের চরম নহে। সর্ব্বশেষ সে ভগবানের সহিত মিলিত হয়। তখন তাহার যে মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কল্পনারও অতীত।†

অতএব আমরা দেখিলাম যে, সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মের মধ্যেই জন্মান্তরের উপদেশ রহিয়াছে। কোথাও এই উপদেশ সুস্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। যে সকল ঋষি বা ঋষিতুল্য মহাত্মা ধর্ম্ম স্থাপন করেন, তাঁহারা দেশ কাল পাত্র-বিবেচনায় উপদেশের তারতম্য করেন ; সেইজন্য জন্মান্তরের উপদেশ কোন ধর্ম্মে অস্পষ্ট, আবার কোন ধর্ম্মে সুস্পষ্ট।

জন্মান্তর সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণের অলোচনা আমরা এইখানে শেষ করিলাম। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যুক্তি দ্বারা, অনুমানের সাহায্যে জন্মান্তর কিরূপে প্রমাণিত করিতে পারা যায়, তাহার আলোচনা করিব।

† I died from the mineral, and became a plant.
I died from the plant, and re-appeared in an animal.
I died from the animal, and became a man.
Wherefore then should I fear?
When did I grow less by dying?
Next time I shall die from the man
That I may grow the wings of the Angel.
From the Angel too must I seek advance.
All things shall perish save His face.
Once more shall I wing my way above the Angels;
I shall become that which entereth not the imagination.
Then let me become naught, naught.
For the harpstring
Crieth unto me: "Verily unto Him shall we return."—
Jalal-ud-din Rumi's Masnavi. iv.

দ্বিতীয় অধ্যায়

দার্শনিক যুক্তি

জন্মান্তরের প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিয়াছি যে, প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা আপ্তবাক্য। সমস্ত জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে জন্মান্তর কি ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে—প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা প্রচারক ঋষি ও মহাজনগণ কিরূপে সমস্বরে জন্মান্তর-তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা জন্মান্তরের সাধক যুক্তির অনুসন্ধান করিব এবং জন্মান্তরবাদ যে অনুমান-সিদ্ধ, ঐ সকল যুক্তির সাহায্যে তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র যুক্তির খনি। ঐ সকল খনিতে জন্মান্তরের সাধক কি কি যুক্তি-মণি নিহিত আছে, প্রথমতঃ তাহার অনুসন্ধান করিব। পরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে জন্মান্তরের অনুকূলে কিরূপ যুক্তির প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিব।

জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, জগৎ বৈষম্যপূর্ণ—মানুষে মানুষে অত্যন্ত বিভিন্নতা। কেবল যে মানুষের মধ্যে অবস্থার ও ভোগের প্রভেদ, তাহা নহে। প্রবৃত্তির, প্রকৃতির এবং সুযোগেরও যথেষ্ট প্রভেদ। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ জন্মাবধি সম্পদের ক্রোড়ে লালিত, কেহ মৃত্যু পর্য্যন্ত দারিদ্র্যের

পেষণে নিপীড়িত ; কেহ জীবনে দুঃখ-অস্বস্তির মুখ দেখিল না, কেহ কোনও দিন দুঃখদুর্দ্দশার হস্ত এড়াইতে পারিল না ; কেহ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আধি-ব্যাধির ক্রীতদাস, কেহ শ্মশানযাত্রার সময়েও সুস্থদেহ। শুধু তাহাই নহে—কেহ এমন পরিবারে, এমন সমাজে জন্মগ্রহণ করে যেখানে সদ্ভাব ও সদাচারের বাতাস সতত প্রবহমান, ধর্ম্ম ও নীতির প্রভাব সতত বর্ত্তমান ; কেহ জন্মাবধি পূতিগন্ধে জর্জ্জরিত, সৎসঙ্গবর্জ্জিত, সহায়-সম্পদহীন ; কেহ ধ্রুব প্রহ্লাদের মত জন্মসিদ্ধ হরিভক্ত, কেহ চার্ব্বাকের মন্ত্রশিষ্য নাস্তিক-শিরোমণি—ঈশ্বরের নামে তাহার কর্ণজ্বর উৎপন্ন হয় ; কেহ এমন শান্ত, শিষ্ট, মধুর, অমায়িক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, সহস্র প্রলোভন ও অশুভ ঘটনার নির্য্যাতন সে প্রকৃতিকে মলিন করিতে পারে না ; কেহ আজন্মপাতকী (Congenital criminal), পাপ-প্রবৃত্তি তাহার অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত, শত প্রকার নৈতিক চিকিৎসার প্রয়োগেও সে পাপ-রোগের প্রশম হয় না। কেহ অতি স্থূল জড়বুদ্ধি, শিক্ষকের বেত্র কশাঘাতেও তাহার কঠোর মস্তিষ্কে ক-অক্ষর অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে না ; কেহ সুবুদ্ধি মেধাবী—(কালিদাসের ভাষায়) শরৎকালে যেমন হংসমালা অযাচিতভাবে গঙ্গায় উপনীত হয়, সমস্ত বিদ্যা সেইরূপ বিনা প্রযত্নে তাহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়। কেন এই রূপ হয়? এ জগৎ যদি দৈত্যের রচনা হইত, ঈশ্বর না হইয়া যদি শয়তান এ জগতের প্রভু হইত, তবে এ প্রশ্ন উঠিত না। কিন্তু ঈশ্বরই ত' জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি ত' করুণাময়! অতএব, সকলকে সমান করিলেন না কেন? সমান ভোগ, সমান সুখ, সমান বুদ্ধি, সমান ধর্ম্মে সকলকে সমান অধিকারী করিলেন না কেন? তিনি ত' সর্ব্বশক্তিমান্। অতএব তাঁহাতে ক্ষমতার অভাব হইতেই পারে না। আর তিনি যখন করুণাময়, তখন মানুষকে সুখী করিবার প্রবৃত্তিরও তাঁহাতে অভাব হইতে পারে না। অতএব

তাঁহার প্রবৃত্তি ও শক্তি উভয় সত্ত্বেও, ঈশ্বর জগতের রচনায় বৈষম্যের অবতারণা করিলেন কেন ? তবে কি ঈশ্বর পক্ষপাতী ? তিনি কি পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও ভাল কাহাকেও মন্দ গড়িয়াছেন ? তাহাও ত' সম্ভবে না। কারণ, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "সকল জীবই আমার কাছে সমান, আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই।"

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ—গীতা ৯।২৯

তবে এ বৈষম্যের মীমাংসা কি ?

যাঁহারা জীবের পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না, যাঁহারা আধুনিক খৃষ্টান-দিগের মত বিশ্বাস করেন যে, সকল জীব এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে বা হইতেছে তাহারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের নূতন সৃষ্টি, অর্থাৎ যাঁহাদের ধারণা এই যে, ইহজন্মের পূর্ব্বে সেই জীবের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাঁহাদের পক্ষে জগতের এই বৈষম্যের মীমাংসা করা সুদুষ্কর। যাঁহারা নাস্তিক জড়বাদী, যাঁহাদের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নাই, যাঁহারা জগৎকে জড় পরমাণুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘাত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদৃচ্ছার (Chance) শিরে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা আস্তিক, যাঁহারা আত্মাকে অজর অমর বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এই জগতের নিয়ন্তা একজন পরমাত্মার অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা এই বৈষম্যের কি মীমাংসা করিবেন ? আস্তিক-মাত্রেই ঈশ্বরকে করুণাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করিবেন। ঈশ্বর যদি করুণাময় অথচ সর্ব্বশক্তিমান্, তবে তিনি জীবে জীবে এরূপ ভেদ করিলেন কেন ? তবে তিনি জীবের ভোগ, জীবের প্রকৃতি, জীবের আচরণে এইরূপ বৈষম্য বিধান করিলেন কেন ?

আমরা দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এই বৈষম্যের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ক্যাণ্ট, নিউম্যান প্রভৃতি যাঁহারা এই প্রশ্নের

উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, যখন পুণ্যের ফলে সুখ ও পাপের ফলে দুঃখ—ইহাই জগতের নৈতিক ধারা ; এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, পুণ্যবান্ অনেক সময় দুঃখী ও পাপী অনেক সময় সুখের অধিকারী এবং যখন জগতে জীবে জীবে এত বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই পরলোকে ন্যায়বান্ বিধাতা এই বৈষম্যের সাম্য বিধান করিবেন, এই সুখ দুঃখের সামঞ্জস্য সাধন করিবেন। জগতের বৈষম্য-সমস্যার এই উত্তর কি সন্তোষজনক ?

আর্য্যঋষিরা এই প্রশ্নের অন্যরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আত্মা অজর, অমর, নিত্য, সনাতন বস্তু। সেই আত্মা জীবরূপে এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। ইহলোকে কর্ম্ম করিয়া দেহান্তে জীব পরলোকে অবস্থিতি করে। সেখানে ভোগের অবসান হইলে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। ইহারই নাম জীবের পুনর্জন্ম। জীব যে এই প্রথমবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা নয়, ইহার পূর্ব্বেও তাহার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে এবং পরেও বহু জন্ম উপস্থিত হইবে। জীব ইহজন্মে যেমন পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, যেমন শুভ ও অশুভ বাসনা চিত্তে পোষণ করিতেছে, যেমন সুচিন্তা ও কুচিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছে, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মকৃত সেই সেই ভাবনা, বাসনা ও ক্রিয়ার ফলে, তাহার ইহজন্মের প্রকৃতি ও ভোগ নিয়মিত হইয়াছে ; অর্থাৎ, সে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, তেমনি ফল পাইতেছে। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত বা করুণার অভাব নাই। তিনি কর্ম্মানুসারে ফলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীব পূর্ব্বজন্মকৃত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টার দ্বারাই নিজের ইহজন্ম নিয়মিত করে। প্রথমতঃ ভাবনা—এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে
পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। —ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

অর্থাৎ, 'জীব ভাবনাত্মক; ইহজীবনে জীব যেরূপ ভাবনা ভাবে, দেহান্তে সে সেইরূপ হয়।'

অতএব, ইহাই স্থির যে আমরা যাহা ভাবি, তাহাই হই।* আমরা যদি সত্যের বিষয়, পুণ্যের বিষয় ভাবি, তাহা হইলে সত্যশীল, পুণ্যশীল হই। যদি আমাদের ভাবনা পবিত্র, শুদ্ধ, শুচি হয়, তবে আমরা পবিত্র, শুদ্ধ, শুচি হই। এক কথায়, আমরা যদি কু বিষয় ভাবি তবে কু হই, যদি সু বিষয় ভাবি তবে সু হই।

অতএব আমাদের স্বভাব (যাহার অনুসারে আমাদের আচার নিরূপিত হয়) তাহা আমাদের ভাবনা দ্বারা গঠিত হয়। এই নিয়মের ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইহজন্মে আমরা যে চরিত্র ও মানসিক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভাবনার ফল।

দ্বিতীয়, বাসনা বা কামনা। জীব যাহা কামনা করে, যেখানে সেই কামনার বস্তু, সেইখানে জীবকে যাইতে হয়। অর্থাৎ, সে যাহা চায় তাহাই পায়। সেই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামম্—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১২

'সেই অমৃত (অবিনাশী জীব) সেখানে যায়, যেখানে তাহার কামনার বস্তু।'

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।—মুণ্ডক, ৩।২।২।

* The mental faculties of each successive life are made by the thinkings of the previous lives.

'সকাম ব্যক্তি যে কামনা করে, বাসনার দ্বারা সে সেখানেই জন্মগ্রহণ করে।'

অর্থাৎ, জীবের বাসনা, রাগ ও দ্বেষের আকার ধারণ করিয়া অন্য জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘটায়। যাহার প্রতি প্রবল অনুরাগ বা প্রবল বিরাগ, তাহার সহিত পর জন্মে তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

তৃতীয় চেষ্টনা। আমরা যেমন কর্ম্ম করি, তেমনি ফল পাই। যেরূপ বীজ বপন করি, সেইরূপ ফসল উৎপন্ন হয়। আমড়া বীজে আম্র ফলের আশা দুরাশা নহে কি? এই মর্ম্মে উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

যথাকারী যথাচারী তথাভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ ৪।৪।৫।

'জীবের যেমন কর্ম্ম, যেমন আচরণ, সেইরূপ গতি হয়। যাহার সাধু কর্ম্ম, সে সাধু হয়, যাহার অসাধু কর্ম্ম সে অসাধু হয়।'

সংক্ষেপে—

যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে

'যে যেমন কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফল পায়।'

কেহ যদি পূর্ব্বজন্মে অপরকে সুখী করিয়া থাকে, তবে সেও ইহজন্মে সুখভোগ করে। কিন্তু সে যদি পূর্ব্বজন্মে অপরকে দুঃখ দিয়া থাকে, তবে ইহজন্মে তাহাকেও দুঃখভোগ করিতে হয়। ইহাকেই বলে কর্ম্মের বিপাক। এ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র ৩।১৩

অর্থাৎ, 'কর্ম্মের বিপাক ত্রিবিধ—জাতি, আয়ুঃ, ভোগ। জীব কোন্ দেশে কাহার গৃহে জন্মাইবে, কতদিন তাহার আয়ুঃ হইবে, তাহার ভোগ

কিরূপ হইবে—কি পরিমাণ সুখ দুঃখ তাহার জীবনের সহিত জড়িত থাকিবে, তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ কি প্রকারের ও কি পরিমাণের হইবে, তাহার দেহের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কতদূর লাভ হইবে —এ সমস্তই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। ইহাই জন্মান্তরের স্থূল কথা। জগতের বৈষম্য বুঝাইবার পক্ষে এরূপ সমীচীন মত আর দ্বিতীয় নাই। এ সম্বন্ধে মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪

নেশ্বরো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে। কুতঃ। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কাংশ্চিদত্যন্ত সুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্। কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ পশ্বাদীন্। কাংশ্চিন্মধ্যমভোগভাজো মনুষ্যাদীন্ ইত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমাণস্যেশ্বরস্য পৃথগ্জনস্যেব রাগদ্বেষৌ পপদ্যেতে। * * * তস্মাদ্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে। কস্মাৎ? সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। * * * * দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেব অসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্ত্যেবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।
—শাঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'ঈশ্বর কখনও জগতের কারণ হইতে পারেন না। কেন? তাহা হইলে তাঁহাতে বৈষম্যের ও নৈর্ঘৃণ্যের (নিষ্করুণতার) প্রসঙ্গ হয়। ঈশ্বর কাহাকেও অত্যন্ত সুখভোগী করিয়াছেন, যেমন দেবাদি; কাহাকেও অত্যন্ত দুঃখভোগী করিয়াছেন, যেমন পশ্বাদি; কাহাকেও বা কতক সুখী, কতক দুঃখী করিয়াছেন, যেমন মনুষ্যাদি। জগতে এইরূপ বৈষম্য সৃষ্টি

করিয়া ঈশ্বর সাধারণ লোকের ন্যায় রাগদ্বেষের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। অতএব, ঈশ্বরকে জগতের কারণ স্বীকার করিলে, যখন তাঁহাতে বৈষম্যের (পক্ষপাত) এবং নৈর্ঘৃণ্যের (নিষ্করুণতা) প্রসঙ্গ উঠে তখন ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না; কারণ, তিনি সাপেক্ষ হইয়া (জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া) সৃষ্টি করেন। যদি নিরপেক্ষ হইয়া, কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া, ঈশ্বর বিষমা সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিতেন, তবে তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যের আরোপ করা চলিত। জগদীশ্বর সাপেক্ষ হইয়াই বিষমা সৃষ্টি করিয়াছেন। কি অপেক্ষা করিয়া? জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া। অতএব বিষমা সৃষ্টির প্রতি সৃজ্যমান প্রাণীসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্মই কারণ। ইহাতে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। দেবমনুষ্যাদির মধ্যে যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ সেই সকল জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত স্ব স্ব কর্ম্ম। ঈশ্বর যখন সাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তখন জগতের বৈষম্যের জন্য তিনি পক্ষপাত ও নিষ্করুণতা-দোষে দোষী হইতে পারেন না।'

আপত্তি হইতে পারে যে, এইরূপ যুক্তির দ্বারা যদিও জগতে সম্প্রতি যে বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে তাহার মীমাংসা হইল, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে জগতের যে বৈষম্য ছিল তাহার সমাধান কি? ইহজন্মে জীবের যে ভোগ, তাহা পূর্ব্বজন্মকৃত। সেই পূর্ব্বজন্মের ভোগ তৎপূর্ব্বজন্মকৃত। কিন্তু জন্মের ত একটা আদি আছে? যে জন্মটা জীবের সর্ব্বপ্রথম জন্ম, সে জন্মের পূর্ব্বে কর্ম্ম কোথায় ছিল, যাহার অপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর বিষমা সৃষ্টির বিধান করিলেন? এই আপত্তির মীমাংসা করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ—ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৫

নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষো যদি আদিমান্ সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে।—শাঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'সংসার যখন অনাদি, যখন বর্ত্তমান স্থষ্টির পূর্ব্বে অসংখ্য বার স্থষ্টি হইয়াছে এবং পরেও অসংখ্য বার স্থষ্টি হইবে, তখন এ আপত্তি অমূলক। অঙ্কুর হইতে বীজ হয়, আবার বীজ হইতে অঙ্কুর হয়। সেইরূপ কর্ম্ম হইতে স্থষ্টি, আবার স্থষ্টির জন্য কর্ম্ম। স্থষ্টি যখন অনাদি, তখন প্রথম স্থষ্টির অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যে স্থষ্টি লইয়াই আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হই না কেন, তৎপূর্ব্বে অন্য স্থষ্টি ছিল এবং সেই পূর্ব্বতন স্থষ্টিতে জীবের কৃত কর্ম্ম, পরবর্ত্তী স্থষ্টিতে তাহার ভোগের বৈষম্য বিধান করে।'

সাংখ্যদর্শনেও প্রসঙ্গতঃ জন্মান্তরের কথা উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এমতের সমর্থক বিশিষ্ট কোন যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণ ৪০ কারিকায় বলিয়াছেন—

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।

ইহার ভাষ্যে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

কৃতং দৃশ্যমানেন ষাট্‌কৌশিকেন শরীরেণ ইত্যত আহ সংসরতি ইতি। উপাত্তম্ উপাত্তং ষট্‌কৌশিকং শরীরং জহাতি হায়ং হায়মুপাদত্তে।

অর্থাৎ 'লিঙ্গদেহ পুনঃ পুনঃ স্থূলশরীর গ্রহণ করে এবং সেই সেই গৃহীত স্থূলশরীর ত্যাগ করে। ইহারই নাম সংসরণ।'

পুনশ্চ ঈশ্বরকৃষ্ণ ৪২ কারিকায় বলিতেছেন—

নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্।

ইহার বাচস্পতিমিশ্র কৃত ভাষ্য এইরূপ—

যথাহি নটঃ তাং তাং ভূমিকাং বিধায়, পরশুরামো বা অজাতশত্রুর্বা বৎসরাজো বা ভবতি, এবং তৎ তৎ স্থূলশরীর গ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যো বা পশুর্বা বনস্পতির্বা ভবতি সূক্ষ্মং শরীরম্।

অর্থাৎ 'যেমন নট রঙ্গালয়ে বিবিধ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কখন পরশুরাম,

কখন অজাতশত্রু, কখন বৎসরাজ রূপে দর্শকের সম্মুখে দেখা দেয়, সেই রূপ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম-শরীর ভিন্ন ভিন্ন স্থূল-শরীর গ্রহণ করিয়া দেবতা বা মনুষ্য বা পশু বা বনস্পতি রূপে প্রতিভাত হয়।'

পতঞ্জলি ঋষি যোগদর্শনে জন্মান্তরের সাধক অন্যপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সকলেই জানেন, যোগদর্শনের উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ। প্রসঙ্গতঃ সে জন্য পতঞ্জলিকে চিত্তের বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, জীবের চিত্তে পঞ্চবিধ সহজাত "ক্লেশ" সংস্কাররূপে নিহিত দেখা যায়। এমন চিত্তই নাই, যাহাতে এই পঞ্চবিধ ক্লেশের বীজ নিহিত না আছে। এই পঞ্চবিধ ক্লেশের নাম—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অভিনিবেশ-ক্লেশের পতঞ্জলি এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। ২।৯
স্বরসবাহীতি। স্বভাবেন বাসনারূপেণ বহনশীলো ন পুনরাগন্তুকঃ।—বাচস্পতিমিশ্র

'বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সকলেরই যে স্বাভাবিক (স্বরসবাহী) মরণভয়, তাহাকে অভিনিবেশ বলে।' পতঞ্জলি বলিতেছেন, 'এই মরণ-ভয় সর্ব্বসাধারণ এবং ইহা স্বরসবাহী অর্থাৎ আগন্তুক নহে, স্বাভাবিক।' এই অভিনিবেশকে বিজ্ঞানের ভাষায় Instinct of Self-preservation বলে। শুধু মনুষ্যের নহে, নিম্নশ্রেণীর ইতর জীবেও এই Instinct জাজ্বল্যভাবে বর্ত্তমান। প্রাণীসাধারণের এই অভিনিবেশ বা মরণত্রাস কোথা হইতে আসিল? পতঞ্জলির ঐ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

সর্ব্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি, 'মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি।' ন চাননুভূত-মরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাত্মাশীঃ, এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে। স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী কৃমেরপি জাতমাত্রস্য প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণত্রাস উচ্ছেদ-দৃষ্ট্যাত্মকঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। যথাচায়মত্যন্তমূঢ়েষু দৃশ্যতে ক্লেশস্তথা বিদুষোঽপি বিজ্ঞাতপূর্ব্বাপরান্তস্য রূঢ়ঃ, কস্মাৎ? সমানা হি তয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণ-দুঃখানুভবাদিয়ং বাসনেতি॥

অর্থাৎ, 'প্রাণীমাত্রেরই আপনার বিষয়ে এরূপ প্রার্থনা দেখা যায়, 'আমি যেন না মরি, আমি যেন বাঁচিয়া থাকি'। যে পূর্ব্বে কখনও মৃত্যুর অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ প্রার্থনা অসম্ভব। ইহার দ্বারা পূর্ব্বজন্ম প্রমাণিত হয়। এই যে অভিনিবেশ (মরণভয়রূপ সংস্কার) ইহা স্বাভাবিক। ক্রমিকীট, যে এইমাত্র জন্মিয়াছে, তাহাতেও এই মরণত্রাস দৃষ্ট হয়। ক্রমিকীটের এই মরণত্রাস,—'আমি না উৎসন্ন হই' এই ভাব, প্রত্যক্ষ অনুমান বা আগম কিছুর দ্বারাই সিদ্ধ করা যায় না। সেই প্রাণী নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে মরণদুঃখ অনুভব করিয়াছিল, তাই ইহজন্মে তাহার মরণভয়। এই মৃত্যুভয় যেমন অত্যন্ত মূঢ় প্রাণীতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী, বিদ্বান্ ব্যক্তিতেও দেখা যায়, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বসাধারণ। পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই মরণদুঃখানুভব-জন্য এই সংস্কার।'

অন্যত্র পতঞ্জলি বলিতেছেন—

'তাসামনাদিত্বম্, আশিষো নিত্যত্বাৎ।—৪।১০

'সকলেরই এইরূপ আত্মাশীর্ব্বাদ আছে, 'আমি যেন না মরি'। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, 'ঐরূপ সংস্কার অনাদি।' এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

তাসাং বাসনানাং আশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বং, যেয়মাত্মাশীঃ মা নভূবংভূয়াসমিতি সর্ব্বস্য দৃশ্যতে সা ন স্বাভাবিকী, কস্মাৎ, জাতমাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণধর্ম্মকস্য দ্বেষদুঃখানুস্মৃতি-নিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেৎ, ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে।

অর্থাৎ, 'সকলেরই যখন এই নিত্যাশীর্ব্বাদ রহিয়াছে—'আমি যেন না মরি', তখন বুঝিতে হয়, এ সংস্কার অনাদি। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক নহে, নিমিত্ত-জন্য। জন্মমাত্রেই জীবের মধ্যে এই মরণভয় লক্ষিত হয়। সে যদি পূর্ব্বজন্মে মরণ দুঃখ অনুভব না করিত এবং সে দুঃখের সংস্কার স্মৃতিরূপে ইহজন্মে বহন না করিত, তাহা হইলে কখনই তাহার মরণত্রাস সহজাত হইত

না,—ইত্যাদি'। এইরূপে পতঞ্জলি যোগদর্শনে জন্মান্তরের সাধক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা ন্যায়দর্শন হইতে জন্মান্তরের যুক্তি সংগ্রহ করিব। ন্যায়দর্শনে জন্মান্তরের নাম প্রেত্যভাব।

পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ—১।১।১৯ সূত্র

প্রেত্য মৃত্বা ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ। তত্র পুনরুৎপত্তিরিত্যনেনাভ্যাসকথনাৎ প্রাগ্‌উৎপত্তিঃ ততো মরণং তত উৎপত্তিঃ ইতি প্রেত্যভাবোঽয়ম্ অনাদি রপবর্গান্ত—বাৎস্যায়ন ভাষ্য ।

আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ—৪।১।১০ সূত্র

নিত্যোয়মাত্মা প্রৈতি পূর্ব্বশরীরং জহাতি ম্রিয়তে ইতি। প্রেত্য চ পূর্ব্বশরীরং হিত্বা ভবতি জায়তে শরীরান্তরমুপাদত্তে ইতি সোঽয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোঽনাদিরপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবো বেদিতব্য ইতি—বাৎস্যায়ন।

অর্থাৎ, 'মরণের পর পুনর্জন্মকে প্রেত্যভাব বলে। এই যে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ, ইহা অনাদি। মুক্তি ভিন্ন ইহার বিরাম হয় না।'

ন্যায়দর্শনের তৃতীয় আহ্নিকে মহর্ষি গৌতম জন্মান্তরের সাধক যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। এই সমস্ত যুক্তির সার সংগ্রহ করিয়া আমরা তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম—সহজাত সংস্কার বা Instinct; দ্বিতীয়—জন্মসিদ্ধ রাগ-দ্বেষ।

বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে Instinct বলে, নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন প্রাণীর মধ্যে যাহা সদ্যোজাত শাবকে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত দেখা যায়, সেই Instinct বা সহজাত সংস্কারের নিদান কি? সদ্যোজাত হংস-শাবক সন্তরণ করিতে পারে। এ বিদ্যা সে কোথা হইতে শিখিল? সদ্যোজাত বানর শিশু প্রসূত হইয়াই বৃক্ষের ডাল ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। সে বিদ্যা সে কোথা

হইতে শিখিল? * Instinct এর স্বভাবই এই যে, ইহা শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না, প্রথমাবধি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

এ সম্বন্ধে ইংরাজী বিশ্বকোষ (Encyclopedia Britannica) হইতে পাদটীকায় একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, বিশ্বকোষের লেখক Instinctএর কয়েকটী উদাহরণ দিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সহজাত-সংস্কার-জনিত ব্যাপার শিক্ষা বা সাধন সাপেক্ষ নহে, উহা সাংসিদ্ধিক বা স্বয়ংসিদ্ধ! †

তাহাই যদি হইল, তবে সহজাত সংস্কার কোথা হইতে আইসে? ন্যায়দর্শন বলেন যে, ইহা জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের অভ্যাস-জনিত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার। দৃষ্টান্তস্বরূপ ন্যায়দর্শন সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষের উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রেত্যাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ—ন্যায়সূত্র, ৩।১।২১

এই সূত্রের বাৎস্যায়নভাষ্য এইরূপ—

* Instinctএর আরও অনেক উদাহরণ আছে। নিম্নে একজন অভিজ্ঞ লেখকের রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

A chicken just out of the egg will run under the hen if a hawk hovers over the cornyard. A kitten will set up its hair and swell its tail, endeavouring to look large and menacing, in face of danger. A new born mammal will suck, a just hatched bird will peck or open its beak according to its kind. And so on.

† By the patient study of the behaviour of precocious young birds such as chicks, pheasants, ducklings and moor hens, it can be readily ascertained that such modes of activity as running, swimming, diving, preening the down, scratching the ground, pecking at small objects with the characteristic attitudes expressive of fear and anger are so far instinctive as to be definite on their first occurrence—they do not require to be learnt.—Ency. Brit—11th Edt. vol. XIV. p. 649

জাতম ত্রস্য বৎসস্য প্রবৃত্তিলিঙ্গঃ স্তন্যাভিলাষো গৃহ্যতে। স চ নান্তরেণ আহারা-ভ্যাসম্ * * * * ন চ পূর্ব্বশরীরমন্তরেণ অসৌ জাতমাত্রস্য উপপদ্যতে। তেন অনুমীয়তে ভূতপূর্ব্বং শরীরং যত্রানেন আহারোঽভ্যস্ত ইতি।

অর্থাৎ, 'সদ্যোজাত বৎসের স্তন্যপানের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অভিলাষ ভিন্ন প্রবৃত্তি সম্ভবে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, জাতমাত্র বৎসের স্তন্যপানে অভিলাষ রহিয়াছে। এইরূপ অভিলাষ, যে না পুনঃ পুনঃ স্তন্যপান করিয়াছে, তাহার সম্ভব নহে। সদ্যোজাত শিশু ত' আর ইহজন্মে স্তন্যপান করে নাই? অতএব বুঝিতে হইবে, সে জন্মান্তরে স্তন্যপান করিয়াছিল এবং সেই ভূতপূর্ব্ব শরীরে কৃত স্তন্যপানের অভ্যাস, যাহা সংস্কাররূপে সঞ্চিত ছিল, তাহাই ইহজন্মে জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপান-প্রবৃত্তির আকারে প্রকাশিত হইতেছে।'

ন্যায়দর্শন-প্রদর্শিত জন্মান্তরের সাধক দ্বিতীয় শ্রেণীর যুক্তি-প্রণালী এইরূপ। ন্যায়দর্শন বলেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে কতকগুলি জন্মসিদ্ধ রাগ-দ্বেষ পরিদৃষ্ট হয়। এই রাগ-দ্বেষের নিদান ইহজন্মের কোন ব্যাপার-জনিত নহে, ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, সহজাত; জীব ইহা সঙ্গে করিয়া আনে। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে যখন সেই রাগ-দ্বেষ ইহজন্মের ব্যাপার-জনিত নহে, তখন উহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কারের ফল।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন, এক সময়ে পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানবিদেরা (Psychologists) মানুষের মনকে 'Tabula rasa' বলিতেন। অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে মানুষ যে মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা যেন লেখহীন সাদা শ্লেট, তাহার উপর কোনরূপ অক্ষরপাত বা হিজিবিজি থাকে না। শিশু জগৎ-ব্যাপারের সম্পর্কে আসিয়া যেমন যেমন শিক্ষা-নবিশিতে অগ্রসর হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শ্লেটে ক্রমশঃ রেখাপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্যের ফলে, এই শ্লেট ক্রমশঃ হিজিবিজিতে

ভরিয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই মতের সহিত ন্যায়দর্শনের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ন্যায়দর্শন বলেন, শিশু যে মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা সাদা শ্লেট নহে, তাহাতে পূর্ব্বাবধি অনেকই রেখাপাত আছে। সেই রেখাগুলি জন্মসিদ্ধ রাগ-দ্বেষ। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ যুগের পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদেরা 'Tabula rasa'র মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক স্থলে হারবার্ট স্পেনসর (Herbert Spencer) বলিয়াছেন, এক মাসের শিশুকে ধীরভাবে পরীক্ষা করিলে তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব নির্দ্ধারণ করা যায়। অতএব এই সম্বন্ধে ন্যায়ের মত উপেক্ষণীয় নহে।

এই যে জন্মগত রাগ-দ্বেষ, এ সম্বন্ধে ন্যায়দর্শন তৃতীয় আহ্নিকের প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ বলিতেছেন—

বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ—৩.১|২৫

ইহার বাৎস্যায়ণ ভাষ্য এইরূপ—

সরাগো জায়তে + + + + অয়ং জায়মানো, রাগানুবদ্ধো জায়তে। রাগস্য পূর্ব্বানুভূতবিষয়ানুচিন্তনং যোনিঃ। পূর্ব্বানুভবশ্চ বিষয়ানাম্ অন্যস্মিন্ জন্মনি শরীরম্ অন্তরেণ নোপপদ্যতে। সোয়ং আত্মা পূর্ব্বশরীরানুভূতান্ বিষয়ান্ অনুস্মরন্ তেষু তেষু রজ্যতে।

অর্থাৎ, 'জীব রাগযুক্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে; জাতমাত্র জীবে রাগানুবন্ধ দৃষ্ট হয়। রাগ বা আসক্তির যোনি পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তন। সেই বিষয়ের পূর্ব্বানুভব জন্মান্তরে গৃহীত শরীর ভিন্ন উপপন্ন হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই রাগানুবিদ্ধ আত্মা পূর্ব্ব শরীরে অনুভূত বিষয় সকলকে অনুস্মরণ করিয়াই তাহাতে রাগযুক্ত হয়।'

ন্যায়দর্শন এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন—

পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তে—৩।১।১৯

জাতঃ খল্বয়ং কুমারকঃ অস্মিন্ জন্মনি অগৃহীতেষু হর্ষভয়শোকান্ প্রতিপদ্যতে লিঙ্গানু-

মেয়ান্। তে চ স্মৃত্যনুবন্ধাৎ উৎপদ্যন্তে নান্যথা। স্মৃত্যনুবন্ধশ্চ পূর্ব্বভ্যাসমন্তরেণ ন ভবতি। পূর্ব্বাভ্যাসশ্চ পূর্ব্বজন্মনি সতি, নান্যথা ইতি সিধ্যত্যেতৎ। অবতিষ্ঠতে অয়ং উর্দ্ধং শরীরভেদাৎ ইতি—বাৎস্যায়ণ ভাষ্য।

অর্থাৎ, 'সদ্যোজাত শিশুর ইহজন্মে অননুভূত বিষয়েও হর্ষশোকভয় দৃষ্ট হয়। এই হর্ষশোকভয় অনুস্মরণ (স্মৃতি প্রবাহ) ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। অনুস্মরণ আবার পূর্ব্বাভ্যাস ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। যদি জন্মান্তর থাকে, তবেই পূর্ব্বাভ্যাস সম্ভব হয়—অন্যথা সম্ভব হয় না। সেই অভ্যাসের সংস্কার পূর্ব্বশরীর পাত হইলেও নষ্ট হয় না।' তবেই সিদ্ধ হইল যে, জন্মান্তরে জীব যে সকল বিষয় ভোগ করিয়াছিল, তাহার সংস্কার সে স্মৃতিরূপে ইহজন্মে বহন করিতেছে এবং সেই অনুস্মরণ হইতে তাহার অননুভূত বিষয়েও হর্ষ শোক উৎপন্ন হয়। এই ভাবে ন্যায়দর্শন জন্মান্তর সিদ্ধ করিয়াছেন।

হিন্দু দর্শন হইতে জন্মান্তরের সাধক কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শিত হইল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে জন্মান্তর-বাদ কিরূপে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

——:*:——

বিবর্ত্তনবাদ ও জন্মান্তর

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা জন্মান্তরের সাধক কয়েকটি দার্শনিক যুক্তির আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, জগতের মধ্যে যে বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, সেই বৈষম্য-সমস্যার একমাত্র সন্তোষজনক মীমাংসা—জন্মান্তর-বাদ। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে Instinct of Self-preservation বলে—প্রাণীমাত্রের সেই মরণ-ত্রাস—যাহা জীবের সহজাত সংস্কার, সেই সংস্কার দ্বারাও জীবের জন্মান্তর সিদ্ধ হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে. বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে Instinct বলে, যাহা সাংসিদ্ধিক বা স্বয়ংসিদ্ধ—সেই সংস্কারকে বিশ্লেষণ করিলেও জন্মান্তর প্রমাণিত হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সদ্যোজাত শিশুর মন লেখহীন সাদা শ্লেট্ নহে, তাহাতে জন্মাবধিই অনেকগুলি রেখাপাত দৃষ্ট হয়। এই রেখাগুলি তাহার পূর্ব্বজন্মে অনুভূত চিত্তবৃত্তির সংস্কারমাত্র। ইহার দ্বারাও জন্মান্তর সিদ্ধ হয়। এইবার আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে জন্মান্তরবাদ কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে. তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব বিবর্ত্তনরূপ আর্য্য-সত্যের আবিষ্কার। এই বিবর্ত্তনবাদ Theory of Evolution) এখন পাশ্চাত্য জগতের প্রাণস্বরূপ হইয়াছে এবং সকলক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ

ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। বিবর্ত্তন অর্থে ক্রমবিকাশ—অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের এবং ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততরের অভিব্যক্তি।*

প্রথমে এই জগৎ অসৎ বা অব্যাকৃত ছিল—

তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ—বৃহ, ১।৪।৭
অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ—তৈত্তি, ২।৭

বিজ্ঞান বলেন, জগতের সেই অব্যাকৃত, অব্যক্ত, অবিশেষ (Homogeneous) আদিম অবস্থা বিবর্ত্তিত হইয়া এই ব্যাকৃত, সুব্যক্ত, বিশিষ্ট বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। ইহা সেই প্রাচীন শিক্ষা—

অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ—সাংখ্যসূত্র
অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ—গীতা

অতএব দেখা গেল, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞান একমত। কিন্তু এই বিকাশের ক্রম ও প্রণালী কিরূপ? ক্রম সম্বন্ধেও বোধ হয় উভয় মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না।

বিজ্ঞানের দিক্ হইতে বিকাশের ক্রম মোটামুটি এইরূপে বর্ণিত হইতে পারে।

বিজ্ঞান বলেন, আদিতে শুধু Uniform Ether of Space বা 'প্রোটাইল' (Protyle) ছিল—আর ছিল Energy বা শক্তি। এই প্রোটাইল আমাদের পুরাণের কারণার্ণব, সাংখ্যের একাকার প্রকৃতি, ঋগ্বেদের অপ্রকেত সলিল।

অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং—১০।১২৯।৩

* From the homogeneous to the heterogeneous and from the less heterogeneous to the more heterogeneous অর্থাৎ, from indefiniteness, to definiteness, from simplicity to complexity.

একদিন ঐ ইথার-সাগর মথিত হইয়া অগণ্য বুদ্‌বুদ ভাসিয়া উঠিল। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম ইলেকট্রন্ (Electron) বা তাড়িতাণু। ইলেকট্রন্ কি ?

Electron is the specialisation or organisation of specks of Ether অর্থাৎ, নির্ব্বিশেষ ইথার-বিন্দুর কথঞ্চিৎ সবিশেষ ভাব—ইহাকেই আমরা বুদ্‌বুদ বলিতেছি। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ঐ ইলেকট্রন দ্বিবিধ—পুং বা Positive এবং স্ত্রী বা Negative। এই ভেদ সূচিত করিবার জন্য কেহ কেহ পুং ইলেকট্রনকে 'প্রোটন' (Proton) এবং স্ত্রী ইলেকট্রণকে 'ইয়ন্' (Ion) বলেন। এই প্রোটন ও ইয়ন নানা ভাবে সংহত ও সজ্জিত হইতে পারে। সেই সংহনন ভেদেই ভিন্ন জাতীয় পরমাণু বা Atoms (অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির) সৃষ্টি হইয়াছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে—Associated systems of electrons constitute the Atoms of matter অর্থাৎ, পারদে ও স্বর্ণে, বা হাইড্রোজেনে ও নাইট্রোজেনে, অন্য কোন প্রভেদ নাই—ভেদ কেবল ঐ ইলেকট্রনের সংস্থানে ও সজ্জায়। এক পাঁজা ইট পাইলে ঐ ইষ্টক বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিয়া আমরা যেমন বিচিত্র অট্টালিকা—মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারি ; নিসর্গ বা Nature সেইরূপ ইলেকট্রণ-রূপ ইষ্টক লইয়া সংস্থান ভেদে প্রায় নব্বই রকম রাসায়নিক পরমাণু বা Elements গঠন করিল। এই ক্রমে প্রোটাইল হইতে ক্রমশঃ পরমাণু উৎপন্ন হইল। তার পর তাপ, তাড়িত, আলোক, কিমিয়া-যুতি (Chemical Affinity) প্রভৃতি জড় শক্তি ঐ সকল বিবিধ পরমাণুর উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাদের সংযোগ-সমবায় দ্বারা এই বিবিধ, বিচিত্র, বিশাল, নিরঙ্গ জগৎ (the whole Inorganic Universe) রচনা করিল।

এ দেশের ভাষায় নিরঙ্গ জগতের নাম স্থাবর—বিজ্ঞান ইহাকে Mineral Kingdom বলেন। স্থাবরের পর জঙ্গম (Vegetable ও Animal Kingdoms)—স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। বিজ্ঞান এই জঙ্গম সৃষ্টিকে Organic Universe বলেন। স্থাবরকে বিশ্লেষণ করিলে চরমে যেমন পরমাণু পাওয়া যায়, জঙ্গমের বিশ্লেষণ করিলে চরমে সেইরূপ কোষাণু (Cell) পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে, স্থাবর সৃষ্টি প্রাণহীন; কিন্তু ক্রমে বিবর্তন জঙ্গম সৃষ্টিতে উপনীত হইলে, এক বিচিত্র ব্যাপার দৃষ্ট হয়, এক অভূতপূর্ব্ব অতর্কিত বস্তু দেখা দেয়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলি—As a new and astonishing departure came the Cell। কোথা হইতে এই Cell বা কোষাণু আসিল? ইহার মধ্যে আমরা কি এক বিস্ময়কর অভিনব শক্তির খেলা দেখিলাম! সে শক্তি প্রাণ বা জীবন (Life)। স্যার অলিভর লজ (Sir Oliver Lodge) বলেন, প্রাণ বলিলে এই বুঝি—The vivifying principle which animates matter—যে তত্ত্ব জড়কে অণুপ্রাণিত করে, প্রাণ সেই তত্ত্ব। তিনি আরও বলেন, Life must be considered sui generis, it is not a form of energy,nor can it be expressed in terms of something else * অর্থাৎ, প্রাণ বস্তুটি এক অদ্ভুত, আজব পদার্থ। ইহা কোন জড় শক্তির রূপান্তর নহে, কিম্বা কোন কিছুর সজাতীয় নহে। জড় শক্তির আয়তন সসীম, উহার পরিমাণ সামান্বিত—১০০০ ডিক্রি তাপ, ৫০০ বর্ত্তি আলোক দশ সহস্র ভাগ করিলে খণ্ডিত হইয়া ক্ষুদ্রতর হইয়া যায়; কিন্তু জীবন (Life) অখণ্ড ও অমেয়। একটি বীজ হইতে

* Raymond or Life and Death p. 290

বংশানুক্রমে শত শত, সহস্র সহস্র সন্ততি উৎপন্ন হইবে, তথাপি উহার শক্তি অপচিত হইবে না। *

ঐ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যে শক্তি উৎসারিত হয়,তাহার উৎস অক্ষয় ও অব্যয়। The seed embodies a stimulating and organising principle which appears to well from a limitless source. সেই জন্যই উপনিষদের ঋষি প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।

অর্থাৎ, জীবন অপেত হইলে সংঘাত বিনষ্ট হয়, কিন্তু জীবন কখনও বিনষ্ট হয় না।

এই সংঘাত-রচনা প্রাণের একটী বিশিষ্ট ব্যাপার। আমরা যেমন পুরী রচনা করি, প্রাণ সেইরূপ সংঘাত (Structure বা Organism) রচনা করে। †

আমরা যখন কোন পুর রচনা করি, তখন তাহার মালমসলা, তাহার উপাদান নিজেরা তৈয়ার করি না—প্রাকৃতিক উপাদান সংস্থান করি মাত্র। প্রাণও সংঘাত-রচনায় সেইরূপ করে। ঐ পুর-রচনায় আমরা প্রাকৃতিক

* The seed can give rise to innumerable descendants through countless generations, without limit. There is nothing like a constant quantity to be shared, as there is in all examples of energy; there is no conservation about it.—Raymond p. 240.

† সেই জন্য স্যার অলিভর লজ বলিতেছেন—

But although life is not energy, any more than it is matter, yet it directs energy and thereby controls arrangements of matter. Through the agency of life specific structures are composed, which would not otherwise exist, from a sea-shell to a cathedral, from a blade of grass to an oak.

নিয়মের (Physical, Chemical and Mechanical Laws) কোন রূপ ব্যতিক্রম করি না—তাহাদের চালনা করি মাত্র। সংঘাত-রচনায় প্রাণও তাহাই করে।*

প্রাণের আর একটী ব্যাপার নির্ব্বাচন—হিতকর ও অহিতকর, মিত্র ও অমিত্রের মধ্যে বিবেচন। লজ বলেন, ইহা প্রাণের নিজস্ব—ইহা জড়শক্তির বহির্ভূত। কারণ, ইহার মধ্যে যেন ঈক্ষা বা সংকল্পের আভাস পাওয়া যায়।

প্রাণের আর একটি নিজস্ব ব্যাপার পুষ্টি বা বিবৃদ্ধি (Growth)। নিরঙ্গ বস্তু ও (Inorganic substance) বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু সে বৃদ্ধি এবং সাঙ্গ বস্তুর বৃদ্ধি এক জাতীয় নহে। উদাহরণ স্বরূপ Crystalএর উল্লেখ করা যাইতে পারে। লজ বলিয়াছেন—

The differences between a growing organism and a growing crystal are many and various—এবং তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্য প্রখ্যাত শারীর-বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক হ্যারিসের (Fraser Harris) অভিমত সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অধ্যাপক হ্যারিস বলেন—'প্রাণীদিগের মধ্যে সে ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা তাহারা প্রায়শঃ বিজাতীয় আহার আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের দেহ পুষ্ট ও বিবৃদ্ধ করে—ইহা এক অদ্ভুত ক্ষমতা। অপ্রাণীর মধ্যে এ ক্ষমতা আদৌ লক্ষিত হয় না।' †

* Admittedly life exerts no force, it does no work but makes effective the energy available to an organism which it controls and vivifies; it determines in what direction and when work shall be done * * One of its functions is to discriminate between the wholesome and the deleterious, between friend and foe. This is a function outside the scope of physics.—Raymond, page 291.

† Living animal bioplasm has the power of growing, that is of assimilating matter, in most cases chemically quite unlike its own constitution. Now this is a remarkable power not in the least degree shared by non-living matter.

মানুষ—মৎস্য, মাংস, পশু, পক্ষী, শাক, পত্র, ফল, মূল, ঘি, চিনি—যাহাই ভোজন করুক না কেন, ঐ ক্ষমতার বলে সকল রকম খাদ্যই পরিপাক করিয়া মানব-'ধাতুতে' পরিণত করিবে। ইহা কি অতিশয় বিচিত্র ব্যাপার নহে?* সত্য বটে কৃষ্ট্যালেও বৃদ্ধির ব্যাপার দেখা যায়, কিন্তু অধ্যাপক ফ্রেজার বলিতেছেন যে, সে বৃদ্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। A crystal growing in a solution is not analogous to this process, it is in the sharpest possible contrast with it। কেন? প্রথমতঃ, ঐ কৃষ্ট্যাল কোন কিছু পরিপাক করিতে পারে না—বিসদৃশ উপাদানকে আত্মসাৎ করিতে পারে না; সদৃশ উপাদানকে সংযুক্ত করিয়া বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

অর্থাৎ, প্রাণভৃতের ন্যায় কৃষ্ট্যালের 'স্বীকরণ' নাই—আছে কেবল সংযোজন। †

দ্বিতীয়তঃ, প্রাণী শুধু গ্রহণ করে না—বর্জ্জন করে। অপ্রাণীতে এই বিসর্গ ব্যাপার (Excretion) একেবারেই নাই। সেই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা বলেন, প্রাণীর মধ্যে শুধু প্রাণ নাই—অপান আছে। প্রাণের কার্য্য আদান—অপানের কার্য্য বিসর্গ।

প্রাণাপানসমাযুক্তো পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।—গীতা

---

* The mere fact that a man eating beef, bird, fish, lobster, sugar, fat and innumerable other things can transform these into human bioplasm, something chemically very different even from that of them which most resembles human tissue, is one of the most extraordinary facts in animal physiology.

† A crystal grows only in the sense that it increases in bulk by accretion to its exterior, only does that by being immersed in a Solution of the same material as its own substance. It takes up to itself only material which is already similar to itself; this is not assimilation, it is merely incorporation.

সেই জন্য প্রাণী হইতে ক্রুষ্ট্যালের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া অধ্যাপক ফ্রেজর বলিতেছেন:—

The crystal is only incorporating, not excreting anything, whereas, living matter is always excreting as well as assimilating. This one-sided metabolism is indeed characteristic of the crystal, but it is at no time characteristic of the living organism.

প্রাণীতে ও অপ্রাণীতে, সাঙ্গে ও নিরঙ্গে এই মর্ম্মান্তিক প্রভেদ। প্রাণিদেহে নিরন্তরই ঐ আদান ও বিসর্গ—ঐ assimilalton ও excretion যুগপৎ চলিতেছে। শারীর বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাদিগকে Anabolism ও Katabolism বলে। শিশুদেহে বিসর্গের অপেক্ষা আদান বেশী—সেই জন্য শিশুদেহ ক্রমশঃ পুষ্ট ও পরিণত হইয়া যুবা হয়। যুবাদেহে ঐ Anabolism ও Katabolism তুল্য-বল (quantitatively equal) —যতটা বিসর্গ, ততটাই আদান। কিন্তু বার্দ্ধক্যে বিসর্গই প্রবল—তখন আদানের অভিভূত অবস্থা ; সেই জন্যই দেহের ক্রমশঃ ক্ষয় ও অপচয় হয়।*

কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ —সকল অবস্থাতেই প্রাণি-শরীরে ঐ আদান ও বিসর্গের ব্যাপার যুগপৎ চলিতেছে—অপচয়ের স্থলে উপচয় হইতেছে, ক্ষয় ব্যয়ের স্থলে সঞ্চয় হইতেছে। †

* In the adult of stationary weight anabolism is quantitatively equal to katabolism, whereas in the truly growing organism anabolism is prevailing over katabolism ; conversely, in the wasting of an organism or senile decay, katabolism is prevailing over anabolism.

† The organism, whether truly growing, or only in metabolic equilibrium, is constantly taking up material to replace effete material, is replenishing because it has previously displenished itself or cast off material.

প্রাণীর ইহাই স্বালক্ষণ্য বা বৈশিষ্ট্য—অপ্রাণীতে এ ব্যাপার আদৌ নাই।

এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ফ্রেজার বলিতেছেন—

Between the living and the non-living, there is a great gulf fixed and no efforts of ours, however heroic, have as yet bridged it over.

অর্থাৎ—

প্রাণী আর অপ্রাণীতে বহুত অন্তর।
দুঁহুঁ মাঝে সেতু গড়া ব্যর্থ নিরন্তর॥

আমরা দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে স্থাবর-সৃষ্টি প্রাণহীন। এই প্রাণহীন জগতে কিরূপে জঙ্গম বা প্রাণীর উদ্ভব হইল, জড়ের (Dead matter এর) মধ্যে কিরূপে প্রাণ সঞ্চার হইল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাছে ইহা একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে দুই দল আছেন। এক দল বলেন, জগতের সেই অতীত কল্পে স্থাবরের মধ্যে এক দিন অতর্কিত, অজ্ঞাতভাবে প্রাণ দেখা দিয়াছিল। এ দলের নাম—Abiogenist। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই দলভুক্ত। অন্য দল বলেন, অপ্রাণী, প্রাণহীন কখনও প্রাণভৃতের জনক হইতে পারে না। প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি। তাঁহারা বলেন, স্মরণাতীত কালে গ্রহান্তর হইতে আকাশমার্গে কেমন করিয়া প্রাণের বীজ আমাদের পৃথিবীতে পহুঁছিয়া ছিল। সেই বীজ হইতেই প্রাণীজগতের উৎপত্তি। এই দলের নাম Biogenist। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দল প্রশ্নটার সমাধান করিলেন না, পিছাইয়া দিলেন মাত্র। কারণ, আমাদের এই পৃথিবীগ্রহে যদি গ্রহান্তর হইতে প্রাণ-বীজ উড়িয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তরদানে

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপারগ। কিন্তু প্রাচ্য প্রজ্ঞানের পক্ষে ইহার উত্তর কঠিন নহে। প্রাচ্য প্রজ্ঞান বলেন, তোমরা যাহাকে প্রাণহীন জড় বলিতেছ, সে বাস্তবিক প্রাণহীন নহে—সে মহাপ্রাণের অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত। বাস্তবিক জড় বলিয়া কোন কিছু নাই, সমস্তই চিন্ময়। তোমার যে স্থাবর-সৃষ্টি (Mineral Kingdom), সেও প্রাণময়ী। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এই তত্ত্বই পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ঋষি-সন্তান, অতএব প্রাচ্য প্রজ্ঞানের এই অন্তরঙ্গ কথা যে তাঁহার 'ধী'র মধ্যে মুখরিত হইয়াছে, ইহা সুসঙ্গত। সে যাহা হউক, যে উপায়েই হউক স্থাবর জগতে যখন প্রাণ দেখা দিল, তখন হইতেই জঙ্গম-সৃষ্টির আরম্ভ।

প্রথমে,উদ্ভিদ্ রাজ্য—Vegetable Kingdom। প্রাণ ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের প্রেরণায় উদ্ভিদ্ রাজ্য অতিক্রম করিয়া জীবরাজ্যে (Animal Kingdomএ) উপনীত হইল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে জীবরাজ্যে বিকাশের ক্রম এইরূপ—প্রথম সরাসৃপ, তাহার পর পক্ষী, পশু, বানর, মনুষ্য ইত্যাদি। এই ক্রমের সহিত প্রাচ্য প্রজ্ঞানের কোন বিবাদ নাই। বরং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারের ক্রমপর্য্যায় দ্বারা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের পূর্ব্ব সূচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ দেশের আরও শিক্ষা এই যে, জলজ ও স্থলজ বহু সহস্র জীবযোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্যযোনিতে উপনীত হইতে হয়। ইহাকেই বলে—চৌরাশির চক্র। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ এই বিষয়ের বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

অর্থাৎ, 'স্থাবর ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, কূর্ম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ—ইহার পর জীব মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ দ্বিজত্বে উপনীত হয়। দ্বিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব শেষে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।'

ইহার মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তা'ই বলিতে ছিলাম যে, বিবর্ত্তনের ক্রম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই। কিন্তু বিবর্ত্তনের প্রণালী লইয়া মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন, এই যে বিবর্ত্তন, ইহা দেহগত। প্রাচ্য প্রজ্ঞান বলেন, ইহা দেহগত নহে, জীবগত। এ জন্মে জীব ক্রম-বিকাশের যে সোপানে উপনীত হয়, সেই উন্নতি সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে রক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জন্মের পর জন্ম জীব উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে।

জীব প্রথমে স্থাবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের ফলে স্থাবর-রাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। জঙ্গম-রাজ্যে উপনীত হইয়া প্রথমে সে সরীসৃপের দেহ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের ফলে, সে সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু-দেহে প্রবেশ করে। পশু-রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জীব মনুষ্য-দেহ ধারণের উপযোগী হয়। মানবের মধ্যেও প্রথম অসভ্য, তাহার পর অর্দ্ধ সভ্য, তাহার পর সভ্য, চরমে সুসভ্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও তাহার ক্রম বিকাশের শেষ হয় না। মানুষ ক্রমে অতি-মানুষ হয়। মানবতার সীমা অতিক্রম

করিয়া জীব অবশেষে জীবন্মুক্ত হয়। ইহাই ক্রমবিকাশের শেষ সোপান। *

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য বিবর্ত্তনবাদের সহিত জন্মান্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জীব বহু বহুবার জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক জন্মে সে উন্নতি করিবার যে সুযোগ পায়, তাহার সদ্‌ব্যবহার দ্বারা প্রায়ই সে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া থাকে, কখনও বা দু এক পদ পিছাইয়াও আইসে। প্রত্যেক জন্মের সংস্কার জীবের মধ্যে সুরক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের সুবিধা ভোগ করে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে কিন্তু বিবর্ত্তনের প্রণালী অন্যরূপ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলেন ('বলিতেন' বলিলে বোধ হয় সঙ্গত হইবে, কারণ সম্প্রতি অনেক বৈজ্ঞানিক এ মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন) যে, প্রাণিজগতে সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়। পিতা মাতার জীবিতমানে তাহারা যদি কোন গুণ আয়ত্ত করিয়া থাকে, তবে সন্তানে তাহা সংক্রামিত হয়। ইহাকে বলে উত্তরাধিকার নিয়ম বা Law of Heredity। এই নিয়মে বংশানুক্রমে সন্ততির পর সন্ততিতে সেই গুণ বর্দ্ধমান হইয়া সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করে। এইরূপে ধীরে ধীরে বিবর্ত্তন বা Evolution দ্বারা জীবের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ হয়।

কথাটা একটু বিশদ করা ভাল। ধরুন, 'জিরেফা' প্রাণী-রাজ্যের একটী জীব। জিরেফা গাছের পাতা খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। আরও অনেক জন্তু আছে যাহারা এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিযোগী, কারণ, গাছের পাতা

* এই মর্ম্মে সুফি সাধক বলিয়াছেন—I died from the mineral and became a plant. I died from the plant and reappeared in an animal. I died from the animal and became a man. Wherefore then should I fear? When did I grow less by dying?—Mansavi.

তাহাদেরও খাদ্য। যত গাছের পাতা থাকিলে সমস্ত পত্র-ভোজী জীব সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, জিরেফার আবাস-ভূমি কোন এক অরণ্যে তত পাতা নাই। কাজেই অন্য জন্তুর সহিত জিরেফার এবং এক জিরেফার সহিত অন্য জিরেফার :জীবন-সংগ্রাম (যাহাকে Struggle for Existence বলে) আরম্ভ হইল। এই সংগ্রামে যে প্রবল, যে যোগ্যতর, গাছের পাতা সংগ্রহ করিবার পক্ষে যাহার সুযোগ ও সুবিধা বেশী ছিল, সেই বাঁচিয়া গেল; অপর জন্তুর বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইল, অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতরের জয় হইল। *

পূর্ব্বে যে জীবন-সংগ্রামের কথা বলা হইল, বলা বাহুল্য, সেই সংগ্রাম যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেই চলিতেছে তাহা নহে, কিন্তু এক শ্রেণীভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যেও চলিতেছে। তাহার ফল এই হয় যে, যখন খাদ্যকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, অর্থাৎ, যখন গাছের পাতা যে পরিমাণ জুটিলে সকল জিরেফার সুখে খাওয়া দাওয়া চলে, সে পরিমাণ গাছের পাতা দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন যে জিরেফারা যোগ্যতর, যাহারা গলা এমন দীর্ঘ করিতে পারে যে, গাছের উচ্চ ডালের পাতাও তাহাদের অধিগম্য হয়, জীবন-

* Some antediluvian member of the condylartha found his food at an abnormal height over his head, and had to stretch it day after day to get his dinner; years so passing, little by little his neck grew longer. His offspring then inherited the extra length of neck of their parent, and lengthened their necks also, because of the need for them too to stretch out their necks for food; and so slowly the original type differentiated into the new species, the Giraffes. Other condylartha developed a tendency to butting, and the irritated bony part of the head thickened, and this thickness being transmitted from parent to offspring, slowly there arose antlers on the head; and so came the new species, the Deer.

—Theosophy and Modern Thought. p. 4.

সংগ্রামে সেই সকল জিরেফাই বাঁচিয়া যায় ; আর যাহাদের গলা ততটা দীর্ঘ নহে, তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া জীবনসংগ্রামে পরাভূত হয়। ইহাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the Fittest) বলে।

অবশ্য জিরেফার সন্তান জিরেফাই হয়—গো মহিষ বা সিংহ ব্যাঘ্র হয় না। * কিন্তু তথাপি এক পিতামাতার যমজ সন্ততির মধ্যেও কিছু বৈসাদৃশ্য থাকেই—দুটি ব্যক্তি ঠিক সদৃশ হয় না। প্রকৃত স্থলে, দুইটি জিরেফা সদৃশ হইলেও তাহাদের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকিবেই। একটির গলা আর একটির অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইবেই। এক দল জিরেফার মধ্যে কয়েকটির গলা দীর্ঘ, কয়েকটির গলা অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব না হইয়া যায় না। এইরূপ যাহাদের গলা স্বভাবতঃ দীর্ঘ বা যাহারা প্রযত্ন দ্বারা গলা দীর্ঘ করিতে পারে, তাহারাই খাদ্য-কৃচ্ছ্র স্থলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া টিকিয়া যায় ; যাহাদের গলা হ্রস্ব তাহাদের মধ্যে অনেকেই জীবন-সংগ্রামে বিনষ্ট হয়, সুতরাং তাহাদের বংশ রক্ষা বা বংশ বৃদ্ধি হয় না। পক্ষান্তরে যাহাদের গলা দীর্ঘ, তাহারা সন্তান উৎপাদন করিয়া বংশবিস্তার করিতে থাকে এবং উত্তরাধিকার নিয়মে (Law of Heredity অনুসারে) নিজেদের স্বভাবজাত বা চেষ্টাকৃত দীর্ঘ গলা সন্ততিতে সংক্রামিত করে। সেই সন্ততিদিগের মধ্যে আবার যাহারা স্বভাবতঃ বা প্রযত্নতঃ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘগ্রীব, জীবন-সংগ্রামে তাহারাই হ্রস্বগ্রীব জ্ঞাতিগণকে পরাজিত করিয়া টিকিয়া যায় ও বংশ বিস্তার করে। এইরূপে দীর্ঘগ্রীবত্ব গুণ বংশপরম্পরা-ক্রমে 'নৈসর্গিক নির্ব্বাচনের' (Natural Selection) ফলে জিরেফা

*Cows beget cows, not cabbages.

Though like begets like, it never begets exactly alike. There are differences. This we call variation.

জাতিতে স্থায়ী ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘগ্রীবার ক্রমবিকাশ সাধন করিয়া বিবর্ত্তনের বিধানে বর্ত্তমান লম্বা-গলা জিরেফা শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে।*

জিরেফা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য প্রাণীর বিবর্ত্তন সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। ধরুন, হরিণের নিবাসভূমি কোন অরণ্যে ব্যাঘ্রের উৎপাত হইল। বাঘেরা ধরিয়া ধরিয়া হরিণ খাইতে লাগিল। 'যঃ পলায়তি স জীবতি', এই নীতির অনুসরণ করিয়া হরিণেরা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। যে স্বভাবতঃ ক্ষিপ্রগতি অথবা যে প্রাণ রক্ষার প্রবল আয়াসে ক্ষিপ্রগতি অর্জ্জন করিয়া লইতে পারিল, সেই সকল হরিণই বাঁচিয়া গেল, মন্থর-গতি হরিণেরা বাঁচিতে পারিল না। সেই সকল ক্ষিপ্রগতি হরিণ হরিণী যে সন্তানের জন্ম দিল, তাহারা পিতৃগুণ (ক্ষিপ্রগতিত্ব) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের তাড়া চলিতে লাগিল; সুতরাং ঐ ক্ষিপ্রগতিত্ব গুণ বংশানুক্রমে উপচিত হইতে লাগিল। পিতা হইতে পুত্র ক্ষিপ্রতর হইল, পুত্র হইতে পৌত্র অধিক ক্ষিপ্রতর হইল. পৌত্র হইতে প্রপৌত্র আরও অধিক ক্ষিপ্রতর হইল। এইরূপে ক্ষিপ্রগতিত্বগুণ হরিণ জাতিতে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ীভাব ধারণ করিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে, এই প্রণালীতে প্রাণিজগতে শ্রেণী-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ ডার্ব্বিন ইহাকে Origin of

* We said that heredity was essential also. And so it is, for the offspring of the fittest who have survived inherit their parents' fitness. Thus the next generation will start from a new average, so to say; and while some of its members will be more fit than others (owing to variation again), the whole of the next generation will be fitter or better adapted, as a whole, because, by our theory, it inherits the fitness characteristic of its parents who were the survivors from the generation before.—Harmsworth's Popular Science. P. 1281.

Species বলিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেনসর এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া ঐ উত্তরাধিকার নিয়ম (Law of Heredity) মনোরাজ্যে প্রয়োগ করিয়া মানসিক বিবর্ত্তন বা বুদ্ধির ক্রমবিকাশ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা দেখা যায় যে, ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার ১০ সেকেণ্ড মধ্যে মোরগ শিশু পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ায়, চলা ফেরা করে, খাদ্য খুঁটিয়া খায়। সদ্যঃপ্রসূত মোরগ-শিশু এ সকল ব্যাপার শিখিল কিরূপে? কেহ ত' তাহাকে শিখায় নাই—জন্মের পর এখনও ত' কোন কিছু শিখিবার তাহার অবসরই হয় নাই। স্পেনসার বলেন যে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশপরম্পরাগত পৈতামহিক সংস্কারপুঞ্জ—যাহা ঐ সদ্যোজাত মোরগ-শাবকের মস্তিষ্কে ও স্নায়ুমণ্ডলাতে সঞ্চিত থাকে—সেই সহজাত সংস্কারই ঐ সকল ব্যাপারের জনক। এইরূপে আজ যে আমরা উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধীশক্তি-সম্পন্ন মানব দেখিতেছি, সেও ঐরূপ বিবর্ত্তনের ফল। অসভ্য পূর্ব্ব পিতামহ—যে পাঁচ অবধি গণিতে জানিত না, যাহার ভাষায় কেবল নাম ও ক্রিয়াপদ ছিল—সেই এইরূপে নিউটন সেক্‌স্‌পীয়রের জনক হইয়াছে। এইরূপেই সঙ্গীতের বর্ণজ্ঞানহীন পূর্ব্ব পিতামাতা তানসেন, বিথোভেনের মত সঙ্গীতাচার্য্যের জন্ম দিয়াছে। কারণ, স্মরণাতীত অতীত যুগে আমাদের বন্য পূর্ব্বপুরুষগণ যে চেষ্টা, যে চিন্তা, যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিল, তাহাই বংশপরম্পরাক্রমে চক্রবৃদ্ধি নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া পিতা হইতে পুত্রে, পুত্র হইতে পৌত্রে, পৌত্র হইতে প্রপৌত্রে উত্তরাধিকার দ্বারা সংক্রামিত হইয়া, এবং পুঞ্জীভূত হইয়া ধীরে ধীরে আজ সভ্য মানব-শিশুর মস্তিষ্কে বিকশিত বুদ্ধির আকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাই মানসিক ক্রমবিকাশ—ইহাই বিবর্ত্তনের সার্থকতা।*

---

* In the attempt to explain the racial devolopment of mind Spencer invoked, as seems most reasonable, the principles of Lamarck. He

বলা বাহুল্য, ডার্বিন ও স্পেন্সারের সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়—যদি পিতৃলব্ধ গুণ উত্তরাধিকার নিয়মে পুত্রে সংক্রামিত হওয়ার মত (transmission of acquired characters) বিজ্ঞান-সম্মত হয় তবে আর বিবর্ত্তন সিদ্ধ করিবার জন্য জন্মান্তরবাদের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হয় না—Law of Heredity (উত্তরাধিকার নিয়ম) ও বংশপরম্পরাক্রমে উপচীয়মান সংস্কারপুঞ্জ দ্বারাই আমরা জীবের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু যদি ঐ মত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ হয়, তবে জন্মান্তরবাদের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় আছে কি? সমস্যাটা এমন জটিল ও প্রয়োজনীয় যে, এ বিষয়ের একটু সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন। আগামী অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

observes the extraordinary skill of the chick, which, ten seconds after coming out of the egg, can balance itself, run about and pick up food. How did the chick learn this very complex co-ordination of eye, muscles and beak? It has not been individually taught, its personal experience is *nil*, but according to Spencer, it has the benefit of ancestral experience. According to Spencer, the age-long experience of the race is registered in the structure of the young individual—which is, of course Lamarckism. Thus he argues, in a celebrated passage that the human brain is the "organised register of infinitely numerous experiences received during the evolution of life or, rather during the evolution of that series of organisms through which the human organism has been reached. The effects of the most uniform and frequent of these experiences, have been successively bequeathed, principal and interest, and have slowly mounted to the high intelligence which lies latent in the brain of the infant. Thus it happens that the European inherits from twenty to thirty cubic inches more of brain than the Papuan. Thus it happens that faculties, as of music, which scarcely exist in some inferior races, become congenital in superior ones. Thus it happens that out of savages unable to count up to the number of their fingers, and speaking a language containing only nouns and verbs, arise at length our Newtons and Shakespeare.

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ততি না উন্নতি ?

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ডার্বিন (Charles Darwin)-প্রমুখ বিবর্ত্তন-বাদীদিগের প্রচারিত যে বিবর্ত্তনক্রমের বর্ণন করিয়াছি, তাহা হইতে তিনটি সূত্র আবিষ্কার করা যায়—

(১) পিতামাতার স্বোপার্জ্জিত গুণ উত্তরাধিকার নিয়মে সন্ততিতে সংক্রামিত হয়।

(২) ঐ গুণ বংশানুক্রমে সন্ততির পর সন্ততিতে ধীরে ধীরে উপচিত হইয়া সুদীর্ঘ কালে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিলে, এক জাতি হইতে অভিনব উপজাতির (Species) উৎপত্তি হয়।

(৩) প্রাণি-জগতের ঐ সকল পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই সিদ্ধ হয়। উহারা পরিপার্শ্ব বা Environmentএর অবশ্যম্ভাবী ফল—উহারা আকস্মিক বা স্বয়ংসিদ্ধ নহে—নৈমিত্তিক বা আধিভৌতিক অর্থাৎ পারি-পার্শ্বিক-অবস্থা-সঞ্জাত।

একে একে আমরা এই তিনটি সূত্রের আলোচনা করিব এবং ইহাদিগের বৈজ্ঞানিক বলাবল পরীক্ষা করিয়া দেখিব। সে পরীক্ষার ফলে, বোধ হয় প্রতিপন্ন করিতে পারিব যে, বিবর্ত্তন দেহগত নহে, জীবগত। বিবর্ত্তন যদি

জীবগত হয়, তবে জন্মান্তর স্বীকার করিতেই হইবে—নতুবা বিবর্ত্তন নিরাধার থাকিবে, প্রাকৃতিক নিয়মে কিরূপে ক্রম-বিকাশ সাধিত হইয়াছে, এ প্রশ্ন নিরুত্তর থাকিবে।

আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় এই যে, পিতামাতার অর্জ্জিত গুণ সন্ততিতে সংক্রামিত হয় কি না। এইরূপ সংক্রমণকে উত্তরাধিকার-নিয়ম বা Law of Heredity বলে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে প্রাণিজগতে সন্তান উত্তরাধিকার-সূত্রে জনকের অর্জ্জিত গুণ প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রাণী বলিতে উদ্ভিদ্ (Vegetable) এবং জীব-জন্তু (Animal) উভয়ই। জনক জননী জীবিতমানে যদি কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে সেই অর্জ্জিত গুণ সন্তানে সংক্রামিত হয়। এই নিয়মে বংশানুক্রমে সন্ততির পর সন্ততিতে সেই গুণ উপচীয়মান হইয়া কালে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। এইরূপে প্রাণীর ক্রম-বিকাশ সিদ্ধ হয়।

জিরেফার আদিপুরুষ আধুনিক জিরেফার মত দীর্ঘগ্রীব ছিল না। কিন্তু যখন খাদ্যকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইল, তখন সেই পূর্ব্ব যুগের জিরেফাদিগের মধ্যে যাহাদের গলা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছিল, তাহারাই উচ্চবৃক্ষের পাতা খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া গেল; আর যাহাদের গলা হ্রস্ব ছিল, তাহারা জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইল। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘগ্রীব জিরেফারা উত্তরাধিকার-নিয়মে নিজেদের স্বভাবজাত বা চেষ্টাসিদ্ধ দীর্ঘ গলা সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত করিল। সেই সন্ততিদিগের মধ্যে আবার যাহারা স্বভাবতঃ বা প্রযত্নতঃ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘগ্রীব, তাহারাই হ্রস্বগ্রীব জ্ঞাতিগণকে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত করিয়া টিকিয়া গেল ও বংশ বিস্তার করিল। এইরূপে দীর্ঘগ্রীবত্ব গুণ বংশ-পরম্পরাক্রমে Natural Selection বা নৈসর্গিক নির্ব্বাচনের ফলে জিরেফা জাতিতে স্থায়ী ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া

দীর্ঘগ্রীবার ক্রম-বিকাশ সাধন করিয়া বর্ত্তমান যুগের লম্বাগলা জিরেফা-শ্রেণীর সৃষ্টি করিল। অতএব এ মতে ক্রমবিকাশ সিদ্ধ করিবার জন্য পিতৃলব্ধ গুণ বা বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার-নিয়মে পুত্রে সংক্রামিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই Transmission of acquired characters যদি প্রমাণ-সিদ্ধ না হয়, তবে এ নিয়মের সাহায্যে জীবের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট নহে কি ? সন্ততিতে এই গুণ-সংক্রমণের 'থিওরি' (Theory) কি প্রমাণসিদ্ধ ?

আমরা যাহাকে উত্তরাধিকার নিয়ম বলিলাম, সেই Law of Heredity ফরাসী বৈজ্ঞানিক লামার্ক (Lamarck) প্রথম প্রচার করেন। তিনি বলিতেন পিতার চেষ্টা ও উদ্যমের সংস্কার পুত্রে সংক্রামিত হয় অর্থাৎ, জনকের স্বোপার্জ্জিত গুণ সন্ততি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়।* ডারবিন লামার্কের এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুত বিবর্ত্তন-বাদ প্রবর্ত্তিত করেন। পিতা হইতে স্বোপার্জ্জিত গুণ কিরূপে পুত্রে সংক্রামিত হয় ? ইহার উত্তরে ডারবিন বলেন যে, জনক জননীর শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম কলা বা অবয়ব সম্ভূত হইয়া শুক্র ও আর্ত্তবে সঞ্চিত হয়—অতএব শুক্র ও আর্ত্তবের মিলনে যখন সন্তানের দেহোৎপত্তি, তখন সন্তানে যে পিতা মাতার অর্জ্জিত গুণ সংক্রামিত হইবে,ইহাতে বিচিত্র কি ? এই Theoryকে

* Lamarck declares that the effects of the development of the individual, its striving and achievement, are handed on by heredity to the next generation. *

Thus Lamarck explains the long neck of the giraffe as developed by its feeding habits and gradually increased, by a kind of snowball process, in successive generations. Similarly, half-erect apes tried to become erect, and finally man became so.

ডার্বিন Pangenesis নাম দিয়াছেন।* আমাদের দেশে যে পুত্র সম্বন্ধে বলা হয়, 'অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ সম্ভবসি', ইহা তাহারই অনুরূপ কথা। এ কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি ?

আমরা দেখিয়াছি, হার্ব্বার্ট স্পেনসার ঐ উত্তরাধিকার-নিয়ম মনোরাজ্যে প্রয়োগ করিয়া মানসিক বিবর্ত্তন বা বুদ্ধির ক্রমবিকাশ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, স্মরণাতীত অতীত যুগে আমাদের অসভ্য পূর্ব্ব পিতামহগণ যে চেষ্টা, যে চিন্তা, যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিল, তাহা বংশ পরম্পরাক্রমে চক্রবৃদ্ধি নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া পিতা হইতে পুত্রে, পুত্র হইতে পৌত্রে, উত্তরাধিকার দ্বারা সংক্রামিত ও ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইয়া আজ সভ্য মানব-শিশুর মস্তিষ্কে বিকশিত বুদ্ধির আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে আমাদের বন্য পূর্ব্ব পুরুষ, যে পাঁচ অবধি গুণিতে জানিত না, সেই বংশ-পরম্পরাক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে পুঞ্জীভূত সংস্কারপুঞ্জ সন্ততিতে সংক্রামিত করিয়া নিউটন সেক্‌সপীয়রের জনক হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ডার্বিন-স্পেনসার-প্রতিষ্ঠিত বিবর্ত্তন বাদের ঐ মূল সূত্র যদি কোনরূপে শিথিল হইয়া যায়, তবে বিবর্ত্তন বাদের এই প্রকাণ্ড সুরম্য অট্টালিকা বালুকা-সৃষ্টির ন্যায় ভূমিসাৎ হইবে।

* Darwin supposed that from every part of the body, there were given off tiny representatives which he called "gemmules" and that each gemmule had the power of reproducing something like the part of the body from which it had sprung. By the blood stream, these gemmules were supposed to be carried to the reproductive glands, and there elabrated into what we call germ-cells. Thus the germ-cells would veritably be produced from the body of the parent,—the hairs and nails and muscle-cells and brain cells and so forth, each sending gemmules which would develope into corresponding structures in the new individual.—Harmsworth's Popular Science, p 1038.

ডার্বিনের Pangenesis অনেক দিন বৈজ্ঞানিক সমাজে বেশ সমাদৃত হইয়াছিল ; কিন্তু কালে জার্ম্মাণিতে একজন প্রখ্যাত জৈব-বিজ্ঞান-বিদের উদয় হইল, যিনি অকাট্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এ মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার নাম বিসম্যান্. (Weismann)। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, যে বীজ হইতে সন্তানের দেহারম্ভ হয়, সে বীজ জনকের সমস্ত অঙ্গ হইতে সম্ভূত হয় না—পিতামাতার শরীরে Germ-plasm নামক যে এক বিচিত্র বস্তু আছে, উহা হইতে পুত্রের উদ্ভব হয়।* Germ-plasm, তাহার মতে, বীজাণুর কেন্দ্র মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সুযোগ হইলে পিতৃগত যোগ্য পুংবীজাণু (Germ-cell) মাতৃগত যোগ্য স্ত্রী-বীজাণুর সহিত মিলিত হইয়া সন্তানের বীজ বপন করে। এখানেও সেই "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।" বিজ্ঞানের ভাষায় এই সংযোগকে Gameto-genesis বলে। ইহার ফলে দুইটী মিলনযোগ্য বীজাণু মিলিত হইয়া একটা Zygote সৃষ্টি করে। Zygote অর্থাৎ সন্তান-বীজ বা ভ্রূণাণু।†

* All parts of the body do not contribute to produce a germ from which the new individual arises but that on the contrary the offspring owes its origin to a peculiar substance of extremely complicated structure —the germ-plasm.—Weismann.

A special organised and living hereditary substance, which in all multicellular organisms, unlike the substance composing the perishable body of the individual, is transmitted from generation to generation. This is the theory of the continuity of the germ-plasm.—Weismann.

Weismann located the germ-plasm in the nuclei of the germ-cells.

† The modern name for this process as it occurs in either sex, is gameto-genesis, as we have seen, its results being the gametes or marrying cells, which are the final ripe germ-cells, capable of mating to form the new individual or zygote.—Harmsworth's Popular Science p. 1998.

এই যে একটি মিলনযোগ্য পুংবীজাণু (Male gamete) ও আর একটি মিলনযোগ্য স্ত্রীবীজাণু (female gamete) শুক্র-আবর্ত্ত সংযোগে সম্মিলিত হইয়া ভ্রূণাণু বা zygote সৃষ্টি করে, ঐ ভ্রূণাণু বা zygoteটিই ভ্রূণের বীজ। প্রাকৃতিক নিয়মে পরিপুষ্ট হইয়া ঐ ভ্রূণাণুটি ঠিক্ মধ্যস্থলে দ্বি-খণ্ডিত হয়। তাহার ফলে একটি কোষাণুর স্থলে দুইটি ঠিক তাহার অনুরূপ, সর্ব্বাংশে সদৃশ কোষাণুর উদ্ভব হয়। ইহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Duplication (দ্বী-করণ)। ঐ দুইটি কোষাণুর প্রত্যেকটি আবার দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি দুইটি সদৃশ কোষাণু উৎপাদন করে। এইরূপে এক হইতে বহুর জন্ম হয়।*

দ্বী-করণ (duplication) প্রণালীতে বীজ-ভ্রূণাণু হইতে যে বহুসংখ্যক কোষাণুর উদ্ভব হয়, ঐ কোষাণু সকল অচিরে specialised হইয়া অর্থাৎ, বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়া তিনটি স্তবকে সজ্জিত হয়। এক স্তবক (যাহার বৈজ্ঞানিক নাম Ecto-derm) হইতে ভ্রূণস্থ শিশুর স্নায়ু ও চর্ম্ম গঠিত হয়। দ্বিতীয় স্তবক হইতে (এই স্তবকের বৈজ্ঞানিক নাম Meso-derm) পেশী ও অস্থি গঠিত হয়। এবং তৃতীয় স্তবক (যাহার বৈজ্ঞানিক নাম Ento-derm) হইতে ভ্রূণস্থ শিশুর যকৃৎ, ফুস্ ফুস্ ইত্যাদি গঠিত হয়। সেই জন্য এই তিন

* The embryo, when it starts its life is but one cell (the Zygote) made up of the materials contributed by the father cell (Spermatozoon) and the mother cell (Ovum) * * As the embryo develops from this zygote, it is by a process of duplication. Quickly the new cells are specialised into three main layers known as the Entoderm, the Mesoderm and the Ectoderm. From these groups of cells, known as the sometic or body-cells, are produced all the parts of the new creature.

স্তবক-ভুক্ত কোষাণু সমূহের সমষ্টি নাম Somatic বা Body cells অর্থাৎ শরীরারম্ভক কোষাণু।

এ সকল কথা বিসম্যানের পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকেরা জানিতেন। বিসম্যান যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন এবং যদ্দ্বারা জৈববিজ্ঞানে যুগান্তর সঞ্চারিত হয়, তাহা এই। বিসম্যান প্রতিপন্ন করেন যে, বীজ ভ্রূণাণু (Zygote) যে কেবল শরীরারম্ভক কোষাণুর জন্ম দেয় তা নহে, উহার কিয়দংশ, এক বিশেষ জাতীয় কোষাণু, (যাহার বৈজ্ঞানিক নাম Germ-cell অর্থাৎ, সন্তানোৎপাদক কোষাণু)—সেই কোষাণুর রচনায় নিয়োজিত হয়। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে ঐ সকল সন্তানোৎপাদক কোষাণু সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পুংশিশুর মুষ্কে (testicles) ও স্ত্রী-শিশুর জরায়ুতে (ovary) ঐ সকল বীজাণু প্রচ্ছন্ন ভাবে সুরক্ষিত থাকে। যখন ঐ পুং শিশু ও স্ত্রী শিশু কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবন সীমায় উপনীত হইয়া সন্তান জননের যোগ্য হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুরুষের শরীর হইতে ঐ সকল germ-cell বা সন্তানোৎপাদক কোষাণুর মধ্যে একটি মিলন-যোগ্য পুংবীজাণু (male gamete), স্ত্রীর শরীরস্থ সন্তানোৎপাদক কোষাণুর মধ্যে একটি মিলনযোগ্য স্ত্রী-বীজাণুর (female gamete) সহিত সম্মিলিত হইয়া একটি নূতন ভ্রূণের সৃষ্টি করে। এইরূপে বংশ পরম্পরাক্রমে সন্ততির জন্ম দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা হয়। পিতা হইতে পুত্র, পুত্র হইতে পৌত্র, পৌত্র হইতে প্রপৌত্র, প্রপৌত্র হইতে বৃদ্ধ প্রপৌত্র ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে সন্ততি সৃষ্টির মূল বীজ ঐ Germ-cell এর অঙ্গীভূত Germplasm; উহাই বংশানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে সঞ্চারিত হয়। অতএব Germ-plasmই প্রকৃত পক্ষে সন্তান-বীজ।*

* Now it was Weismann's great discovery that the original zygote, from the commencement of its life, put aside a part of its material for a special type of cell known as the germ-cell; and that when the new

দৈনন্দিন জীবন ব্যাপারের সহিত এই Germ-cell কোনই সম্বন্ধ রাখে না। তাহারা যৌবনাবধি যৌন শরীর-কোষে (sexual glands) সুরক্ষিত অবস্থায় নিশ্চিন্ত ভাবে বাস করে এবং পরে সন্তান-জননের সময় হইলে, একটী পুং বা স্ত্রী বীজাণু (gamete) মোক্ষণ করে। এই উভয় বীজাণুর সম্মিলনে ভ্রূণবীজ Zygote বা ভ্রূণাণুর উৎপত্তি হয়। এই ভ্রূণাণুর প্রাচীন নাম কলল। †

individual comes to maturity and propagates, it is only one of these germ-cells that is used * * * We will suppose that the conjugation of a male gamete and a female gamete has taken place and that we have the new entity, the Zygote with 16 chromosomes. This zygote gives off two types of cells, the somatic or body cells and the germ-cells. The germ-cells are carefully put aside while the body-cells are at once differentiated into the Ectoderm cells which give rise to the skin, the hair, the nervous system, the membranes of the mouth and the nose etc., into the Mesoderm cells which give rise to the muscles, the bones, the connective tissues of the body, etc., and into the Entoderm cells which give rise to the linings of the trachea and lungs, the cells of the liver, pancreas, thyroid, etc. These body cells then have the task of building up the organism and old cells are broken up and new ones made, in the wear and tear of living. What in the mean time are the germ-cells doing? Practically nothing. The germ cells are carefully put away in certain protected sexual glands and remain in abeyance till the time of puberty. Then they multiply but still keep together in their own place and do not mingle with the organism.—Theosophy and Modern Thought. P. 18.

† The germ-cells of both parents (when they have attained maturity) get ready for propagation and give off some marrying cells or gametes. Then a male gamete conjugates with a female gamete and the result is a zygote. This new zygote now begins its independent existence. It duplicates itself and differentiates its cells into the two main groups, the body-cells and the germ-cells.

তাহাই যদি হইল, তবে আর ডার্বিনের Pangenesis-বাদ কিরূপে তিষ্টিতে পারে? বাস্তবিক এই মত এখন অসার ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে * এবং বিসম্যানের সিদ্ধান্তই পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ডার্ব্বিনের Pangenesis যদি শিথিল হইয়া গেল, তাঁহার প্রচারিত পিতৃলব্ধ গুণ বা বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার-সূত্রে সন্ততিতে সংক্রমণের 'থিওরি' যদি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইল, তবে হার্বার্ট স্পেন্সার মনোরাজ্যে ঐ থিওরির সম্প্রসারণ করিয়া মানসিক বিবর্ত্তন সিদ্ধ করিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই বা কোন্ ভিত্তির উপর ভর করিবে? সেই জন্য জৈববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মানসিক গুণের উত্তরাধিকার-নিয়মে সন্ততিতে সংক্রামণ একেবারে প্রমাণ-অসিদ্ধ। * *

বাস্তবিক যাঁহারা ডার্বিনের নব্য শিষ্য, যাঁহাদিগকে Neo-Darwinians বলে, তাঁহারা পিতামাতার স্বোপার্জ্জিত গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে সন্ততিতে সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। †

* There is no evidence that the various parts of the body send any contribution to form, in their aggregation, the germ-cells. We have clear evidence that the germ-cells have an entirely different origin, that in short they are not made from the body which shelters them. Darwin's theory of pangenesis must be definitely abandoned.—Harmsworth's Popular Science.

**We are compelled to reject his explanation of the origin of instincts in ancestral habits, which have gradually become accumulated and ingrained in the very tissue of the offspring. The evidence against this view, and against any such inheritance in the realm of mind, is now overwhelming. It is necessary, also, to note that we have no other explanation which satisfies the mind to offer in place of Spencer's.

Harmsworth's Popular Science, P 1160.

† Darwin accepted this [illegible] (transmission of acquired character) but found it inadequate. [illegible]'s modern followers, the neo-Darwinians, reject what he was content to accept * * On our modern view of

কারণ, পিতা মাতার যে সকল স্বোপার্জ্জিত গুণ, তাহাদিগের সংস্কার যদি কোথাও সংরক্ষিত থাকে, তবে সে Germ-cellএ নহে, Body-cellএ। আমরা দেখিয়াছি যে, এই Body-cell বা শরীরারম্ভক কোষাণুর সন্তানোৎপাদনে কোন কার্য্যকারিতা নাই। সে কার্য্যের ভার Germ-cell বা সন্তানোৎপাদক কোষাণুর উপর। তাহাই যদি হয় এবং যখন ডার্বিনের Pangenesis অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন পিতৃলব্ধ গুণ সন্তানে সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ বা সম্ভাবনা কোথায়? অতএব দেখা যাইতেছে যে, ডার্বিন ও স্পেন্সারের অবলম্বিত ক্রমবিকাশের যে মূলসূত্র তাহা কেবল শিথিল নহে, একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।† অতএব এমতে বিবর্ত্তন নিরাধার হইতেছে, প্রাকৃতিক নিয়মে কিরূপে ক্রমবিকাশ সাধিত হয়—এ প্রশ্ন নিরুত্তর রহিতেছে। সেই জন্য বর্ত্তমান যুগের ইংলণ্ডের

the germ-plasm and germ-cells it is inconceivable that such effects could be transmitted. * * * What modern biology then denies is the transmission of functional modifications—such as the biceps of the blacksmith the linguistic faculty of the scholar and so forth.

† We go to Darwin for his incomparable collection of facts, we would fain emulate his scholarship, his width, and his powers of exposition, but to us he speaks with no authority. We read his scheme of evolution. delighting in its simplicity and its courage.—Professor Bateson in his address to the British Association in 1914.

If individually acquired gains could be entailed, the same would also apply to individually acquired losses. Why are not modifications transmitted? Actually because of the absence of any arrangement, so far as we know, for seeing that modifications can affect the germ-cells in a manner so specific that the offspring also exhibit the same modification, or some approximation towards it. From the point of view of real welfare, modifications are not entailed because an advantageous constitution is thus saved from being damaged by dints and buffetings incident on the chequered life of the individual body.

—Professor I. I. Thomson's Control of Life.

প্রধান জীবতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক বেটসন (Bateson) ডার্বিন ও হার্বার্ট স্পেন্সার প্রবর্ত্তিত পিতৃলব্ধগুণের উত্তরাধিকার নিয়মের প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও ঐরূপ উত্তরাধিকার অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক, তথাপি ক্রমবিকাশ সিদ্ধ করিবার অন্য কোন প্রণালী আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। অধ্যাপক বেটসনের এ উক্তি যথার্থ নহে ; কারণ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হইলেও, প্রাচ্য প্রজ্ঞান এক্ষেত্রে মূক নহে। প্রাচ্য প্রজ্ঞান বলে যে, বিবর্ত্তন দেহগত নহে, জীবগত। এজন্মে জীব ক্রমবিকাশের যে সোপানে উপনীত হইল, সেই উন্নতি সংস্কার-রূপে তাহার মধ্যে রক্ষিত থাকিবে, এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের অধি-কারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এইরূপে জন্মের পর জন্ম, জীব উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতেছে।

জীব প্রথমে স্থাবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, ক্রমবিকাশের ফলে, স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হইয়া প্রথমে সে সরীসৃপের দেহ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের ফলে সে সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু দেহে প্রবেশ করে। পশু-রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জীব মনুষ্য-দেহ ধারণের উপযোগী হয়। মানবের মধ্যেও প্রথমতঃ অসভ্য, তাহার পর অর্দ্ধ-সভ্য, চরমে সুসভ্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও তাহার ক্রমবিকাশের শেষ হয় না। মানুষ ক্রমে অতিমানুষ হয়। মানবতার সীমা অতিক্রম করিয়া জীব অবশেষে জীবন্মুক্ত হয়। ইহাই ক্রমবিকাশের শেষ সোপান এবং ঐ সোপানে আরোহণ করিবার প্রকৃতিসিদ্ধ সিঁড়ি—এই জন্মান্তরবাদ।

———*———

পঞ্চম অধ্যায়

—:*:—

প্রসর্পণ না উল্লম্ফন ?

উদ্ভিদ্-জগতে ও প্রাণি-জগতে জাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ (যাহাকে Species বলে) প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন এই—এক জাতির মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি বা শ্রেণী উৎপন্ন হয় কিরূপে? জাতির মধ্যে যে নূতন নূতন উপজাতি উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ঐ সকল উপজাতি কিরূপে সিদ্ধ হয়? বাপ্‌কা বেটা বাপের মতন হইবে ইহা বিচিত্র নহে, বরং সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু বেটা বাপ হইতে বিভিন্ন হইবে, স-রূপ না হইয়া বি-রূপ হইবে, বিরূপ হইয়া নূতন উপজাতি সৃষ্টি করিবে, ইহা বিচিত্র নয় কি? অথচ, এই বিচিত্র ব্যাপার প্রাকৃতিক রাজ্যে নিয়ত সংঘটিত হইতেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহার নাম Origin of Species বা উপজাতির সৃষ্টি। এ প্রশ্নের মীমাংসা কি?

আমরা দেখিয়াছি যে, ডার্বিন-স্পেন্‌সার-প্রমুখ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-দিগের মতে পিতামাতার অর্জ্জিত গুণ বংশানুক্রমে সন্ততির পর সন্ততিতে ধীরে ধীরে উপচিত হইয়া, অর্থাৎ, বিলম্বিতক্রমে বর্দ্ধমান হইয়া, সুদীর্ঘ কালে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিলে, এক জাতি হইতে অভিনব উপজাতি বা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সেই জন্য ডার্বিন বলিতেন, নিসর্গ কখন উল্লম্ফন করে না (never leaps); নিসর্গ মন্থরক্রমে সুধীরে অগ্রসর হয়—এক

কথায় প্রসর্পণ করে। একই মাতাপিতার সন্তানের মধ্যে স্বভাবতঃ যে সূক্ষ্ম ভেদ বা বিশেষ (Minute Variations) সঞ্জাত হয়, নিসর্গ তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষকে নির্ব্বাচন করিয়া লয় এবং সন্ততির পর সন্ততিতে ধীরে ধীরে তাহার উপচয় করিয়া যুগান্তে এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করে।*

জনকের অর্জ্জিত গুণ সন্ততিতে সংক্রামিত হয় কিনা—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, বিজ্ঞানের কল্পিত এই বিলম্বিত ক্রম প্রমাণসিদ্ধ কি না?

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের একটি বরণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা পরের মুখে ঝাল খান না, অপরের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ করেন না—অন্ধভাবে অনুসরণ করেন না। নিজেরা পরীক্ষা-সমীক্ষা করিয়া তবে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অন্যান্য প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ডার্বিনের এই বিলম্বিত ক্রম-বাদ (Theory of minute Variation)

* Darwin's theory was that organic evolution was by the natural selection of *minute* variations which were incessantly occurring in all directions, from generation to generation of all living creatures.

Popular Science, Vol. IV. p. 2237.

According to Darwin, species must arise very *slowly*; one or more variations first arise spontaneously, then nature 'selects' one of them as the fittest to survive; this variation is then added to, and the addition is passed on to the next generation. It is therefore only by a *slow* process of addition that the characters which mark the new species can arise. Nature, said Darwin, does not make leaps, but creeps along. —Theosophy & Modern Thought, p. 22.

The aphorism 'Natura non facit saltum' turns up so often in his pages.

শিরোধার্য্য না করিয়া এ সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে প্রমাণিত হইল যে, উপজাতি-সৃষ্টি ব্যাপারে নিসর্গ প্রসর্পণ করে না, উল্লম্ফন করে। অর্থাৎ, Nature leaps and does not **creep.**

কয়েকটি উদাহরণ দিলে কথাটা বিশদ হইবে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে দেখা গিয়াছিল যে, এক পাল ভেড়ার দলে হঠাৎ একটা অভিনব উপজাতি উদ্ভূত হইল।* ইহাকে এখন এন্‌কন্ মেষ (Ancon sheep) বলে। এ মেষ সাধারণ মেষ হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্বতন্ত্র শ্রেণীর জন্তু—অথচ, উহার বাপ মা ছিল ঐ সাধারণ ভেড়া। অকস্মাৎ এই উপজাতির কোথা হইতে উদয় হইল? আর এই উপজাতি প্রকৃতির খামখেয়াল (Sport) রূপে হঠাৎ উদয় হইয়া ত' বিলয় হইল না—ইহা স্থায়ী আকার ধারণ করিয়া বংশানুক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আর একটা অভিনব উপজাতির হঠাৎ উদয়ের উদাহরণ 'সার্‌লি পপি' (Shirley Poppy)। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সার্লির ধর্ম্মাচার্য্য রেভারেণ্ড উইল্‌ক্স লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার বাগানের পতিত এক কোণায় সাধারণ পোস্ত-ফুলের ঝাড়ে এক অভিনব ধরণের ফুল ফুটিয়া আছে। সেই ফুলের বীজ সংগ্রহ করিয়া তিনি অন্যত্র বপন করিলেন। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যে সব বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, সেই সকল বৃক্ষ পুষ্পিত হইলে দেখা গেল, তাহার মধ্যে চার পাঁচটি গাছে সেই নূতন ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই ফুলের এখন নাম হইয়াছে 'সার্লি পপি' এবং বাগানে ইহার রীতিমত চাষ

* In 1791 there arose *suddenly* among a flock of ordinary sheep, a new variety. that is now known as the Ancon sheep.

চলিতেছে।* এখানেও আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সার্লি পপি সাধারণ পোস্ত গাছ হইতে সঞ্জাত বটে, কিন্তু উহা একটা নূতন উপজাতি এবং উহা প্রাণিজগতে স্থায়ভাবে বংশবৃদ্ধি করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপজাতিও ধীরে ধীরে সন্ততির পর সন্ততিতে উপচিত হইয়া বিলম্বিত ক্রমে উৎপন্ন হয় নাই—হঠাৎ এক লম্ফে উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রকৃতির উল্লম্ফনের আমরা আর একটা উদাহরণ দিব। সে উদাহরণ 'সান্ধ্য প্রিম্‌রোজ্' (Evening Primrose)। এই গাছের কয়েকটা চারা হল্যাণ্ড হইতে নীত হইয়া বিদেশের মাটিতে প্রোথিত করা হয়। তাহাদের সন্ততির মধ্যে দেখা গেল, অকস্মাৎ দুইটি নূতন শ্রেণীর উদয় হইয়াছে; অর্থাৎ, যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকিলে স্বতন্ত্র উপজাতি (Species) ধরা হয়, ঐ দুই নূতন শ্রেণীর ফুলে তাহার সমস্ত লক্ষণই আছে। অধিকন্তু, ইহারা নিসর্গের একটা অস্থায়ী খেয়াল মাত্র নহে; ইহারা দৃঢ়বদ্ধ স্থায়ী উপজাতি—আমাদের চক্ষের সম্মুখে অতর্কিতভাবে অকস্মাৎ উদিত হইল।†

* Mr. R. H. Lock, a prominent botanical student of heredity writes as follows :—

"Of the origin of a new type of plant in this definite and *sudden* fashion, the Shirley poppies furnish an excellent example. These originated in a mutation of the common wild poppy. In 1880 Rev. W. Wilks, Vicar of Shirley, near Craydon, noticed among a patch of this plant growing in a waste corner of his garden a solitary flower, the petals of which showed a very narrow border of white. The seeds which this flower produced were sown, and next year, out of about two hundred plants, there were four or five upon which all the flowers showed the same modification. From these, by further horticultural processes, the strain of Shirley poppies originated."—Harmsworth's Popular Science, Vol. IV. p. 2239

† All these new forms are true species and constant; they are not sports which appear once, but permanent species, which are now being cultivated.—Theosophy and Modern Thought, p. 24.

বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডি ভ্রাইস্ (De Vries) এই 'সান্ধ্য প্রিমরোজ্' লইয়া অনেক পরীক্ষা-সমীক্ষা করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হইল যে, নৈসর্গিক নিয়মে—ধীর পদসঞ্চারে, বিলম্বিত-ক্রমে নহে—এক লম্ফে, এক পুরুষে দুইটি অভিনব উপজাতির উদয় হইয়াছে।* তখন ডি ভ্রাইস্ ডার্বিনের প্রচারিত প্রসর্পণ-বাদের বিরুদ্ধে তাঁহার অধুনা-প্রখ্যাত উল্লম্ফনবাদ (Mutation Theory) প্রচার করিলেন। সে মতের সার এই যে, পুরাতন জাতির মধ্যে নূতন উপজাতি-সৃষ্টি নিসর্গের যদৃচ্ছা-জাত স্বয়ংসিদ্ধ আকস্মিক ব্যাপার।†

---

* Certain specimens of this plant (Evening Primrose) escaped from a garden in Holland, and De Vries found among the 'escapes' or their offspring, two *distinct new forms,* each unlike all the rest. Each occured in a separate patch, as if a single plant had borne all the new individuals in each case.

De Vries made full use of his remarkable opportunity, and the first fact which he discovered was that the seeds of these plants. when sown in his garden, produced offspring like the parents. In a word, two new species had actually been observed and proved to arise from an old one in a state of nature.—Harmsworth's Popular Science, Vol. IV, p. 2240

† According to De Vries' Theory of Mutation, new species arise by single steps as definite novelties, just in the same way as we find that domestic varieties are produced. More than this, De Vries believes that he has discovered a set of new species in the very act of originating from an old one in this way, a discovery which affords the basis and groundwork of the views which he puts forward, * *

Finally, we must note the essential feature of this theory, which is the *accidental* character of the variations that make the evolution possible. The variations are regarded as *absolutely fortuitous*, to use the accepted term, some are in one direction, some in another, the only law which governs their productions and occurrence is the *law of chance.*—Harmsworth's Popular Science, p. 1284.

তখন বৈজ্ঞানিক মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অনেকে স্বাধীন ভাবে অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলেন। কাহারও কাহারও স্মৃতিপটে উদয় হইল—"ওঃ, অধ্যাপক হাক্সলিও এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলেন বটে; তবে তাঁহার আর একটু দূর যাওয়া উচিত ছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, নিসর্গ মধ্যে মধ্যে উল্লম্ফন করে বটে।"*

কিছুদিন ডার্বিনের দলে ও ডি ভ্রাইসের দলে বেশ তর্ক-যুদ্ধ চলিল। ক্রমশঃ ডার্বিনের দল দুর্ব্বল হইতে লাগিল। কারণ, এই মত-বিবাদে 'থিওরি' (Theory) মোহিনী মূর্ত্তিতে ডার্বিনের পক্ষ অবলম্বন করিলেও, 'ফ্যাক্ট' (Facts) সজ্জিত হইয়া ডি ভ্রাইসের পক্ষে দণ্ডায়মান হইল। অতএব, সত্যরূপী জনার্দ্দন ডি ভ্রাইসের উল্লম্ফনবাদকেই জয়যুক্ত করিলেন। এখন আর বিবর্ত্তনবাদীদিগের মুখে বিলম্বিত ক্রমের কথা বড় একটা শ্রুত হয় না; তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, প্রাণিশরীরের পরিবর্ত্তন (যদ্দারা অভিনব উপজাতির উদয় হয়) যদৃচ্ছাজাত, খামখেয়ালি, স্বয়ংসিদ্ধ, অতর্কিত, আকস্মিক।† অতএব প্রসর্পণ না উল্লম্ফন? এই প্রশ্নের উত্তরে

* We believe that *Nature does make jumps now and then*, and a recognition of the fact is of no small importance in disposing of many minor objections to the doctrine of transmutation.—Huxley.

The argument of De Vries and his School today is that Huxley here was right, and would have been still more right had his criticism been far stronger. Nature does sometimes make leaps, or 'saltations', as they are sometimes called, and these leaps or jumps (cf. the word salient, from the same Latin root, to describe what jumps or dances above its fellows) are none other than the 'mutations' of De Vries, in which, as against the minute variations accredited by Darwin, he and his school believe the origin of species to occur.—Harmsworth's Popular Science, Vol. IV. p. 2238.

† Absolutely *random* variations, conveniently called 'spontaneous' and without any tendency, bias or predilection in any direction whatever have furnised the materials which natural selection has fixed in the form, say of the eye, the internal ear etc. —Harmsworth p. 1161.

বলিতে হয়---প্রসর্পণ নয়, উল্লম্ফন। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের নিদান কি, কি প্রকারে ইহা সিদ্ধ হয়, এ একটা সমস্যা বটে। তাহার সদুত্তর দিতে হইলে বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে এখন Mendelism বলেন সেই মত-বাদের আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ডার্বিনের যে তৃতীয় সূত্র অর্থাৎ, বিবর্ত্তন একটা মন্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার—এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

——:*:——

আধিভৌতিক না আধ্যাত্মিক?

আমরা দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদের মূলসূত্র তিনটি। প্রথম, উত্তরাধিকার-নিয়মে পিতামাতার অর্জ্জিত গুণেরসন্ততিতে সংক্রামণ; দ্বিতীয়, সন্ততির পর সন্ততিতে ঐ অর্জ্জিত গুণের মন্থরগতিতে, বিলম্বিত ক্রমে, বংশ-পরম্পরায় প্রসর্পণ; তৃতীয়,পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the Fittest)। এই তিনটি নিয়মই আংশিক ভাবে সত্য—তিনটির দ্বারাই জীবের ক্রমবিকাশের সহায়তা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রণালীতে এই সকল নিয়মের প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন,তাহা কি ঠিক? উত্তরাধিকারনিয়মে অর্জ্জিত গুণের সন্ততিতে সংক্রামণ এবং বিলম্বিতক্রমে ঐ গুণের বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারণ—এই দুই মত প্রমাণসিদ্ধ কিনা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন-প্রসঙ্গের কিছু আলোচনা করিব। আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব, এই নিয়ম কি প্রণালীতে, কতদূর, কি ভাবে কার্য্য করে এবং তাহার ফলে জানিতে পারিব যে, বিবর্ত্তন দেহগত নহে, জীবগত—আধিভৌতিক নহে, আধ্যাত্মিক। বস্তুতঃ, এখানেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ও প্রাচ্য প্রজ্ঞানের মর্ম্মান্তিক প্রভেদ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাহিরের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি—

অন্তরের প্রতি দৃষ্টি কম। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দেহের কথাই বুঝেন ও বলেন, দেহীর কথায় ততটা মন দেন না। সেই জন্যই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজিও চরম সত্যের উচ্চ চূড়ায় উঠিতে পারেন নাই। এই বিবর্ত্তনবাদ সে অক্ষমতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কথাটা বিশদ ভাবে বুঝিবার জন্য আমাদের সেই জিরেফার উৎপত্তির বিবরণ আর একবার স্মরণ করিতে হইবে। চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে হরিণ ও জিরেফার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অতএব এই দুইশ্রেণীর জন্তুকে এক মূলজাতি হইতে উৎপন্ন উপজাতি (Species) মনে করা অসঙ্গত নহে। এমন এক সময় ছিল, যখন হরিণ বা জিরেফা কেহই ছিল না—ছিল তাহাদের দুইজনেরই আদিপুরুষ অন্য এক জন্তু, যে হরিণও নহে, জিরেফাও নহে। ঐ জন্তুর আমরা একটা কাল্পনিক নাম দিব—'হিরণ্য'। হিরণ্যের সন্তান অবশ্য হিরণ্যই হইবে। মনে করুন, একটা প্রকাণ্ড অরণ্যে কোন প্রাচীন যুগে এই হিরণ্যজাতীয় জন্তু বংশবৃদ্ধি করিয়া বিস্তারলাভ করিয়াছে ও বাস করিতেছে।

প্রকাণ্ড বন, বনের একাংশে খাদ্যকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইল। হিরণ্যেরা নিরামিষাশী,—গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময় চারা গাছ সব মরিয়া গেল, কেবল উচ্চ ডালে হিরণ্যের খাদ্য যে বৃক্ষপত্র, তাহাই অবশিষ্ট রহিল। অবস্থার এই পরিবর্ত্তনে সেই মহাবনের যে অংশে এইরূপ খাদ্যকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দেশবাসী হিরণ্যদিগের কি অবস্থা ঘটিল? অনেক হিরণ্য মারা পড়িল, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কতকগুলি হিরণ্যের গলা কিছু লম্বা হইয়া পড়িল। এইরূপে যাহাদের গলা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইল, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া গেল; আর যাহাদের গলা পূর্ব্ববৎ হ্রস্বই রহিল, তাহারা জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইল। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘগ্রীব হিরণ্যেরাই বংশবৃদ্ধি

করিল এবং উত্তরাধিকারনিয়মে নিজেদের দীর্ঘ গলা সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত করিল। ইতিমধ্যে সেই বনে খাদ্যকৃচ্ছ্র পূর্ব্ববৎই চলিতে লাগিল। আগে বরং নীচু ডালে গাছের পাতা পাওয়া যাইত, এখন তাহা একেবারে বিরল হইল। ইহার ফল এই হইল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার (Environmentএর) চাপে সেই অপেক্ষাকৃত লম্বাগলা হিরণ্যদিগের গ্রীবা আর একটু লম্বা হইল এবং তাহারাই অপেক্ষাকৃত হ্রস্বগ্রীব জ্ঞাতিগণকে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত করিয়া টিকিয়া গেল ও বংশবিস্তার করিল। এইরূপে দীর্ঘগ্রীবত্ব-গুণ বংশপরম্পরা-ক্রমে Natural Selection বা নৈসর্গিক নির্ব্বাচনের ফলে কতকগুলি হিরণ্যের মধ্যে স্থায়ী ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া দীর্ঘগ্রীবার ক্রম-বিকাশ সাধন করিয়া লম্বাগলা জিরেফারূপ নূতন উপজাতির সৃষ্টি করিল। এইরূপে হিরণ্য জাতীয় জন্তুর মধ্যে জারেফা নামক এক নূতন শ্রেণীর (Species) উৎপত্তি হইল।

হিরণ্যের বাসভূমি যে অরণ্যের কথা আমরা বলিতেছি সেই অরণ্যের আর এক অংশে ব্যাঘ্রভয় উপস্থিত হইল। নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বত হইতে কয়েকটি ব্যাঘ্রাচার্য্য আসিয়া, বৃহল্লাঙ্গুল বিস্তার করিয়া হিরণ্যদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে ঐ বনে কোন দিন বাঘের ভয় ছিল না। হিরণ্যেরা বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে গাছের পাতা খাইয়া বিচরণ করিত। এখন তাহাদের বড় সঙ্কট-দশা উপস্থিত হইল। পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কোন কোন হিরণ্যের ক্ষিপ্রগতি কিছু পরিমাণে বাড়িয়া গেল। "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই প্রাচীন নীতির অনুসরণ করিয়া যে সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্রগতি হিরণ্যেরা বাঘের মুখ হইতে পলাইতে পারিল, তাহারাই অপেক্ষাকৃত মন্দগতি জাতিগণকে জীবন-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া টিকিয়া গেল, আর সেই সকল মন্দগতি হিরণ্যেরা বাঘের কবলে পতিত হইয়া অকালে জীবলীলা সাঙ্গ করিল। অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্রগতি হিরণ্যেরা

উত্তরাধিকারনিয়মে নিজেদের ক্ষিপ্রগতিত্ব-গুণ সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত করিল। সে বনে কিন্তু বাঘের ভয় কমিল না, বরং মাংসলোলুপ নূতন নূতন ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ বনে বসতি করিল। ইহার ফল এই হইল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সেই ক্ষিপ্রগতি হিরণ্যদিগের গতি আর একটু ক্ষিপ্রতর হইল এবং তাহারাই অপেক্ষাকৃত মন্দগতি জ্ঞাতিগণকে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত করিয়া টিকিয়া গেল ও বংশবৃদ্ধি করিল। এইরূপে ক্ষিপ্রগতিত্ব-গুণ বংশ-পরম্পরা ক্রমে, নৈসর্গিক নির্ব্বাচনের ফলে, কতকগুলি হিরণ্যের মধ্যে স্থায়ী ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া ক্ষিপ্রগতির ক্রম-বিকাশ সাধন করিয়া দ্রুতগামী হরিণরূপ নূতন উপজাতির সৃষ্টি করিল। এইরূপে হিরণ্য জাতীয় জন্তুর মধ্যে হরিণ নামক এক নূতন শ্রেণীর উৎপত্তি হইল।

হরিণ ও জীরেফা যে ঠিক এই প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু ডার্ব্বিন, স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা Origin of Species বা উপজাতির সৃষ্টি যে ভাবে সিদ্ধ করিতে চান, আমাদের উপরের বিবরণ তাহার অনুরূপ। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, প্রাণিজগতে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া নূতন উপজাতির উৎপত্তি হয়, তাঁহাদের মতে তাহার মূলকারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন।* অর্থাৎ, ইহা একটা যন্ত্রসিদ্ধ (Mechanical) ব্যাপার। এই মত যুক্তিসিদ্ধ কি না এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে সকল নূতন তথ্য অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ মত তাহার অনুকূল কি না?

অবশ্য এ কথা বোধ হয় এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাইবেলে প্রাণিসৃষ্টির যে বিবরণ আছে যে, পৃথিবী জলপ্লাবিত হইলে, 'নোয়া' নৌকা-

* Species undergo changes and modifications through change of surrounding.

রোহণ করিলেন এবং সমস্ত জীবজন্তুর এক এক জোড়া তাঁহার সঙ্গী হইল, এ বিবরণ কল্পনাসিক্ত, সত্যমূলক নহে।† আমরা এ কথাও স্বীকার করিতে পারি যে, প্রাণিশরীর ক্রমোন্নতি সহকারে তুচ্ছ কোষাণু হইতে ক্রমশঃ উন্নতির সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়া, বর্ত্তমানে ক্রমবিকাশের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে এবং ক্রমবিকাশের স্রোতঃ তাহাকে আরও উচ্চে উন্নীত করিবে। আমরা একথাও স্বীকার করি যে, প্রাণি-জগতে শ্রেণীবিভাগ একটা চিরন্তন শাশ্বত ব্যাপার নহে; কিন্তু ক্রমাভি-ব্যক্তির ফলে একজাতি হইতে কালসহকারে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ডার্ব্বিন তাঁহার Origin of Species প্রচার করিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত ভ্রমপ্রমাদ নিরসন করিয়া, এই সকল সত্য মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন।‡ কিন্তু আমাদের বিচারের বিষয় এই যে, প্রাণিজগতে যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল বা হইতেছে, ইহা কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল, অথবা, যে প্রাণীর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সেই প্রাণীর মধ্যেই ঐ পরিবর্ত্তনের বীজ সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল? প্রাণীর শরীরের পরিবর্ত্তনের ফলেই আমাদের

† The account of Noah and his ark with pairs of every thing that flew, crept or ran was fanciful and absurd, so far as we care to distinguish facts from fiction.—Hubbard's Wallace.

‡ The 'Origin of Species' sheds light in ten thousand ways on the fact that all life has evolved from very lowly forms and is still ascending—that species were not created by fiat, but that every species was the sure and necessary result of certain conditions.

Until "The Origin of Species" was published and for some years afterwards, the immutability of species was taught in all colleges, and everywhere accepted by the so-called learned men. —Hubbard's Huxley.

'হিরণ্য' হইতে একদিকে হরিণ, অন্যদিকে জিরেফার উৎপত্তি হইয়াছে। এই যে প্রাণিশরীরের পরিবর্ত্তন, ইহা কি স্বয়ংসিদ্ধ, না পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সঞ্জাত? যদি এ পরিবর্ত্তন স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে, ডার্ব্বিন ও স্পেন্সারের অনুমোদিত উপজাতিসৃষ্টির 'থিওরি' (theory) আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।

আমরা দেখিয়াছি, অধুনা যাঁহারা জৈববিজ্ঞানের প্রধান আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহাদের মত প্রামাণিক বলিয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজে সমাদৃত, তাঁহারা স্বীকার করেন যে, প্রাণিশরীরে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত নহে, তাহা স্বয়ংজাত, আকস্মিক, যদৃচ্ছালব্ধ। অর্থাৎ, প্রকৃতি আপনার খেয়াল মত যদৃচ্ছাক্রমে (by the law of Chance) প্রাণিশরীরে যুগপৎ নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন। এই সকল পরিবর্ত্তন একেবারেই আকস্মিক (fortuitous); ঐ পরিবর্ত্তন নৈমিত্তিক নহে, উহার সংঘটন বাহিরের কোন কারণের অপেক্ষা করে না।*

* Finally, we must note the essential feature of this theory which is the accidental charcter of the variations that make the evolution possible. The variations are regarded as *absolutely fortuitous*, to use the accepted term. Some are in one direction, some in another. the only law which governs their productions and occurrence is the law of chance.

* * * *

If species arise in certain variations, then the problem of the origin of species is the problem of the origin of these variations, those new forms of life, which natural selection then selects. The theory of natural selection therefore explains the fixation of species, the non-persistence of the non-adapted or the misfits, and the survival of the well adapted or fit. But it tells us nothing as to the "origin of the fittest."

Harmsworth's Popular Science, p. 1284.

এইরূপে যখন এক প্রাণিশরীর হইতে কয়েকবিধ পরিবর্ত্তিত শরীর যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হয়, তখন ঐ সকল পরিবর্ত্তিত শরীরের মধ্যে যে গুলি তদানীন্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল, সেই শরীরগুলি টিঁকিয়া যায়, এবং সেই শরীরধারী প্রাণী অনুরূপ সন্তান উৎপাদন করিয়া, এই পরিবর্ত্তনকে স্থায়িত্ব দান করে। আর যে পরিবর্ত্তিত শরীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল নহে, সে শরীর টিঁকিতে পারে না, জীবনসংগ্রামে ধ্বংস হইয়া যায়। এইরূপে প্রাণিজগতে নূতন উপজাতির সৃষ্টি হয়। এই নূতন উপজাতির উৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা নহে, প্রকৃতির যদৃচ্ছা বা খামখেয়াল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সেই সকল উপজাতি স্থায়ী হয় মাত্র। একথা ঠিক যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হইলে কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তা' বলিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ক্রমাভিব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী নিমিত্ত বলা চলে কি ?* পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the Fittest) সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যোগ্যতমের আগমন (Arrival of the Fittest) সিদ্ধ হয় কি ? অথচ, যোগ্যতমের আগমন না হইলে উদ্বর্ত্তন হইবে কিরূপে ?

* That adaptation to environment is the necessary condition of evolution, we do not question for a moment. It is quite evident that a species would disappear, should it fail to bend to the conditions of existence that are imposed on it. But it is one thing to recognise that outer circumstances are forces evolution must reckon with, and another to claim that they are the directing forces of evolution. This latter theory is that of mechanism. It excludes absolutely the hypothesis of an original impetus, I mean an internal push that has carried life, by more and more complex forms, to higher and higher destinies.

Yet this impetus is evident, and a near glance at fossil species shows us that life need not have evolved at all, or might have evolved only in very restricted limits, if it had chosen the alternative, much more

অধ্যাপক হাক্‌সলি ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী না হইলে কেহই টিঁকিতে পারে না। এই অনুবর্ত্তনই উন্নতির সোপান। কিন্তু তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, প্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নাই, এ কথা কি ঠিক ? * বরং ইহাই বলা সঙ্গত যে, প্রকৃতির লীলা একটা যন্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার নহে, ইহার মধ্যে সঙ্কল্প (উপনিষদের ভাষায় যাহাকে ঈক্ষা বলে) রহিয়াছে।

এ প্রসঙ্গের একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উদ্ভিদ্-বিদ্যায় যাহাকে cross-fertilisation বা অসগোত্র (যৌন)-সম্মিলন বলে, পাঠকের বোধ হয় সেটা অবিদিত নহে। পশুপক্ষীদিগের মধ্যে যেমন স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, উচ্চ শ্রেণীর পাদপের মধ্যেও ঐ লিঙ্গভেদ খুব বিস্পষ্ট। ফুলই গাছের স্ত্রী-পুরুষ। † কোন ফুল পুংলিঙ্গ, কোন ফুল স্ত্রীলিঙ্গ। পুরুষ ফুলের Stamen-সঞ্জাত পরাগ (Pollen), স্ত্রী ফুলের Pistil-স্থিত বীজ-কোষের সহিত সংযুক্ত হইলে, শুক্র ও আর্ত্তবের সংযোগের ন্যায় একটি ভ্রূণ বা সন্তান-বীজ উৎপন্ন হয়। এই প্রণালীতে পাদপেরা বংশবৃদ্ধি করে। ‡ অনেক গাছেই দেখা যায়, স্ত্রী-ফুল ও পুরুষ-ফুল একই বৃক্ষে

convenient to itself, of becoming rigidly fixed in its primitive forms. —Bergson.

* Nature has no designs nor intentions. All that live exist only because they have adapted themselves to the hard lines that nature has laid down. We progress as we comply.—Huxley.

† Flowers are the husbands and wives of plants—Grant Allen.

‡ To effect fertilisation pollen grains from the anthers of the stamens must come into contact with the ripe stigmas of the pistils. This accomplished, the ripened pollen grains germinate by pushing a slender tube into the ovary, where they reach the eggs or ovules.

পাশাপাশি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহারা সগোত্র, তাহাদের মধ্যে ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ। সেই জন্য তাহাদিগের যৌন-সম্মিলন শুভ নহে, কারণ, সুসন্তান প্রসব করিতে হইলে, মাতাপিতার অসগোত্র হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য নিসর্গ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফুলদিগের অসগোত্র-বিবাহ (যাহাকে cro‹s-fertilisation বলে) ঘটনা করেন। এজন্য তাঁহাকে নিপুণ ঘটকালি করিতে হয়। ঐ ব্যাপারে প্রকৃতি-দূতী যেসকল অদ্ভুত ফন্দি ও ফন অবলম্বন করেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! পাছে একগাছেব স্ত্রী-ফুল ও পুরুষ-ফুল মিলিত হইয়া অনর্থ বাধায়, সেই জন্য স্ত্রী-ফুল যখন ফোটে তখন তিনি ঐ গাছে পুরুষ-ফুল ফুটিতে দেন না, কিম্বা যখন পুরুষ-ফুল ফোটে তখন স্ত্রীফুল ফুটিতে দেন না। কিন্তু এইটুকু করিলেই ত' যথেষ্ট হইল না। পাদপেরা স্থাবর (stationary)—তাহারা পশু পক্ষীর মত 'যাযাবর' (গতিশীল) নহে। সেই জন্য এক ফুলের পরাগ অন্যফুলের বীজ-কোষের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য প্রকৃতিকে কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়। সেই সকল কৌশল বিবিধ এবং বিচিত্র। কৌতূহলী পাঠক উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে পারেন। এই পরাগ-বাহন কার্য্যে ভ্রমর ও মক্ষিকাই প্রকৃতির প্রধান সাহায্যকারী। কিন্তু দক্ষিণা না পাইলে ঐ বাহকেরা ফুলের ত্রিসীমানায় অগ্রসর হইবার পাত্র নহে। সেই জন্য প্রকৃতি নানা বিচিত্র বর্ণের দল (Petal) সজ্জিত করিয়া উহাদিগকে আকর্ষণ করেন এবং মধুর লোভ দেখাইয়া উহাদিগকে পুষ্পের অন্দরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। সময় সময় ঐ মধু ফুলের অভ্যন্তরে এমন স্থানে প্রচ্ছন্ন রাখা হয় যে, সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইলে, ভ্রমরের বা মক্ষিকার পরাগ-বিচ্ছুরিত না হইয়া উপায় থাকে না। তাহাদের স্বভাবই এই, তাহারা ফুলে ফুলে মধুপান করে। যেমন এক ফুলের মধু পান শেষ করিয়া পুষ্পান্তরে উড়িয়া গিয়া বসে, অমনি সেই পুরুষ-ফুলের

পরাগ স্ত্রী-ফুলের বীজকোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া সন্তান বীজের জনক হয়।* এই সকল ব্যাপারের মধ্যে আমরা কি ঈক্ষা বা সংকল্পের পরিচয় পাই না?

উদ্ভিদ্‌রাজ্য ছাড়িয়া যদি আমরা প্রাণিরাজ্যে প্রবেশ করি, তবে পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপের মধ্যেও নিসর্গের ঐ ঈক্ষার সাক্ষাৎ পাই। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা যাহাকে Protective Variation বলেন, তাহার রহস্য কি? পাছে পাখীরা শিকার বলিয়া ধরে, এই আশঙ্কায় প্রকৃতি কোন কোন পতঙ্গকে যে গাছে সে বিচরণ করে, ঠিক তাহার অনুরূপ আকৃতি দান করেন। আবার, পাখীদিগকে বৃহত্তর পক্ষীর চঞ্চু হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যে ঝোপে তাহারা লুকাইয়া থাকে, তাহার সদৃশ করিয়া রচনা করেন।

* Now the means devised by nature for the purpose of ensuring cross-fertilisation is to allure insects, and flies and in some cases wasps by means of flaunting advertisements in the shape of coloured petals (technically called corolla) and by offers of bribe in the form of sweet honey stored away in convenient places. so as to induce them to visit the flowers; and as they did so, they would be sure to carry pollen on their heads and legs which they would rub off on the sticky stigma of the next flower they visited. As Grant Allen points out in his 'Story of the Plants', page 94 'the plants finding the good cross-fertilisation did them, began in time to bribe the insects by producing honey in the neighbourhood of their pistils and stamens, and also to attract their eyes from afar by means of those alluring and brilliantly coloured advertisements which we call petals.' * * * And he waxes eloquent when speaking of the extreme ingenuity with which, to use his own words, "members of this family often arrange their matrimonial alliances" and advises his readers to read Darwin's romantic book on this subject so as to be able fully to appreciate the various "clever dodges" which the orchids employ in order to ensure cross.fertilisation—Philosophy of the Gods, pp. 69-70.

এমন অনেক সাপ আছে, যাহাদের রূপ ঠিক গাছের ডালের অনুরূপ —লাউডগা সাপ ইহার দৃষ্টান্ত। অনেক মাছ পুষ্করিণীর বা নদীর যে কোটরে বা ফাটালে লুকাইয়া থাকে তাহারই সদৃশাকৃতি।* কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদেরা যাহাকে Avine Mimicry বলেন, অর্থাৎ, দুর্ব্বল পক্ষীকর্ত্তৃক প্রবল পক্ষীর রূপানুকৃতি, ঐ Mimicryএ বিষয়ের অতি বিচিত্র উদাহরণ। অধ্যাপক ওয়ালেস (Wallace) তাঁহার 'ডারউইনিজম্' (Darwinism) গ্রন্থে এবং চার্লস্ ডিক্সন্ (Charles Dixon) তাঁহার Story of the Birds'এ এই রূপানুকৃতির অনেকগুলি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।†

তাঁহারা আরও বলেন, এই অনুকৃতি ব্যাপার অনুকরণকারীর জ্ঞানকৃত

* Insects are made to look like the plant on which they feed, so that the birds who hunt for them may overlook them. The plumage of birds often resemble the foliage which shelters them. Some snakes resemble the branch or herb on which they roost. Some fishes resemble the bank under which they hide.

* * * * *

In these situations they often so closely resemble a stone, a clod of earth, an excrescence on the bank, a heap of leaves, or the stalk and leaves of surrounding plants, that discovery is next to impossible.

† But of all forms of protective modifications that of avine mimicry is the most curious and remarkable. Mimicry is defined by ornithologists as the imitation by a weak and defenceless bird of the colour of a stronger and more favoured one ; and they have noticed that the cuckoos present some of the most interesting instances of avine mimicry. Certain species of these birds very closely resemble hawks, while others bear a remarkable likeness to certain game birds.

—Philosophy of the Gods. p. 73.

বা চেষ্টাপ্রসূত নহে।* তাহাই যদি হইল, তবে ইহার জন্য দায়ী কে? দায়ী নিসর্গের ঈক্ষা বা সংকল্প।

সুখের বিষয় পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে কেহ কেহ একথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অধ্যাপক বার্গসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি বলিয়াছেন, প্রাণীর যে প্রাণশক্তি (Life বা Elan Vital), সেই প্রাণশক্তিই বিচিত্র শরীর নির্ম্মাণ করিতেছে। সমস্ত প্রাণিজগতে কোন এক সঙ্কল্পের ব্যাপার (something of the psychological order) অনুস্যূত রহিয়াছে। কি নিম্নপ্রাণী, কি উচ্চপ্রাণী, সকলের মধ্যেই এই প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে এবং ইহারই প্রেরণায় প্রাণিজগতে নব নব উপজাতি উৎপন্ন হইতেছে।

উদাহরণস্বরূপ, অধ্যাপক বার্গসন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, আমাদের চক্ষু এক অতি বিচিত্র যন্ত্র। ইহার অবয়ব-সংস্থান, সুকুমারতা, বৈচিত্র্য ও সুসঙ্গতি অতিশয় অদ্ভুত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে সঞ্জাত প্রাণিশরীরের পরিবর্ত্তন বংশানুক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া যে এই বিচিত্র যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে। বার্গসন বলেন, মেরুদণ্ডশালী জন্তুর মধ্যে (যাহাকে Vertibrate Animal বলে) যেরূপ চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জীব কোন কোন Mollusc-জাতীয় প্রাণীর মধ্যেও ঠিক ঐ রকমের চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়। এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর

* This resemblance between distantly related species is apparently unconscious on the part of the species practising it.—Story of the Birds. p. 199.

মধ্যে ঠিক এক ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং তাহার ফলে তাহাদের শরীরযন্ত্রের ঠিক একরূপ ক্রমবিকাশ হইয়া এক রকমের চক্ষু উপজাত হইল, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। সেই জন্য বার্গসন বলেন, মানুষ যেমন করিয়া অনুবীক্ষণ গড়িয়াছে, প্রাণ-শক্তি সেইরূপ করিয়াই চক্ষু-যন্ত্র গড়িয়াছে।* ইহা সেই প্রাচীন কথার প্রতিধ্বনি। অনেক দিন পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, 'দর্শনায় চক্ষুঃ' অর্থাৎ, জীবের দর্শন করিবার সঙ্কল্প হইল, তাহার ফলে চক্ষু উৎপন্ন হইল।

তাহাই যদি হইল, যদি দেহের পরিবর্ত্তন প্রাণশক্তির প্রেরণা ভিন্ন হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, যদি ঐ ব্যাপারের মধ্যে সংকল্প বা ঈক্ষণ (something of the psychological order) নিহিত রহিল, তবে আর বিবর্ত্তন দেহগত হইল কিরূপে? তবে ত আমাদের সেই প্রাচীন মতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল যে, দেহী ভিন্ন দেহ

* He (Bergson) points to the eye in vertebrate animals, with its marvellously delicate, complex, and exactly suitable parts. It is sufficiently difficult, he declares, as Darwin himself declared, to believe that this amazing organ has been mechanically evolved by the accumulation of accidental variations which natural selection could choose from. But an eye of closely similar structure is found in some molluscs, animals of a radically different branch of the tree of life. The theory of natural selection, asking us to believe that the same long series of happy accidents has occurred independently along those two lines, strains belief to breaking-point. It begins to be evident that there is someting called Life, which responds to the touch of light, and evolves the seeing eye: something, as Bergson says, "of the psychological order," immanent in all living things, low as well as high, which feels and strives and achieves, and which made the eye, as man made the microscope.

Harmsworth's Popular Sience p. 1255.

হয় না, অগ্রে জীব পরে শরীর, অগ্রে ব্যাপার, তারপর ইন্দ্রিয়।* এক কথায় বিবর্ত্তন দেহগত নহে, জীবগত। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না; এই যে আকৃতির যদৃচ্ছাক্রমে স্বতঃসিদ্ধ (spontaneous) পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং সেই সকল পরিবর্ত্তনগুলির মধ্যে যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহাই টিকিয়া গিয়া বংশপরম্পরাক্রমে স্থায়ী হইল, † সেই স্বতঃসিদ্ধ পরিবর্ত্তন কে ঘটাইল ? বার্গসনের মতে প্রাণশক্তির প্রেরণা (Elan vital—যাহাকে তিনি the 'thurst', the 'go' of life বলিয়াছেন)—এদেশের ভাষায় জীবের পরিস্পন্দ। সেই জন্য বিবর্ত্তনের এ দেশীয় নাম—ক্রমাভিব্যক্তি। যাহা জীবের মধ্যে অব্যক্ত ছিল, বিবর্ত্তনের ফলে তাহা অভিব্যক্ত হইল মাত্র। নূতন কোন কিছু বাহির

* It takes a soul to move a body.—Mrs. Browning.

Spirit moves body.—Edmund Spencer.

Believing that the need or the want comes first, and then the structure which will satisfy it, Lamarck argued that many of the wonderful structures of living things are produced in response to what we may call the sub-conscious will of the creatures.

In more technical language, he believed that function precedes and creates structure. He accounted for many structures by the want of them felt by animals, until the want was satisfied.

† Absolutely random variations, conveniently called 'spontaneous' and without any tendency, bias or predilection in any direction whatever have furnished the materials which natural selection has fixed in the form, say of the eye, the internal ear etc. * * The truth is that we are only just beginning to understand that the action of natural selection is not positive but negative, and that it does not account at all for the positive fact of the origin of new forms.—Harmsworth.

So Bergson's idea of the desire, the thurst of life in general, expresses for him the fundamental cause of the variations which give rise to new species.

হইতে আসিল না—যাহা পূর্ব্বাবধিই ভিতরে ছিল, তাহা প্রকাশিত হইল মাত্র।

তবেই দাঁড়াইল যে, বিবর্ত্তন বাহিরের ব্যাপার নহে, অন্তরের বিকাশ। একথাও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।* বিশেষতঃ একজন বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেল প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সকলের মধ্যেই কলা বা অবয়বরূপে পূর্ব্বাবধি সমস্তই আছে। ইহার ফলে বিবর্ত্তনবাদে নূতন তথ্য সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সে অনেক কথা—পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

---

* Evolution is a growth from within—an unfolding of potentialities which are inexhaustible and to which we ourselves but illustrations thereof, can put no limit.—Harmsworth. p. 1161.

সপ্তম অধ্যায়

মেণ্ডেলিজিম্‌ ও ক্রমাভিব্যক্তি

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডার্ব্বিন তাঁহার যুগান্তরকারী গ্রন্থ Origin of Species প্রকাশিত করেন। তাহার ফলে অচিরমধ্যে বিদ্বৎসমাজে প্রচুর চাঞ্চল্য ও আন্দোলন উত্থিত হয়। সে আন্দোলনের একটি তরঙ্গ সুদূর অষ্ট্রিয়া দেশের ব্রূণ (Brunn)-নামক এক নিভৃত পল্লীর ধর্ম্মযাজক (Vicar) গ্রেগর মেণ্ডেলের (Gregor Mendel) হৃদয়তটে অভিঘাত করে। মেণ্ডেল তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বাটীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র উত্থানে গাছ পালা লইয়া পরীক্ষা-সমীক্ষা করিতেন। ঐ কার্য্যটা তাঁহার বাতিকের মধ্যে ছিল। মেণ্ডল দেখিলেন, ডার্ব্বিনের কয়েকটি সিদ্ধাণ্ড তাঁহার পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের সহিত খাপ খাইতেছে না। তখন তিনি নানা রকমের মটর (Pea) গাছ লইয়া আরও অনেক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।* যে সব মটর গাছের কাণ্ড (Stem)

* এত গাছ থাকিতে মেণ্ডেল তাঁহার পরীক্ষার জন্য মটর গাছ কেন বাছিয়া লইলেন, এ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন—

Mendel chose the pea because its varieties are sharply marked in various definite respects and because it was possible to protect the hybrids, during the flowering period, from the influence of all foreign pollen.

৬।৭ ফিট উচ্চ হয়, ঐরূপ প্রাংশু মটর গাছের পরাগের সহিত বামন মটর গাছের (যাহার কাণ্ড এক ফিটের বেশী হয় না) যৌন-সম্মিলন ঘটাইয়া যে বীজ পাওয়া গেল, তিনি সেই বীজ হইতে নূতন মটর গাছ উৎপন্ন করাইলেন। প্রাংশু ও বামন মটরগাছের সম্মিলনে যে মটর গাছ উৎপন্ন হইল, তাহার উচ্চতা মাঝা মাঝি রকমের হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ, ছয় ফিটও নয়, এক ফিটও নয়—মধ্যম পরিমাণ তিন চারি ফিট হওয়া উচিত ছিল। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গীর সম্মিলনের ফলে যেরূপ 'মেটে ফিরিঙ্গি' উৎপন্ন হয়, সেই-রূপ শবল সন্ততি (Blended Inheritance) হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা হইল না। সকলেই প্রাংশু হইল, একটিও বামন হইল না।* এই সকল 'খচ্চর' (Hybrid) মটর গাছের মধ্যে মেণ্ডেল আবার যৌন সম্মিলন

* Now, in all Mendel's experiments, one of the pair of contrasted characters, represented in the individuals he was crossing, (such as tallness or dwarfness) appeared in all the offspring, while the opposite disappeared.—Harmsworth, p. 2!22.

এ সম্বন্ধে মেণ্ডেল নিজে এইরূপ লিখিয়াছেন—

This last was particularly striking, for it was possible to cross plants with a stem of six to seven feet with dwarf plants averaging only one foot high. In all, he studied seven distinct characters and the first result he obtained, in each case, was one which hybridisation experiments had frequently shown before. This result was the absence of what is sometimes called "blended inheritance". It seems reasonable to suppose, for instance, that the hybrid offspring of two plants, one six feet and the other one foot high, would "strike an average" between the parents. But this never happened ; the offspring of these crosses were, always as tall as the tall parent. We shall see in due course what happened to their offspring.

ঘটাইলেন। দ্বিতীয় পুরুষে দেখা গেল যে, যদিও তাহাদের পিতা মাতা উভয়েই প্রাংশু খচ্চর ছিল, কিন্তু সন্ততির বার আনা ভাগ প্রাংশু হইল এবং চারি আনা ভাগ বামন হইল। মেণ্ডেল দ্বিতীয় পুরুষের সেই বার আনা ভাগ প্রাংশু খচ্চরের মধ্যে আবার যৌন মিলন ঘটাইলেন। তাহার ফলে যে সন্ততি হইল, তাহাদের সকলেরই প্রাংশু হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কারণ, ডার্ব্বিনের মত যদি সত্য হয়, তবে এই তিন পুরুষে উপচিত হইয়া প্রাংশুত্ব গুণ এতদিনে দৃঢ়বদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত দেখা গেল। সেই তৃতীয় পুরুষে সঞ্জাত মটর গাছের মধ্যে ২/৩ অংশ প্রাংশু হইল এবং ১/৩ অংশ বামন হইল। মেণ্ডেলের এই সমস্ত পরীক্ষার ফল নিম্ন চিত্রিত বংশ-লতায় ৺ দর্শিত হইতেছে—

(Tall-Pca) প্রাংশু × বামন (Dwarf-Pea)

প্রাংশু (Tall)——প্রথম পুরুষ
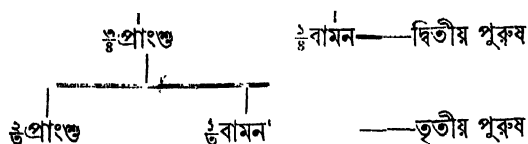
কেবল কাণ্ডের উচ্চতা নহে, মটরগাছের অন্যান্য ধর্ম্ম (Characters) —যথা বীজের আকৃতি ও বর্ণ, পুষ্পের সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষে ঐ একই নিয়ম পরিদৃষ্ট হইল।* এই রূপে ৩৪ রকমের

* Mendel studied 34 more or less distinct varieties of peas, with regard to the hereditary transmission of a number of characters, such as the form of the seeds, their colour, the position of the flowers, and also the length of the stem.

মটর গাছ লইয়া আট বৎসর-ব্যাপী নানা পরীক্ষা-সমীক্ষার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মেণ্ডল ব্রূণের দর্শন-সমিতিতে (Brunn Philosphical societyতে) একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধর নাম, Experiments in Plant Hybridisation।* ঐ প্রবন্ধে তিনি স্বকৃত পরীক্ষা সমূহের উল্লেখ করিয়া কয়েকটি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াসী হন। বিরুদ্ধ লক্ষণযুক্ত পিতামাতার সংযোগের ফলে শবল সন্ততির (Blended Inheritanceএর) উদ্ভব হয় না—প্রত্যুত, হয় পিতৃগুণ (যেমন প্রাংশুত্ব), নয় মাতৃগুণ (যেমন বামনত্ব), সন্তানে পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়—ইহাই মেণ্ডেলের নির্দ্ধারিত প্রথম নিয়ম। কিন্তু তথাপি দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে দেখা যায় যে, ঐ প্রকট গুণ (যেমন কাণ্ডের প্রাংশুত্ব) অপ্রকট হইয়া যায় এবং প্রথম পুরুষে যাহা অব্যক্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই গুণ (যেমন কাণ্ডের বামনত্ব) উত্তর পুরুষের সন্ততির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিতে সুব্যক্ত হয়। ইহা হইতে মেণ্ডেল প্রতিপন্ন করেন, সন্তানবীজে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবয়ব বা কলা (Factors) প্রচ্ছন্ন থাকে—উহার মধ্যে কোনটি এক পুরুষে, অন্য কোনটি অন্যপুরুষে, সন্ততিতে প্রকটিত হয়।† ঐ প্রকটিত কলা বা অবয়বকে তিনি 'প্রবল' (Dominant) এবং ঐ অপ্রকট কলাকে তিনি 'নির্ব্বল'

* ঐ প্রবন্ধের মুখবন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন—

The paper now presented records the results of such a detailed experiment. This experiment was confined to a small plant group, and is now, after eight year's pursuit concluded in all essentials.

† এ সম্বন্ধে মেণ্ডেলের নিজের কথা এই—

The conclusion appears logical that in the ovaries of the hybrids, there are formed as many sorts of egg-cells, and in the anthers as many sorts of pollen-cells, as there are possible combination forms.

(Recessive) আখ্যা প্রদান করেন।* এখানে প্রবল অর্থে ব্যক্ত (Patent) এবং নির্ব্বল অর্থে অব্যক্ত (Latent)।

মেণ্ডেল ঐ প্রবন্ধে এইরূপ অনেক সার সত্যের সন্ধান দেন; কিন্তু তখন কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার ঐ প্রবন্ধ অবজ্ঞাত হইয়া অনেক বৎসর বাজে কাগজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ডি ভ্রাইস্ এবং আর দুইজন বৈজ্ঞানিক কোরেন্স্ (Correns) ও সেয়রম্যাক্ (Tschermak) পরস্পর স্বাধীন ভাবে মেণ্ডেলের ঐ প্রবন্ধের সন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করেন। তাহার পর হইতে এ বিষয়ের প্রতি প্রাণিতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের কৃত পরীক্ষা-সমীক্ষা দ্বারা মেণ্ডেলের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীকৃত হয়। শুধু উদ্ভিদ্ নহে—জীবজন্তু সম্বন্ধেও দেখা গেল যে, মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত নিয়ম প্রযোজ্য বটে। নিম্নোদ্ধৃত চিত্র হইতে এই বিষয় বিশদ হইবে।

* Henceforth in this paper those characters which are transmitted entire............and therefore in themselves constitute the characters of the hybrid, are termed the dominant, and those which become latent in the process, recessive. The expression 'recessive' has been chosen because the characters thereby designated withdraw or entirely disappear in the hybrids, but nevertheless reappear unchanged in their progeny, as will be demonstrated later on. It was furthermore demonstrated by the whole of the experiments that it is perfectly immaterial whether the dominant character belongs to the seed-bearer or to the pollen-parent; the form of the hybrid remains identical in both cases.
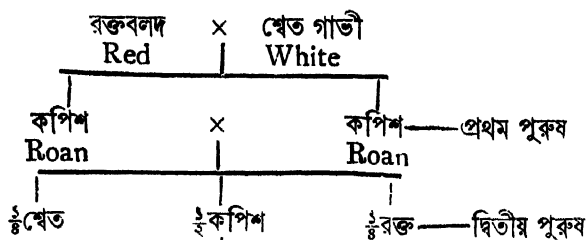
শ্বেত ¼শ্বেত ½কপিশ ¼রক্ত রক্ত—তৃতীয় পুরুষ

এখন পাশ্চাত্য দেশে 'মেণ্ডেলিজম্' বলিয়া একটা মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বেটম্যান্ (Bateman) ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। এই মতবাদ ধীরে ধীরে ডার্ব্বিনিজিমের (Darwinism এর) প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতেছে এবং খুব সম্ভব আর কয়েক বৎসর পরে ডার্ব্বিনিজিমকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মেণ্ডেলীয় মতবাদের মূলকথা কি? মূলকথা এই যে, (১) যে বীজ হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয়, সেই সন্তানবীজে পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কলা বা অবয়ব (Factors) প্রচ্ছন্ন থাকে। (২) ঐ সকল কলার সংস্থান যদৃচ্ছাক্রমে (by the laws of Chance) স্থিরীকৃত হয়। (৩) বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত কলাদ্বয় শবলিত হয় না, কিন্তু স্বতন্ত্র থাকে এবং ঐরূপ দুইটি বিরুদ্ধ কলা সম্মিলিত হইলে একটী প্রবল এবং আর একটী নির্ব্বল হয়। (৪) এক পুরুষে যে কলা নির্ব্বল ভাবে অব্যক্ত থাকে, পুরুষান্তরে তাহাই প্রবল হইয়া সুব্যক্ত হয়।* একটী উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি

The essential ideas of Mendel are first, the characteristics

স্পষ্ট হইতে পারে।* বর্ত্তমানে দেখা যায়, প্রায় দুই হাজার রকম আপেল ফল আছে। আকার, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে ঐ সকল আপেলের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঐ দুই হাজার রকম আপেলেরই বীজ-পুরুষ বা পূর্ব্ব-জনক বন্য আপেল (যাহাকে crab-apple বলে)। ডার্ব্বিনের মতে সেই আদিপুরুষ ক্র্যাব-আপেল স্মরণাতীত কালে বিলম্বিত ক্রমে সুধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়া, অল্পে অল্পে ঐ সকল সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন পুঞ্জীভূত করিয়া, এই দুই হাজার আপেল-উপজাতির সৃষ্টি করিয়াছে। মেণ্ডেলের দল ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তাহা নহে। সেই বীজ-পুরুষ ক্র্যাব আপেলের মধ্যে এই দ্বিসহস্র প্রকার আপেলেরই পূর্ব্বরূপ কলা বা অবয়বরূপে প্রথম হইতেই সম্ভৃত ছিল। কালসহকারে সন্ততির পর সন্ততিতে ঐ সকল বিভিন্ন কলাসমূহ কখনও সুব্যক্ত, কখনও বা অব্যক্ত হইয়া এই দুই সহস্র আপেল-উপজাতির উৎপাদন করিয়াছে।

of the individual are due to some kind of entities, 'factors' or 'determinants', existing in the germ-cells from which the individual is developed ; second, that these factors are distributed in the germ-cells according to the laws of *chance* ; third, that opposite factors, meeting in a germ-cell, would not blend, but segregate ; and fourth, that when opposite factors meet, one tends to be dominant and the other recessive.

* Take as an example, apples. There are now some 2000 kinds of apples, but they have all come from the wild variety, the crab-apple. They differ in size, in colour, in texture of skin, in sweetness as regards the fruit, and in many other ways as to the tree. Now, according to Darwin, the original crab-apple tree began to vary, and one variation after another cumulating, there came as a summing up of all these variations the second species of apple ; this species too, then varied, and

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"—যাহা নাই তাহা আসে না; যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাই সুব্যক্ত হয়। সেই জন্য অধ্যাপক বেটম্যান্ বলিয়াছেন, বিকাশের বা বিবর্ত্তনের সমস্ত সম্ভাবনাই অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান থাকে। বিবর্ত্তনের ফলে এই সকল অব্যক্ত সম্ভাবনা অভিব্যক্ত হয় মাত্র।*

যাঁহাকে আমরা মহাকবি সেক্সপীয়ররূপে পরবর্ত্তী কালে প্রাপ্ত হই, তিনি আলপিন হইতে ক্ষুদ্রতর এক জীবপঙ্কের (Protoplasmএর) মধ্যে পূর্ব্বাবধিই প্রচ্ছন্ন ছিলেন। বেটম্যান্ আরও বলিতেছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রতিভাবান্ মানুষের যে কলাশক্তি (artistic gifts), ঐ শক্তি বহিরাগত কোন কিছু নহে। সাধারণ মানুষে যে কলাশক্তি নিরুদ্ধ আছে, যিনি প্রতিভাশালী তাঁহার মধ্যে সেই নিরোধ অপসৃত হওয়াতে, ঐ কলাশক্তির

an accumulation of little variations brought additional species; and so on during the centuries the existing species have arisen. But according to the Mendelian theory of factors, all the existing (and future possible) varieties of apple-trees are due to a certain number of factors as to size, colouring, sweetness and so on, which exist from the beginning in the germ-cells of the crab-apple. In the course of centuries these factors combine, and it is their permutations and combinations that have given rise to the two thousand odd varieties that we have to-day. tNature—or the cultivators—have only combined pre-existing factors; hey have added nothing to the original wild crab apple, which from the beginning was like an invisible horti cultural exhibit of all apples that were ever to be.—Theosophy and Modern Thought. P. 37

* Factors for all possibilities in Evolution fore-exist. "Shakespeare once existed as a speck of protoplasm not so big as a small pin's head."—Bateman

স্ফুরণ হইয়াছে মাত্র। এইরূপ যেখানেই আমরা কোন উচ্চবৃত্তির বিকাশ দেখি, বুঝিতে হইবে সেটা বাস্তবিক নিরোধমুক্তি (Release of Powers)—আগন্তুক পূর্ত্তি নহে। যেমন বাদিত্র পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, এখন তাহাতে সুর-সংযোগ হইল মাত্র।' * শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া বলিয়াছেন—'প্রত্যেক মানুষই একাধারে সেক্স্পীয়র, তানসেন—বিবর্ত্তনের ফলে মানবের যে কিছু বিকাশ সম্ভব, সে সমস্তই। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে ঐ ঐ প্রতিভা এখনও প্রকট হয় নাই—এইজন্য যে, তাহার শক্তি অদ্যাবধি নিরুদ্ধ রহিয়াছে। প্রতিভাশালী হইবার জন্য শক্তির পর শক্তি সংগ্রহ করিতে হয় না। শক্তি ত' নিরুদ্ধ দশায় তাহার মধ্যে বিদ্যমান আছেই—শুধু প্রয়োজন, সেই নিরোধের অপসারণ, সেই 'অন্তরায়ধ্বস্তি'। †

এই ভাবে দেখিলে Evolution বা বিবর্ত্তনের অর্থ দাঁড়ায় ক্রমাভিব্যক্তি (Growth from within)। বাস্তবিক Evolution শব্দের মৌলিক অর্থ তাহাই—E = out এবং Volvo = to roll। যাহা সঙ্কুচিত ছিল, তাহা

* I have confidence that the artistic gifts of mankind will prove to be due not to something added to the make-up of an ordinary man, but to the absence of factors which in the normal person inhibit the development of these gifts. They are almost beyond doubt to be looked upon as releases of powers normally suppressed. The instrument is there but it is "stopped down."—Prof. Bateman's Presidential address at the British Association in 1914.

† Each man is a Shakespeare, a musical genius, everything that evolution will ever make out of men; but every man is not a genius in actuality because of the existence still in him of inhibiting factors. We do not need to become geniuses by adding faculty to faculty; the faculties are there but *unreleased*, because of the inhibiting factors.

প্রসারিত করা, যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহা ব্যক্ত করা, যাহা অপ্রকাশিত ছিল তাহা প্রকাশিত করা। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা ইদানীং এই ভাবেই বিবর্ত্তন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—'সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্ভাবনা আমাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে। সুযোগ ঘটিলেই, সুবিধা হইলেই তাহার ব্যঞ্জনা হয়।' অতএব মানবের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের উৎস অফুরন্ত—আমাদের সাধ্য কি যে, তাহার ইয়ত্তা করি?* যাহাকে Environment বলা হয়, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হয় মাত্র; অর্থাৎ, ঐ অবস্থা শক্তির জননী নয়, ধাত্রী মাত্র।† পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারে না, 'দলাই মলাই' করিয়া ঘোড়াকে সবল ও সুশ্রী করিতে পারে মাত্র।‡

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কিরূপে ধীরে ধীরে প্রাচ্য প্রজ্ঞানের সমীপস্থ হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি, প্রাচ্য প্রজ্ঞানের মতে জীব ব্রহ্ম-খণ্ড, চিদ্-অণু—ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু। ঐ ব্রহ্ম সমস্ত শক্তির প্রস্রবণ।

* All powers and capacities must lie latent within, pre-existing, awaiting the right conditions for their expression.

Evolution is a growth from within—an unfolding of potentialites, which are inexhaustible and to which we can put no limit.

† Environment is the *means* of releasing innate faculties.

‡ অধ্যাপক টমসন এই মতের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন—Our inheritance is like a number of buds to which we cannot add; but the environment is like the wind and the rain which determine that this bud shall open generously whereas this other shall haply remain asleep.

অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।

ব্রহ্মে যে অনন্তবিধ বিচিত্র শক্তি সুব্যক্ত, ব্রহ্মাংশ জীবে তাহা অব্যক্ত বা অর্দ্ধব্যক্ত হইলেও অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান।

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী

পতঞ্জলি পুরুষবিশেষ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বলিয়াছেন—'তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্'—এ কথা জীবের সম্বন্ধেও বেশ প্রযোজ্য। শুধু প্রজ্ঞত্ববীজ নহে, ঈশিত্ব-বশিত্ব প্রভৃতি সমস্ত শক্তির বীজই জীবে নিহিত আছে। ঈশ্বরে যাহা পূর্ণ বিকশিত, জীবে তাহা বীজভাবাপন্ন। সেই জন্যই ঈশ্বর জীব হইতে অধিক।

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র,—২।১।২২

জীবের এই সকল সুপ্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, এই সকল অব্যক্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করিবার জন্য, জীবকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়।

মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ বীজং দধাম্যহং।—গীতা ১৪।৩

মহৎব্রহ্ম=প্রকৃতি। ঐরূপে প্রকৃতি-ক্ষেত্রে যে বীজসমূহের আধান হয়, সেই বীজ অন্য কিছুই নহে, এই সকল জীবরূপ চিদ্-অণু। প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত উপাধি গ্রহণ করিয়া ঐ সকল জীব-বীজ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। মাতার কুক্ষিতে কলল বা সন্তানবীজ যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমনই তাহাদিগের অন্তরে সুপ্ত শক্তিসমূহ ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে।* জীব কিরূপে ক্রমবিকাশের ফলে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম

---

* এই তত্ত্বের উপদেশ করিয়া বাইবেল বলিয়াছেন—He is sown in weakness so that he may be raised in power। এইরূপে Raised-in-power জীবই জীবন্মুক্ত—তিনি ঈশ্বরের সাযুজ্যলব্ধ। সেই জন্য জীবকে বলা হয়—'God

করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়; এবং জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হইয়া প্রথমে সরীসৃপ, তাহার পর জলজ, স্থলজ লক্ষ লক্ষ পক্ষী ও পশুর দেহে বসতি করিয়া, অবশেষে মনুষ্যদেহ গ্রহণ করে এবং মানুষের মধ্যে প্রথম অসভ্য, তাহার পর অর্দ্ধসভ্য, তাহার পর সভ্য, চরমে সুসভ্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিমানবতার উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া জীবন্মুক্তের তুঙ্গ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়—আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, জন্মান্তরই এই ক্রমোন্নতির সরণী। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপাধির তারতম্যেই জীবগত শক্তির প্রকাশের তারতম্য হয়। স্থাবরে যে চিদ্-অণু নিরুদ্ধ-চেতন হইয়া আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, উদ্ভিদে যে চিদ্-অণু জ্ঞানশক্তির স্তম্ভনে প্রাণের স্পন্দনমাত্র অনুভব করিয়াছিল, পশু পক্ষীতে যে চিদ্-অণু সুখ দুঃখের অনুভূতি লাভ করিয়াও প্রজ্ঞা ও প্রেমের উচ্চতর স্পন্দনে সাড়া দিতে পারে নাই, সেই চিদ্-অণুই মানব শরীর গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বিবর্ত্তন স্রোতে ভাসমান হইয়া সৎ-চিদ্-আনন্দের পূর্ণ অধিকারী হয়। এই অধিকার লাভের নিসর্গ-নির্দ্দিষ্ট পন্থা ও প্রণালী—জন্মান্তর। ঐতরেয় আরণ্যকে এবং তাহার সায়ণকৃত ভাষ্যে এই বিষয়ের সুন্দর আলোচনা আছে। নিম্নে ভাষ্য সহিত আমরা সেই আরণ্যকের একাংশ উদ্ধৃত করিলাম—

তস্য য আত্মানম্ আবিস্তরাং বেদ, অশ্নুতে হাবির্ভূয়ঃ।—ঐতরেয় আরণ্যক, ২।৩।১
তস্য উক্থরূপস্য পুরুষস্য শরীরে বর্ত্তমানং চিদ্রূপম্ আত্মানম্ আবিস্তরাম্ অতিশয়েন প্রকটম্ ইতি যঃ পুমান্ উপাস্তে স পুমান্ ভূয় আবিঃ অতিশয়েন প্রকটত্বম্ অশ্নুতে ব্যাপ্নোত্যেব —সায়নভাষ্য

tion' 'God in the making'! এই Made Godকে লক্ষ্য করিয়া যিশু খৃষ্ট বলিয়াছেন—Be ye perfect as your Father in Heaven is perfect.

ওষধিবনস্পতয়ো যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রাণ-ভৃৎ স আত্মানমাবিস্তরাং বেদ। ওষধিবনস্পতিষু হি রসো দৃশ্যতে, চিত্তং প্রাণভৃৎসু। প্রাণভৃৎসু ত্বেব আবিস্তরাম্ আত্মা; তেষু হি রসোঽপি দৃশ্যতে। ন চিত্তং ইতরেষু। পুরুষে ত্বেব আবিস্তরাম্ আত্মা। স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমঃ বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্যেনামৃতমীপ্সত্যেবং সম্পন্নঃ। অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং: ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকৌ। তএতাবন্তো ভবন্তি যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ। —ঐতরেয় আরণ্যক, ২।৩।২

ইহার সায়নকৃত ভাষ্য এইরূপ—

চৈতন্যস্য উপাধিবিশেষেষু তারতম্যেন আবির্ভাবং দর্শয়িতুং আদৌ একম্ উপাধিম্ উদাহরতি। ওষধিবনস্পতয়ঃ যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রাণভৃৎ ইতি।

সচ্চিদানন্দরূপস্য জগৎকারণস্য পরমাত্মনঃ কার্য্যভূতাঃ সর্ব্বেঽপি পদার্থাঃ আবির্ভাবোপাধয়স্তত্রাচেতনেষু মৃৎপাষাণাদিষু সত্তামাত্রমাবির্ভবতি, ন চাত্মনো জীবরূপত্বং। যে তু 'ওষধি বনস্পতয়ঃ' জীবরূপাঃ স্থাবরাঃ যে চ শ্বাসরূপপ্রাণধারিণো জীবরূপা জঙ্গমাঃ তে উভয়ে অতিশয়েনাবির্ভাবস্থানমিতি যো নিশ্চিনোতীত্যধ্যাহারঃ। 'সঃ' পুমান্, আত্মানম্ অতিশয়েন আবির্ভূতমুপাস্তে।

মনুষ্যা গবাশ্বাদয়শ্চ প্রাণভৃতঃ, তেষাং মধ্যে 'পুরুষে' মনুষ্যে 'এব' অতিশয়েনাত্মাবির্ভাবো নতু গবাশ্বাদিষু। যস্মাৎ 'সঃ' মনুষ্যঃ অত্যন্তং প্রকৃষ্টজ্ঞানেন সম্পন্নঃ।

এখানে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপাধির বিশেষেই জীবগত শক্তির আবির্ভাব বা প্রকাশের তারতম্য লক্ষিত হয়, অর্থাৎ, জীবের শক্তি আগন্তুক নহে, জীবের অন্তরস্থিত। মেণ্ডেল বিজ্ঞানের ভাষায় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে তিনিও ডার্ব্বিনের মত বিবর্ত্তনকে দেহগত করিতে চাহেন। তাঁহার মতে সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার কেন্দ্র Germ-plasm বা সন্তান-বীজ। আমরা বলিতে চাহি নিখিল শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার উৎস কোষাণু নহে, চিদ্-অণু। কারণ, বিবর্ত্তন দেহগত নহে—জীবগত।

সুখের বিষয় পশ্চিমদেশে একথাও কেহ কেহ বলিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ষ্টিভেনসন্ হাওয়েল (Stevenson Howell) নামক একজন বৈজ্ঞানিক বিগত জানুয়ারী মাসের Theosophical Review পত্রে বিজ্ঞানের দিক হইতে এই জন্মান্তরের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইব যে, যেমন দেহের বিবর্ত্তনের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, সেইরূপ সম্বিৎ বা Consciousnessএর বিবর্ত্তনের পশ্চাতেও একটা যুগব্যাপী ক্রমবিকাশ আছে।*

হাওয়েল সাহেবের শেষ সিদ্ধান্ত এই, 'জীব এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে, এবং প্রত্যেক জন্মে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাহা প্রজ্ঞা ও সামর্থ্যে রূপান্তরিত হয়। অতএব প্রত্যেক জন্মই তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের এক একটী সোপানস্থানীয়। সে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চরমে নিজের গম্যস্থানে উপনীত হয়। এই গম্যস্থান পূর্ণতা-সিদ্ধি।'†

* We may even be forced to the conclusion that a long past lies behind man's consciousness, just as a long past lies behind the evolution of his body.—Theosophical Review for January, 1925, p. 31.

† The individual is born many many times on earth, gradually transmuting the experiences gained in each life into wisdom and faculty, so that each incarnation represents for him a growth in mental and moral capacity and takes him one step nearer his goal—the perfecting of his being.—Ibid, p. 32.

এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

Man's purpose in life at his present stage is neither to be happy or miserable but to achieve his archetype.

পূর্ণ হইতে মোক্ষিত হইয়া জীব আবার পূর্ণে প্রত্যাবর্ত্তন করে—ইহাই জন্মান্তরের সার্থকতা।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

এই archetype তাহার বিধাতৃ-বিহিত বৈশিষ্ট্য। যেমন সূর্য্যের শুভ্র জ্যোতিঃ কাচের ত্রুলের (Prismএর) মধ্যদিয়া বিচ্ছুরিত হইলে 'সপ্ত সপ্তি'তে Seven prismatic colours) প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ, মায়া-উপাধির মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া, সপ্তশ্রেণীর জীবে প্রকাশিত হয়েন। ইহাদিগকে Rays বা Archetypes বলে। এই সপ্তশ্রেণীর নাম যথাক্রমে—Philosophical. Scientific. Artistic, Devotional, Mystic, Ceremonial and Heroic. এই সপ্তশ্রেণী বা Typeকে বিধাতার 'প্রকল্প' বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক জীবের পক্ষে স্বীয় 'প্রকল্প'-সিদ্ধিই (Achieving the Archetype) পরম পুরুষার্থ।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

জন্মান্তরের সঙ্কর যুক্তি

জন্মান্তরের সাধক যুক্তির অন্বেষণে আমাদের বিজ্ঞান-অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ঐ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা বিবর্ত্তন জালে জড়িত হইয়া পড়ি; এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগকে 'ডার্ব্বিনিজিম্' ও 'মেণ্ডেলিজিমের' বাদ-বিবাদের বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এসম্বন্ধে যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিবর্ত্তন দেহগত নয়—জীবগত। আরও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিবর্ত্তনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমবিকাশ—জীবে প্রচ্ছন্ন, অব্যক্ত শক্তির ক্রমাভিব্যক্তি, আর ঐ ক্রমবিকাশ সিদ্ধ করিবার প্রাকৃতিক বা স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী—জন্মান্তর। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা জন্মান্তরের অনুকূলে আরও কয়েকটি যুক্তির উল্লেখ করিব। এ সকল যুক্তি দার্শনিকও বটে, বৈজ্ঞানিকও বটে। সেই জন্য তাহাদিগকে 'সঙ্কর' যুক্তি বলিলাম।

পশ্চিম দেশে যাহাকে Genius বলে—আমরা এদেশে এখন যাহাকে 'প্রতিভা' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—সেই মনীষার কথা আর একবার স্মরণ করুন। মনীষা নানাবিধ। হোমর, বাল্মীকি, সেক্‌সপীয়র, কালিদাসের ন্যায় কবি, তানসেন, মোসার্ট, বিথোভেনের ন্যায় কালোয়াত, মাইকেল এনজেলো,

ধীমানের ন্যায় ভাস্কর, জুলিয়াস্ সিজার, শিবাজি, নেপোলিয়নের ন্যায় মহারথী যেমন মনীষী, সেইরূপ প্লেটো, শঙ্করাচার্য্য, হেগেলের ন্যায় দার্শনিক বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের ন্যায় ধর্ম্মবীরও মনীষী (Men of Genius)।* এই সকল বিচিত্র মনীষার কোথা হইতে উদয় হয় ?

আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মনীষা নিসর্গের দান, প্রযত্নের ফল নহে—মনীষা জন্মগত, চেষ্টাপ্রসূত নহে। বরং মাজিয়া ঘসিয়া সুরূপ হওয়া সম্ভব, কিন্তু কুন্দন কর্ষণ করিয়া মনীষী হওয়া যায় না। সেই জন্য ইংরাজিতে বলে—Genius is born, not made। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পাত্রবিশেষে অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত ভাবে মনীষা হঠাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করে,—তাহার কোন পূর্ব্বলক্ষণ, পূর্ব্বসূচনা

* এই মর্ম্মে অধ্যাপক হাক্সলি কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

As there are some men who cannot understand the first book of Euclid, some who cannot feel the difference between the Sonata Appassionata and Cherry Ripe or between a grave stone-cutter's cherub and the Apollo Belvedere, so there are others who devoid of sympathy are incapable of a sense of duty.

* * * *

And as there are Pascals and Mozarts, Newtons and Raffaels, in whom the innate faculty for science or art seems to need but a touch to spring into full vigour, and through whom the human race obtains new possibilities of knowledge and new conceptions of beauty; so, there have been men of moral genius to whom we owe ideas of duty and visions of moral perfection, which ordinary mankind could never have attained; though happily for them, they can feel the beauty of a vision, which lay beyond the reach of their dull imaginations and count life well spent in shaping some faint image of it in the actual world—Huxley's Hume—Ch. XI p p. 207-8.

বা পূর্ব্বসম্ভাবনা লক্ষিত হয় না। জুলিয়াস্ সিজার, যাঁহাকে নেপোলিয়নের মত রণপণ্ডিত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-বীর (Greatest General) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই জুলিয়াস সিজার চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হংসপুচ্ছসার মসিজীবী ছিলেন—এক দিনের তরেও অসিচালন করেন নাই। ঘটনাচক্রে যখন রোমকরাজ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়া আত্মকলহের সৃষ্টি হইল, তখন সিজার বাধ্য হইয়া প্রথম 'গলে' অস্ত্রধারণ করিলেন এবং হঠাৎ এরূপ প্রতিভাশালী পরিপক্ক সেনাপতি রূপে সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন যে, অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই রোমকসাম্রাজ্য তাঁহার করতলগত হইল। মনীষার এইরূপ হঠাৎ স্ফূর্ত্তির আর একটি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই—কবি বার্ণস (Burns)। বার্ণস্ যখন দারিদ্র্যের সহিত নিত্য সংগ্রাম করিয়া স্কটলণ্ডের নিভৃত পল্লীতে হল চালনা করিতেন, তখন এই অর্দ্ধশিক্ষিত কৃষক যুবকের মধ্যে মনীষার কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। সহসা বনস্থলীতে বসন্তের উদয় হইলে যেমন বনপিক কূজন করিয়া উঠে, সেইরূপ একদিন বার্ণসের কণ্ঠে অকস্মাৎ সঙ্গীতধ্বনি ফুটিয়া উঠিল—জগৎ মোহিত-বিস্মিত হইয়া সেই গীতসুধা পান করিল।*

* এ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ সমালোচক (Lord Rosebery) কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

Try and reconstruct Burns as he was. A peasant, born in a cottage that no sanitary inspector in these days would tolerate for a moment; struggling with desperate effort against pauperism, almost in vain; snatching at scraps of learning in the intervals of toil, as it were with his teeth; a heavy, silent lad, proud of his ploughing. All of a sudden without preface or warning, he breaks out into exquisite song, like a nightingale from the brushwood, and continues singing as sweetly—with nightingale pauses—till he dies. A nightingale sings because he cannot help it; he can only sing exquisitely, because he knows no other. So it was with Burns. What is this but inspiration? One can no more measure or reason about it than one can measure or reason about Niagara.

মনীষা সম্বন্ধে আমাদের আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মনীষী ব্যক্তি প্রায়ই বন্ধ্য বা 'বাঁজা' (Barren) হয়, তাহার সন্ততি হয় না। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা একথা অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন Genius is often barren।* নিসর্গের যদি ইহাই উদ্দেশ্য হইতে যে, সন্ততিতে সংক্রামিত হইয়া পিতৃলব্ধ গুণ বা বৈশিষ্ট্য উপচিত হইবে, তবে মনীষায় যখন ঐ উপচয় শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিল, তখন নিসর্গের উচিত ছিল, বহু সন্ততির জন্ম দিয়া ঐ উপচিত গুণের বিস্তৃতিবিধান করা। কিন্তু নিসর্গ তাহা না করিয়া মনীষীকে বংশহীন করেন। ইহার মীমাংসা কি? আর যদিই বা কুত্রাপি মনীষীর সন্তানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবে সে সন্তান মনীষার অধিকারী হওয়া দূরে থাকুক, অধিকাংশ স্থলেই জড়বুদ্ধি (Dolt) হয়। কালিদাসের পুত্র-কন্যা ছিল কিনা জানিবার উপায় নাই—কিন্তু সেক্স-পিয়রের সন্তানদিগের কথা আমাদের সুবিদিত। তাহারা কেহই কবি-প্রতিভার অধিকারী হয় নাই—অতি সাধারণ ব্যক্তি ছিল। নেপোলিয়নের বংশধর বামন নেপোলিয়নের কথা কে না জানেন? তাহার ভালে যদি কেহ দয়া করিয়া ঐ বীর পিতার নাম খোদিত করিয়া দিত তবেই আমরা তাহাকে নেপোলিয়নের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিতাম। অন্যথায় এই নির্বুদ্ধি কাপুরুষকে চিনিবে কাহার সাধ্য? এ সম্বন্ধে শ্রীবুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছিলেন, আমার বিশ্বাস, তাহাই শেষ কথা।

বুদ্ধদেব সম্বোধিলাভের পর যখন ভিক্ষুকবেশে কপিলাবস্তুতে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'পুত্র! বিখ্যাত রাজবংশের বংশধর, রাজপুত্র তোমার আজ এই দীন বেশ!' তদুত্তরে বুদ্ধদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, 'পিতঃ! আমি ত' রাজকুলে

* As life ascends and becomes more successful, the birth rate falls.

জন্মি নাই— কল্পক্রমাগত যে বোধিসত্ত্ব-বংশ, আমি সেই বংশের বংশধর। আপনি বৃথা বিলাপ করিবেন না।' এই কথাই ঠিক্। মনীষার জন্ম পিতার ঔরসে বা মাতার কুক্ষিতে হয় না। মনীষীকে সম্বোধন করিয়া আমরা কবিরের ভাষায় বলিতে পারি—

কোন মুলুক্সে আয়সি হংসা !
উৎরঙ্গে কোন ঘাট।

মনীষী হইতে যদি আমরা একগ্রাম নামিয়া আসি, তবে সকল দেশেই কতকগুলি 'আজব' মানুষের (যাহাদের ইংরাজিতে Prodigy বলে) সাক্ষাৎ পাই। অনেকস্থলে এই 'আজব' গুলি শিশুদেহধারী—অপরিণত বুদ্ধি, অশিক্ষিত, সুকুমার বালক বালিকা। তথাপি তাহারা যে সকল 'কাণ্ড মাণ্ড' করে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

ধ্রুব, প্রহ্লাদ বা নচিকেতার মত 'বালখিল্যে'র কথা তুলিব না, কারণ, তাঁহাদের কাহিনী পৌরাণিক উপকথা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। অতএব যাহা প্রত্যক্ষগোচর, প্রামাণিক ঘটনা, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই, এরূপ ঘটনার উপরই আমাদের যুক্তির স্থাপনা করিব।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে একটি অদ্ভুত বালকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার নাম মং টুন কিগিং (Maung Htun Kgaing)। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের মিংস্গ্রামে ইহার জন্ম হয়। এই শিশুর পিতামাতা অতি সাধারণ ব্যক্তি।

এই শিশুর যখন ৪ বৎসর ৬ মাস বয়স, তখন সে 'দেহী ও দেহ' 'চিৎ ও জড়' 'তমঃ ও জ্যোতিঃ' প্রভৃতি উচ্চ দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে। তাহার এই অদ্ভুত বক্তৃতার খ্যাতি শীঘ্রই ব্রহ্মদেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দলে দলে প্রবীণ ও পণ্ডিত পুঙ্গিগণ তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য

সমাগত হন। অবশেষে প্রসিদ্ধ উং বাং মঠের অধ্যক্ষ স্থবির ভিক্ষু জাগায়া ঐ শিশুর যশঃ সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া মিংস্ গ্রামে উপস্থিত হয়েন এবং শিশুর শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন। শিশু নাকি তাঁহাকে গোপনে বলিয়াছিল যে, তিনি ঐ উং বাং মঠের তাহার একজন ভূতপূর্ব্ব শিষ্য। ব্রহ্মবাসীদিগের বিশ্বাস যে, এই শিশু ঐ উং বাং মঠের অধ্যক্ষ পরলোক-গত মহাস্থবির পাণ্ডিক্য। ঐ পাণ্ডিক্য স্বাধীন নৃপতি থিবো কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পূর্ব্ব বৎসর ঐ মঠের প্রধানরূপে বৃত হয়েন। ১৯১৫ খৃঃ অঃ ৭০ বৎসর বয়সে পাণ্ডিক্য দেহ ত্যাগ করেন। ব্রহ্মদেশের রীতি অনুসারে তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ পাণ্ডিক্যের জন্য একটী সুবর্ণময় শবাধারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই পাণ্ডিক্যই নাকি এই অদ্ভুত শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন এই শিশু ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহে বক্তৃতা করিয়া বেড়াই-তেছে।*

এই শিশু সেই পাণ্ডিক্যের নবকলেবর কিনা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। তবে এ শিশু যে 'আজব' শিশু (Infant Prodigy) ইহা অসংকোচে বলা যাইতে পারে।

---

* এই শিশুর বিবরণ আমার এক ব্রহ্মদেশীয় বন্ধু (নৃপতি থিবোর জামাতা) বার্ম্মিস্ পুস্তিকা হইতে অনুবাদ করিয়া যাহা পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—At the age of 70 in 3rd Wasoing of Taladwe 1277 B. E. (December 1915 or January 1916) he—Rev. Beckka Pandeiksha Sayadow died. ... ... After the interval of about four years the late Rev. B Pandeiksha was reborn in the body of Maung Htun Kyaing in Minse village Maung Htun Kyaing was born 2nd Wounen of Pyatho 1281 B.E. (December 1919 or January 1920) on Tuesday in Minse village, Pantanow Township. Lower Burma. His father's name is Maung Ba Maung and mother's Ma Maiye who are religious. He is bright, beautiful and with fine eyes.

আর একটী অদ্ভুত বালিকার বিবরণ আমরা ১৯০৬ সালে পাঠ করিয়া ছিলাম। তাহার মাতা একজন পিয়নোবাদিনী (Pianist) ছিলেন। একদিন তিনি পিয়নো বাজাইতে বাজাইতে কার্য্যান্তরে অন্য কক্ষে গমন করিলেন। পিয়ানোর ডালা খোলাই রহিল। হঠাৎ তিনি শুনিলেন যে, পিয়নোতে কে তানলয়-সমন্বিত সুন্দর গৎ বাজাইতেছে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিশুকন্যাই (Infant child) ঐ বাদয়িত্রী। ঐ শিশু শুধু পিয়নোর তারে টুং টাং শব্দমাত্র করে নাই, কিন্তু বেশ দক্ষ ভাবে একটা কঠিন গৎ সাধিতেছিল। অথচ এই সে প্রথম পিয়নো স্পর্শ করিল।*

আর একটী শিশু 'prodigyর' কথা কয়েকমাস পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই শিশু যুক্তরাজ্যের ওয়াশিংটন প্রদেশে ১৯২০

At the age of four years and six months he gave lectures on man and his body, spirit and matter, light and darkness, etc. The news of his wonderful lectures spread and the learned monks who personally heard his lectures praised him.

One Rev. Zagaya, the head of the Yun yung monastery of Panla-mend town on hearing the child's news came down to Minse village to see the child Ma. Htun Kyaing. The child related the biography of his previous life and lastly softly whispering to him said that he (Rev. Zagaya) was one of his old disciples in Yunyung monastery.

* The lady one day played some music on her piano, and then going into the next room was amazed to hear the same piece being skil-fully performed. Returning she saw her infant child seated at the piano and playing, with the skill of an expert, music which normally none but a highly-trained pianist would attempt. To add to the mystery, this was the first time the child had been known even to touch the piano.

সালে নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করে। তাহার বয়স যখন ১১ মাস, তখন সে সঙ্গীত-প্রতিভার প্রথম পরিচয় দেয়। তাহার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে চোপিন (Chopin) প্রভৃতির শক্ত শক্ত গৎ বেশ বাজাইতে পারিত। ইহার নাম Louise Lindgrin। সম্প্রতি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য পদেরেস্কি (Paderewski) এই শিশুর সঙ্গীত শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাকে তাঁহার আলোকচিত্র উপহার দেন্ এবং তাহার উপর লিখিয়া দেন "To the wonderful child, Laurene Lindgren."*

এতক্ষণ আমরা আজব সঙ্গীতজ্ঞের কথা বলিলাম। এইবার আমরা আজব গণিতজ্ঞের কথা বলিব। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের সংবাদপত্রে নৌমলিপস্কি (Naum Lipowsky) নামক একটী যুবকের অদ্ভুত গণনা-শক্তির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।† পাদটীকায় আমরা ঐ বিবরণ

---

* Laurene Louise Lindgren, child prodigy of Seattle. Washington. began her public career at the age of eleven months, when she played a simple little piece on an organ. By the time she was three, she could play Chopin and other difficult compositions. She was born in Everett, Washington, November 1st, 1920. Her parents are both musicians.

During Paderewski's recent visit to Seattle, this baby girl played her way into his heart. She played for him his minuet, and he listened, amazed, and presented her with his photograph, inscribed: "To the wonderful child, Laurene Lindgren, with thanks for having played my Minuet. I. J. Paderewski."

† An extraordinary faculty of remembering has been exhibited by Naum Lipowsky in giving evidence of his powers before Dr. Spearman, Professor of Mind and Logic, at the University of London.

Psychologists have been baffled by this young man's amazing brain. A list of figures, long enough to encircle an ordinary room, is memorised by Lipowsky, in one reading and he can repeat them backwards or forwards.

Should anyone ask him, for example, the cube of 63, he will answer without hesitation 250, 047. It is just as easy for him to find the root

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। লিপস্কির এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা যে কয়েক গজ লম্বা সংখ্যা সাজাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিলে, সে দৃষ্টি মাত্রে. চক্ষু বুজিয়া বাম হইতে এবং দক্ষিণ হইতে তাহার আবৃত্তি করিতে পারে। বড় বড় যোগ, বিয়োগ, ভাগ, গুণের সমষ্টি ফল মানসাঙ্কের দ্বারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারে। কোন্ বৎসরের কোন্ মাসের, কোন্ তারিখে কি বার হইবে বিনা গণনায় তাহা গণিয়া দিতে পারে এবং আরও আরও অদ্ভুত গণনার পরিচয় দিতে পারে। তাহার স্মৃতিশক্তি এমন প্রখর যে, সে দুইদিনের মধ্যে ইংরেজীর মত কঠিন ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছে। একটী বাঙ্গালী যুবক নিজের এই ধরণের গণনাশক্তির পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার নাম সোমেশচন্দ্র বসু। তিনি অঙ্ক

of a number. As an illustration, if anyone mentioned 456, 533, he would reply that it represents three "77's" multiplied.

But the most remarkable fact is his knowledge of days. He has every day of the Christian era carefully docketed in his mind. When asked on what day of the week May 1, fell in 1901, he replied accurately, "Wednesday." "Next year it will be on a Friday," he added.

"I never knew there was anything outstanding about my memory until I entered on a post-graduate course at Darmstadt Polytechnic," he told the *Daily Chronicle*. "There the professors discovered that, although I never seemed to be studying, I could never be found at fault in my lessons.

"I have been spending two days learning your language, and have in that time memorised 2,000 words. But whereas a Russian peasant gets along comfortably with a vocabulary of 1,000 words, there are in English some 700,000 words, and to read a newspaper you must know 8,000.

Lipowsky makes no secret of his great gift. Everything he remembers because things have been photographed by his mind, which retains a mental image of the incident. Long strings of words or figures are so photographed.

পাত না করিয়া ৬০ সংখ্যাকে ৬০ দিয়া গুণন করিতে পারেন। ভগ্নাংশ, কিউবরুট, স্কোয়াররুট এবং অন্যান্য কঠিন অঙ্ক অল্পক্ষণে অনায়াসে কসিয়া দেন। তিনি ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে তাঁহার অদ্ভুত গণনা-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইংলিসম্যান সংবাদপত্রে তাঁহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই

---

* Mr. Somesh Chandra Basu, who claims to be the world's greatest lightning calculator and memory wizard, has come back to India after displaying his powers abroad. In his boyhood, Mr Basu showed signs of a prodigious memory. At the age of eight, he could multiply 14 digits by 14 digits, without the help of paper and pencil. In his young manhood, he developed his memory-power to such an extent that he could multiply 60 digits by 60 digits mentally.

Mr. Basu can work out huge sums of square roots, cube roots, fifth, seventh to fifteenth root and also sums involving ugly equations, decimals or recurring decimals. By means of a process of his own, he can give the day of the week of a date in a year named at random. Success in mental calculation, Mr. Basu remarks, can be attained by virtue of concentration, good memory, swiftness, patience and accuracy. While figuring out problems, he sits silent, and while the calculation is in progress, an excited crowd might howl around him ; nothing can perturb his calculation. It is this perfect mental equipoise which forms the chief feature of his performance. The rows and columns of figures are engraved on his mind and he can refer back to them as if they were written on a sheet of paper.

Besides many private demonstrations in London, his exhibition of feats in the Y. M. C. A. Hall and the "Evening News" office elicited much admiration from the London journals, which dubbed him the greatest mathematical prodigy of the world.

In America, he displayed his demonstrations in the Horace Mann auditorium of Columbia University, the Cooper Math. Club, Mecca College of Chiropractice, and other places.

সোমেশচন্দ্র নৌম লপেক্ষি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। আমি নিজেও তাঁহার এই অদ্ভুত গণনা শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।*

এই যে সকল আজব মানুষ বা Prodigy-ইহাদের শক্তি যদি জন্মান্তরীন সংস্কারের ফল না হয়, তবে উহা কি? দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক যদি এই প্রতিভা-সমস্যার ও Prodigy-সমস্যার অন্যরূপে সমাধান করিতে পারেন, তবে করুন। যতদিন না পারিবেন, ততদিন আমরা কালিদাসের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিব, "প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্মবিদ্যাঃ।" কালিদাসের সেই বিখ্যাত শ্লোক পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ হইবে। কালিদাস বলিয়াছেন, যেমন শরৎকাল সমাগত হইলে হংসমালা স্বতঃই

The following is a table of his recorded achievements :—

In England.—Multiplication of 40 digits by 40 digits in 25 minutes; date calculations and other ugly sums.

In America.—Multiplication of 60 digits by 60 digits in 45 minu tes; Cube root of 18 digits in three seconds; fifth root of 16 digits in one second; seventh root of 21 digits in one second; seventh root of 25 digits in two seconds; seventh root of 35 digits in three seconds.

In Paris.—Q.: From 1873, 24th December to 26th of February, 1924, 10 a. m., how many seconds? This question was answered in 27 seconds.

* এ সম্বন্ধে Harmsworth's Popular Science, গ্রন্থে (Vol. VI p. 4192) এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

These children and youths—it is to be noted that their power usually disappears in later life—can perform, almost instantaneously, the most astonishing arithmetical feats. On enquiry it is found that they do not consciously calculate. The answer "comes into the mind" by inspiration. Of one of these remarkable persons, Mr. Bidder, it was said, "He had an almost miraculous power of seeing, as it were, intuitively, what factors would divide any large number, not a prime. Thus, if he were given the number 17 861, he would instantly remark it was 337 × 53. He could not, he said, explain how he did this; it seemed a natural instinct to him.

গঙ্গাজলে অবতরণ করে ; যেমন রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে ওষধি আপনা হইতে জ্যোতিঃ বিকীরণ করে ; সময় উপস্থিত হইলে সেইরূপ, প্রাক্তন জন্ম বিদ্যা. অর্থাৎ, জন্মান্তরীন শক্তি-সংস্কার জীবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব আমরা বলিতে চাই যে, এই মনীষা ও আজব শক্তির সম্বন্ধে যে সকল কথা উত্থাপন করিলাম তদ্দ্বারাও জন্মান্তরবাদ সমর্থিত হইতেছে।

কয়েক বৎসর হইতে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদেরা 'Multiple Personality'র সমস্যা লইয়া কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন। ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক পরীক্ষা-সমীক্ষা, অনেক আলোচনা-গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এক্ষেত্রে যদি এই জন্মান্তরবাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন, তবে বোধ হয়, তাঁহাদের এই গহন সমস্যার মধ্যে সমাধানের আলোকপাত হইতে পারিত। 'Multiple Personality' ব্যাপারটা কি ?

সময় সময় দেখা যায়, অভাবনীয় অচিন্তনীয় ভাবে (অনেকস্থলে বিনা কারণে) এক মানুষ হঠাৎ আর এক মানুষ হইয়া গেল। সে সহজ অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করিয়া রোজ যেরূপ করে, সেইরূপ একদিন কর্ম্মস্থানে গেল। অপরদিনের মত আপিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য বহির্গত হইল ; কিন্তু, পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল সে আর এক ব্যক্তি। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে হারাইয়া ফেলিল। কয়েকবৎসর তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, এবং অনেক দিন পরে তাহার বন্ধু বান্ধব যখন অনেক খোঁজা খুঁজি করিয়া তাহাকে বাহির করিলেন, তখন সে তাঁহাদিগকে আদৌ চিনিতে পারিল না। যাঁহারা এ শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন. ঐরূপ অনেক ঘটনা তাঁহাদের স্মরণে আসিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিওনী নাম্নী একটী অশিক্ষিতা রমণীকে লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেকগুলি

পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে নিদ্রাচ্ছন্ন করিলে (যাহাকে Hypnotise করা বলে), সে নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে হারাইয়া ফেলিত। হস্তসঞ্চালন (pass) বা স্ফটিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা ঐ রমণীকে trance দশাগ্রস্ত করিলে তাহার সংবিৎ সেই অর্দ্ধ-সমাধি অবস্থায় অন্য ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হইত। সেই স্বাপ্ন লিওনির হাব-ভাব জাগ্রৎ লিওনী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দেখা যাইত। লিওনির সমাধি গাঢ়তর হইলে, আর এক লিওনী প্রকাশিত হইত। সেই সৌপ্তিক লিওনী স্বাপ্ন লিওনী ও জাগ্রৎ লিওনী হইতে একেবারে বিভিন্ন ব্যক্তি। অতএব এক লিওনী তিন লিওনীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দিয়াছেন Multiple Personality বা বহুব্যক্তিত্বাগম। মায়ার সাহেবের Human Personality গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে।*

একজন কিরূপে বহুজন হইতে পারে, এ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের থিওরি (Theory) এই যে, কয়েক জন পূর্ব্ব পুরুষের বিরুদ্ধ প্রকৃতি বা স্বভাব পাশাপাশি রক্ষিত হইয়া, লিওনীর ন্যায় সন্ততিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই থিওরী কি যুক্তিসহ? প্রসিদ্ধ দার্শনিক জেমস্ সাহেব তাঁহার Varieties of Religious Experiences গ্রন্থে এই মত উল্লেখ করিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।†

---

* The famous case of Leonie I, II & III is well known; and it should be observed that Leonie I knew nothing of Leonie II & III; that Leonie II knew Leonie I but did not know Leonie III; that Leonie III, knew both Leonie I and II. That is, the higher knows the lower, while the lower does not know the higher—a most pregnant fact.—A Study in Consciousness. p. 23.

† Heterogeneous personality has been explained as the result of inheritance—the traits of character of in-compatible and antagonistic ancestors are supposed to be preserved alongside of each other. This explanation may pass for what it is worth—it certainly needs corroboration.—William James, Varieties of Religious Experiences, p. 169

এই সমস্যার সমাধানে আমরা জন্মান্তরের আশ্রয় লইতে চাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমাদের যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হয় না, আমাদের কারণ শরীরে, (কেহ কেহ বলেন, ভূত-সূক্ষ্মে বা permanent atomএ) উহার সংস্কার সঞ্চিত থাকে। সমর্থ কারণ উপস্থিত হইলে, ঐ সকল সংস্কার ব্যক্ত বা উদ্বুদ্ধ হয়। জীব প্রত্যেক জন্মে এক একটী ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণ করেন। নট যেমন রঙ্গস্থলে ভীম বা দুর্য্যোধন বা বৎসরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, জীব সেইরূপ ঐ ঐ ব্যক্তিত্বের (personalityর) 'মুখস' পরিধান করিয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অতএব, ইহা বিচিত্র নয় যে, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কোন অব্যক্ত সংস্কার-পুঞ্জ ইহ জন্মে সন্ধুক্ষিত হইয়া তাঁহাকে অন্য ব্যক্তিরূপে ব্যঞ্জিত করিবে। এই বিবিধ ব্যঞ্জনাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের Multiple Personality বা বহুব্যক্তিত্বাগম।

জন্মান্তরবাদের অনুকূলে আমরা নানাপ্রকার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপন্যাস করিলাম। এমনও প্রগাঢ় জড়বাদী আছেন যে, কোন যুক্তিবাণীই তাঁহার অবিশ্বাসের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভেদ করিতে পারে না। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন কোন কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। জন্মান্তরের কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? আগামী অধ্যায়ে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

নবম অধ্যায়

জন্মান্তর ও জাতিস্মর

আমরা দেখিয়াছি, প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। জন্মান্তরের স্বপক্ষে আমরা প্রথমতঃ বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রচুর 'আগম'-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তৎপরে জন্মান্তর সিদ্ধ করিবার জন্য প্রভূত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলাম—ঐ সকল যুক্তি জন্মান্তরের সাধক 'অনুমান'-প্রমাণ। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, জন্মান্তরের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কিনা? এ কথা আমরা অস্বীকার করি না যে, প্রত্যক্ষই প্রমাণের রাজা—সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ। জন্মান্তরের স্বপক্ষে কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কি?

আমি কয়েকবার দিল্লী গিয়া কুতবমিনার দর্শন করিয়াছি, অমৃতসরে গিয়া শিখমন্দির দর্শন করিয়াছি, কাশীতে গিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিয়াছি,—এ সকল আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা। ইহার জন্য কোন আগম-প্রমাণ, কোন যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না। আপত্তিকারীরা এই সকল নজির দেখাইয়া বলেন, 'জন্মান্তর যদি সত্য ঘটনা হইত, সত্য সত্যই যদি আমাদের পূর্ব্বজন্ম ঘটিয়া থাকিত, যদি একবার নয় অনেকবার আমরা এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিতাম, তবে কি পূর্ব্বজন্মের আমাদের স্মরণ থাকিত না? বহু চেষ্টা করিয়াও ত' আমরা পূর্ব্ব জীবনের বিবরণ উদ্ধার করিতে পারি না। যেমন শিশুকালের অনেক ঘটনা, যুবাকালের অনেক ব্যাপার, এই প্রৌঢ় বয়সেও আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে, পূর্ব্বজন্মের কোন কাহিনীই সেরূপ মুদ্রিত নাই কেন? স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন

করিয়া পূর্ব্বজন্মের কোন সংবাদই আমরা পাইনা কেন? ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, জন্মান্তর একটা কল্পনা মাত্র?' এ আপত্তি অসঙ্গত নহে। আমরা ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্ব জন্মের কথা যে আমাদের স্মরণ হয় না, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। সাধারণতঃ, আমাদের স্মৃতি মস্তিষ্কের সহিত বিজড়িত। যে মস্তিষ্ক লইয়া এ জন্মে আমি স্মৃতিশক্তির ব্যাপার সমাধা করিতেছি, সেই মস্তিষ্ক (Brain) এই জন্মে লব্ধ-সম্পত্তি। পূর্ব্বজন্মে যে মস্তিষ্ক লইয়া আমি জীবন-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতাম, মৃত্যুর সহিত সে মস্তিষ্ক ধ্বংস হইয়া গেল। যখন আমি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিলাম, তখন আমি 'দায়'রূপে সেই প্রাক্তন মস্তিষ্ক ত' প্রাপ্ত হইলাম না। তবে এ মস্তিষ্কের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের কাহিনী স্মরণ করিব কিরূপে?

আর ইহাও বক্তব্য যে, পূর্ব্বজন্মের ঘটনা সচরাচর আমাদের স্মরণে না থাকিলেও, তাহার সংস্কার অনেক স্থলে আমাদের মনে স্পষ্ট ক্রিয়া করে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা যে Prodigy বা 'আজব' শিশুদের কথা বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ঐরূপ সংস্কার অতিশয় স্ফূর্ত্ত। এমন সকল শিশু দেখা গিয়াছে, যাহারা বিনা শিক্ষায় অদ্ভুত সঙ্গীতজ্ঞ, অশেষ গণিতজ্ঞ, অপূর্ব্ব স্বভাব-কবি। তাহারা ত ইহজন্মে এ সকল বিদ্যার চর্চ্চা করে নাই—তবে তাহা পাইল কোথা হইতে? জন্মান্তরের সংস্কার হইতে। কখন কখন দেখা যায়, দুইজন মানুষের মধ্যে প্রথম মিলনেই সখ্য বা শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে তাহাদের কোন দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই—এই প্রথম সাক্ষাৎ, অথচ, অকারণ অহৈতুক ঐরূপ সখ্য বা শত্রুতা ফুটিয়া উঠিল। ইহাও পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত সংস্কারের উদ্বোধনের ফল। জন্মান্তরের স্বপক্ষে এ সকল ঘটনাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

আর এক কথা। সত্য বটে, সাধারণতঃ পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয় না। কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল নহে যে, জন্মান্তরের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও—বিশেষতঃ শিশুদিগের স্মরণে ফুটিয়া উঠে। কিছুদিন পূর্ব্বে একটী মার্কিন মহিলা কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতাস্থ তত্ত্ব-সভাগৃহে জন্মান্তর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের যে অংশে তাঁহার নিবাস, সেই পল্লীস্থ একটী বালিকার কাহিনী উল্লেখ করেন। ঐ বালিকা সর্ব্বদাই নিজের জননীকে বলিত, 'তুমি ত' আমার মা, কিন্তু আমার অন্য মা কই? you are my mother, where is my other mother?' তাহার মাতা ইহাতে কোন মনোযোগ দিতেন না। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি প্রায় দুই শত মাইল দূরস্থ একটী মহিলা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কন্যাটী তাঁহার সঙ্গে ছিল। বালিকা তাহার পূর্ব্বজন্মের জননী সেই অপরিচিত মহিলাকে দেখিবামাত্র তাঁহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং বলিয়া উঠিল, 'এই যে আমার মা, এই যে আমার মা।' পরে সে সেই পূর্ব্ব-জন্মের মাতার বাড়ীর কোন্ ঘরে তাহার কি জিনিষ বা খেলানা ছিল, তাহা বলিতে আরম্ভ করিল। ঐ মহিলাবন্ধু তাঁহার মৃতকন্যার যে সকল দ্রব্য স্থানান্তরিত করেন নাই, সে সকল দ্রব্য বালিকার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাওয়া গেল।

এইরূপ আর একটা ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বরের সন্নিহিত আলাটী জঙ্গলপাড়া গ্রামে সংঘটিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সরকারী দপ্তরের জনৈক কর্ম্মচারী অমরকুমার মিত্র মহাশয় ইহার বিবরণ আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ বিবরণ পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিলাম।*

* My maternal uncle's house is situated in village Alati-Jungle-Para, near Tarkeshwar, District Hoogly. My maternal uncle Babu

পাঠক দেখিবেন, যে বালিকাটীর কথা অমরবাবু উল্লেখ করিতেছেন, সেও শৈশবে পূর্ব্বজন্মের কয়েকটা ব্যাপার স্মরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মে সে একটী ভদ্রলোকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং ছয় বৎসর বয়সের সময় মারা গিয়াছিল। মৃত্যুর ৭ বৎসর পরে সে আবার তাঁহারই কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার যখন ৪ বৎসর বয়স, তখন সে পূর্ব্ব-জন্ম-দৃষ্ট একটী কূপের কথা সর্ব্বদাই বলিত; ঐ কূপ তাহার জন্মের পূর্ব্বেই বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার কোন চিহ্ন ছিল না। তথাপি সে সেই কূপের পূর্ব্বসংস্থান ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

Jogendra Nath Ghosh who was a supervisor of P. W. Department, Railways, spent the best portion of his service on railway construction work in different parts of India, Beluchistan. Kabul and Burma. About 34 years ago he had an only daughter. My aunt and this daughter with other family members lived in the above village, while my maternal uncle was abroad in the service. Unfortunately this daughter died at the age of 6 years. This caused a great shock to my aunt. My uncle returned home 6 years after this sad occurrence. A year later a second female child was born to them. This child almost resembled the former.

When her age was between four and five, she began to speak of past things which had existed in the house during the life-time of her departed sister.

(1) There was a well in the court-yard of the house where the first girl accompanied her mother many a time and oft. Shortly after her death this well was filled in and no trace of it was left. The second daughter on completing her fourth year of age often asked her mother and other family members about this well. She pointed out to everybody's surprise the very spot where the well had existed before. The story does not end here.

(2) The first girl had a toy-box containing some pretty dolls arranged by herself. After her death her mother took care to preserve the box undisturbed in loving memory of her daughter. On a certain occasion, another lady of the house gave away two out of these dolls to a neigh-

প্রথমা কন্যার মৃত্যু হইলে, জননী তাহার খেলানাগুলি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার এক আত্মীয়া ঐ খেলানা হইতে দুইটী পুতুল নিয়া অপরকে দিয়াছিল। তিনি তাহা

bour's child without my aunt's knowledge. When the second girl attained her fifth year of age, her mother gave her this toy-box to play with, and the girl opening the box began to take out and re-arrange the dolls. A few minutes later, she questioned her mother as to who had removed two dolls out of the box. The mother was perplexed and surprised and on questioning the other members of the house she came to learn that the missing dolls had been removed by another member of the house without her knowledge and consent.

(3) The third prominent incident of her life was in connection with a maid-servant of the house who during the first daughter's life-time was called by every body বোদের মা (Baidyanath's mother). The cottage of this maid-servant was situated close to my aunt's house. Baidyanath died under the eyes of the first girl and for some days afterwards she accompanied her mother to the maid-servant's house on the sympathetic mission of solacing the poor woman. Shortly afterwards the maid servant left the village in agony, her cottage fell into ruin, and she was thought of no more. My aunt's second daughter on attaining her fifth year of age began to ask her questions about "বোদের মা"—Baidyanath's mother. This reminded her of her former daughter and her former maid-servant too. In order to test the second daughter's memory, she replied to her that there was no one in the house by the name of "বোদের মা"—Baidyanath's mother. The girl retorted that there was the woman who always wept and cried "বোদেরে" বোদেরে !! Oh Baidyanath, Oh Baidyanath !! and she urged her mother to show her বোদের মার—Baidyanath's mother's house. The mother and several other members of the family out of strong curiosity took her out of the house and followed her wherever she went. The girl took the way leading to the maid-servant's former cottage, and on reaching near the place she at once cried out and spontaneously pointed out the exact site where Baidyanath had lived with his mother. The above three main incidents in the girl's life and several of her minor babblings in her early life convinced the family members beyond all doubt that she

জানিতেন না। পরে ঐ দ্বিতীয়া কন্যার যখন ৫ বৎসর বয়স হইল, জননী তাহাকে সেই পুতুলের বাক্সটী দিলেন। কিছুক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া সে বলিল, 'এটা আমার, এটী আমার, কিন্তু আমার আর দুটী পুতুল কোথায় গেল?' মাতা বিস্মিতা হইয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, তাঁহার এক আত্মীয়া পুতুল দুইটী বিলাইয়া দিয়াছেন।

ঐ প্রথমা কন্যার একজন ঝি ছিল—তাহার নাম "বদের মা"। ঐ বৈদ্যনাথ মারা গেলে ঐ ঝি 'বদে বদে' বলিয়া প্রায়ই কাঁদিত। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কর্ত্রীঠাকুরাণী তাঁহার প্রথমা কন্যাকে লইয়া কয়েকবার নিকট গ্রামস্থ বদের মায়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বদের মা মরিয়া যায় এবং তাহার কুটীরটি ভূমিসাৎ হয়। এই দ্বিতীয়া কন্যা ছয়-বৎসরে পদার্পণ করিয়া প্রায়ই 'বেদের মা'র কথা জিজ্ঞাসা করিত। বলিত, তাহার বেশ মনে পড়িতেছে ঐ ঝি "বদে রে বদে রে" বলিয়া কাঁদিত, এবং বদের মা'র ভিঠা দেখিবার জন্য জেদ্ করিত। তাহার পীড়াপীড়িতে আত্মীয়েরা তাহাকে একদিন বদের মা'র ভিটার নিকটে লইয়া গেলেন। তাহাকে কিছু বলিতে হইল না, মেয়েটী আগু বাড়াইয়া ঠিক বদের মার ভিটা যেখানে ছিল সেখানে উপস্থিত হইল এবং বলিয়া উঠিল, 'এখানে বদের মা বাস করিত।'

এই সকল ঘটনাকে জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে কি অসঙ্গত হয়? তবে আমরা স্বীকার করি যে, এ সকল প্রমাণ খুব সবল নহে।

was the first girl re-born with a partial memory of her past life. But one peculiarity noticeable was that from the sixth year of her age onwards she never spoke of the incidents of her past life.

This girl is still alive and is the wife of Babu * * B. L. Pleader, Judge's Court, Burdwan, and a member of the Legislative Assembly of India.

যদি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আমাদের চিত্তপটে স্পষ্টভাবে ফুটাইতে পারা যাইত, তবেই জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রবল হইতে পারিত। এরূপ করিবার কোন উপায় আছে কি?

গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

'হে অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু বহু পূর্ব্বজন্ম ব্যতীত হইয়াছে। আমি সে সমস্তগুলি জানি, কিন্তু তুমি জান না'। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে প্রদর্শিত হইল যে, কেবল যে মানুষের অনেকবার জন্ম হয়, তাহা নহে, কেহ কেহ আবার সেই সকল জন্মের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে পারেন। যাঁহারা এইরূপে পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এ দেশে "জাতিস্মর" বলে। এখানে 'জাতি' অর্থে 'জাত' নহে, 'জাতি' অর্থে 'জন্ম'। অর্থাৎ, যাহার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ আছে, সেই জাতিস্মর।

এইরূপ বৌদ্ধদিগের জাতক গ্রন্থে, ভগবান্ বুদ্ধদেবের অনুভূত পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতির অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। উপদেশ প্রসঙ্গে প্রায়ই বুদ্ধদেব শিষ্যমণ্ডলীকে বলিতেছেন,—'পূর্ব্বে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে যখন আমি 'অমুক' ছিলাম, তখন এই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।' 'পূর্ব্বে তক্ষশিলায় যখন 'অমুক' ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহকারী হইয়া এই এই রূপ করিয়াছিলাম এবং এই সারিপুত্র আমার সহচর ছিল।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। পাতঞ্জল দর্শনের প্রাচীন ব্যাস-ভাষ্যে ভগবান্ জৈগীষব্যের একটী কাহিনী উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ভগবতো জৈগীষব্যস্য সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রমম্ অনুপশ্যতো বিবেকজজ্ঞানং প্রাদুরভূৎ।"

এই তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষির দশকল্পের মধ্যে তিনি যতবার যত যোনিতে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত জন্মের বিবরণ স্মৃতিপটে মুদ্রিত ছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির ন্যায় তিনিও একজন জাতিস্মর ছিলেন। যেমন এ জীবনের ঘটনাবলী অনেকাংশে আমাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত আছে এবং চেষ্টা করিলে আমরা তাহা স্মরণ করিতে পারি, যাঁহারা জাতিস্মর, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলীও সেইরূপ অনায়াসেই স্মরণ করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে জন্মান্তর প্রত্যক্ষসিদ্ধ – যুক্তি তর্ক বা আপ্তবাক্যের উপর তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে নির্ভর করিতে হয় না। এই প্রৌঢ় দশায় আমার বাল্য, কৈশোর, যৌবন যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, জাতিস্মরের কাছে জন্মান্তরও তেমনি প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

জাতিস্মর হওয়া যায় কি না? যদি হওয়া যায়, কি উপায়ে হওয়া যায়?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'থিয়সফিষ্ট' পত্রে "Rents in the veil of time" এই নাম দিয়া কয়েকটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ঐ সকল প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে কয়েকজন ব্যক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। সেই সেই ব্যক্তি কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে, কাহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কি ভাবে জীবন নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, জন্মের পর জন্ম ধরিয়া এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না বিশেষতঃ, যাঁহারা যোগসিদ্ধির দ্বারা জাতিস্মর হওয়ার কথা প্রলাপ বাক্য মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ঐ নবীন জাতকমালা পাঠ করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন—'পূর্ব্বজন্ম নাকি আছে? যদিই বা থাকে, তাহা নাকি আবার স্মরণ করা যায়!' এই সকল অবিশ্বাসীকে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজের একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিই। কথাটী লজের 'Survival of Man' গ্রন্থের ২৮২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত—

"Objects āppear to serve as attractive influences or nucleii from which information may be clairvoyantly gained. It appears as if we left traces of ourselves, not only on our bodies, but with many other things with which we were subordinately associated, and these traces can thereafter be detected by a sufficiently sensitive person."

সার অলিভার লজের এই উক্তিটীর প্রতি পাঠককে প্রণিধান করিতে বলি। লজ বলিতেছেন, আমাদের দেহের সহিত যে সকল বস্তুর সংযোগ বা সম্বন্ধ ঘটে, (যেমন হাতের আংটী, চোখের চসমা, মাথার চুল ইত্যাদি) সেই সকল বস্তুতেই আমাদের কৃতকার্য্যের trace বা সংস্কার রক্ষিত থাকে এবং যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি আছে, অর্থাৎ, যাঁহারা sufficiently sensitive বা Clairvoyant, যাহাদিগের অনুভবশক্তি সাধারণের অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, তাঁহারা সেই সকল সংস্কারের সাহায্যে—যাহার সংস্কার, তাহার বিষয় জানিতে পারেন। এ কথাটা যদি অমূলক না হয়, তবে জাতিস্মর হইবার কৌশল কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এ কৌশল ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে অনেক দিন হইল বিবৃত করিয়াছেন—

সংস্কার সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্—৩।১৮

ইহার ব্যাসভাষ্যে বলিতেছেন—

তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতি-সংবেদনম্।

অর্থাৎ, এইরূপে নিজের সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে, যোগী পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত হন এবং অপরের সংস্কার সাক্ষাৎ করিলে, অপরেরও পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান লাভ করেন। অর্থাৎ, জাতিস্মর হইবার উপায়—সংস্কার-সাক্ষাৎকার।

এই সংস্কারের বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের ভাষায় সংস্কারের নাম 'Memory-picture'।

স্বচ্ছ অপরাহ্নে যখন সূর্য্যদেব জবাকুসুম-সঙ্কাশ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন, তখন সেই মূর্ত্তির প্রতি কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, পরে ধবল দেওয়ালের উপর দৃষ্টিপাত করিলে, সেই সূর্য্যের একটী প্রতিমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা, বোধ হয়, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেন এইরূপ হয়? ধবল দেওয়ালের উপর সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ত অঙ্কিত নাই, তবে সে মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি কেন? সংস্কারের ফলে। পশ্চিম গগনে যে সূর্য্যের ছবি আমাদের চক্ষুর উপর প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার সংস্কার আমাদের চক্ষুতে রক্ষিত ছিল। ধবল দেওয়ালে যখন সেই চক্ষু নিবদ্ধ করিলাম, তখন সেই রক্ষিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি নূতন সূর্য্যমূর্ত্তি গঠিত করিল। তন্ত্রের গ্রন্থে যাহাকে কালপুরুষ দর্শন বলে উহাও ইহার সমজাতীয় ব্যাপার। জ্যোৎস্নাবিধৌত-রজনীতে ছাদে উঠিয়া চন্দ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যদি আমরা নিজের ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং কিছুক্ষণ পরে ছায়া হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া যদি ঐ দৃষ্টি আকাশের গায়ে নিবদ্ধ করি, তবে আকাশের গায়ে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা আর কিছু নহে—ঐ ছায়া দর্শনের সময় চক্ষের পরদায় (Retinaতে) মনুষ্য ছায়ার যে মূর্ত্তির সংস্কার (impression) সঞ্চিত হইয়াছিল, সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া, ঐ স্থলে আকাশে প্রতিমূর্ত্তি সৃজন করে। এইরূপ আমরা যাহা কিছু দর্শন করি, শ্রবণ করি, স্পর্শন করি, আঘ্রাণ করি বা আস্বাদন করি, সেই সেই ইন্দ্রিয়ে, অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র মস্তিষ্কে, তাহার সংস্কার (impressions বা vestiges) রক্ষিত থাকে। যখন ঘটনাক্রমে সেই সেই সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তখন সেই সেই পূর্ব্বে দৃষ্ট, শ্রুত, ইত্যাদি ঘটনার স্মরণ হয়। বলা বাহুল্য যে, আমাদের চিত্তে যে সকল

বাসনা, কামনা, ভাবনা, চিন্তা প্রভৃতি মনোবৃত্তির অনুভূতি হয়, তাহাদের সংস্কারও ঐরূপে সঞ্চিত থাকে, এবং উপযুক্ত কারণ ঘটিলে, তাহাদেরও স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিত্য ব্যাপার। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কেবল যে মনে, মস্তিষ্কে বা ইন্দ্রিয়েই তত্তৎসংসৃষ্ট বিষয়ের সংস্কার নিহিত থাকে, তাহা নহে, যাহাকে আমরা প্রাণহীন বা জড় পদার্থ বলি, তাহাদের মধ্যেও ঐরূপ সংস্কার সংরক্ষিত হয়। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক-প্রবর ডাক্তার ড্রেপার তাঁহার সুবিখ্যাত 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থের * এক স্থলে লিখিয়াছেন—'দেওয়ালে কোন দিন কোন ছায়াই নিপতিত হয় নাই—যাহার সংস্কার চিরদিনের জন্য (Permanent trace) ঐ দেওয়ালে না রক্ষিত আছে। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে ঐ সূক্ষ্ম সংস্কার সকলেরই গোচর হইতে পারে।' এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ডাক্তার ড্রেপার একটি সহজ পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। একখানা নূতন ক্ষুরের মুখের উপর যদি একখণ্ড গালা (water) স্থাপিত করিয়া তাহার উপর ফুঁ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই গালার মূর্ত্তির সংস্কার সেই ক্ষুরের গাত্রে মুদ্রিত হইয়া যায়। তাহার প্রমাণ এই যে, গালা উঠাইয়া লইয়া কতকক্ষণ পরে ঐ ক্ষুরের উপর আবার ফুঁ দিলে ঐ গালার মূর্ত্তি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যদি ক্ষুরখানিকে মরিচা হইতে সযত্নে রক্ষা করা যায়, তবে কয়েক মাস পরেও ফুৎকার দ্বারা ঐ ক্ষুর হইতে সেই গালার মূর্ত্তির পুনরুদ্ধার করা যায়। সেই জন্য ডাক্তার ড্রেপার বলিয়াছেন—'লোকচক্ষুর অন্তরালে, আমাদের সুগুপ্ত মন্ত্রণা-গৃহে আমরা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, যে যে বাক্যের

* Dr. Draper's Conflict between Religion & Science (International Science Series). এই গ্রন্থের ১৭০টি সংস্করণ হইয়াছে।

উচ্চারণ করি, সে সমস্তের সংস্কার (traces বা vestiges) সেই প্রকোষ্ঠের ভিত্তি-গাত্রে মুদ্রিত রহিয়া যায়।' কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু 'Memory Images' (স্মৃতির ছবি) সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, সুধু যে প্রাণীদিগের স্নায়ু বা পেশীতেই ঐরূপ সংস্কার সঞ্চিত থাকে, তাহা নহে; কিন্তু উদ্ভিদ্, এমন কি, ধাতব পদার্থও সংস্কারবিহীন নহে এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে ঐ ঐ সংস্কারও উদ্বুদ্ধ করা যায়। ইহাই ঔদ্ভিদ বা ধাতব স্মৃতি (Memory)।

কয়েক বৎসর হইতে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় সাইকোমেট্রি (Psychometry) নামক এক নূতন বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে। সাইকোমেট্রি অর্থে বস্তু-নিহিত সংস্কারের ধ্যান-লব্ধ উদ্বোধন (Recovery of memory pictures from objects)। উপরে যে সংস্কারের উল্লেখ করা গেল, বস্তুনিবদ্ধ সেই সংস্কার-সমূহের (traces বা vestiges) উদ্বোধনের উপরই ঐ সাইকোমেট্রি (Psychmoetry) বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত।

পাশ্চাত্যদেশে অধ্যাপক বুকেনানই (J. R. Buchanan) প্রথমতঃ এই বিদ্যার প্রচার করেন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন, কোন কোন মানুষের মধ্যে এরূপ শক্তি আছে যে, তাহারা বস্তু-নিহিত ঐ সকল সংস্কারের সাক্ষাৎকার করিতে পারে। তিনি ঐ শক্তির নাম-করণ করেন—সাইকোমেট্রি।* এই শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি

---

* The faculty is called by its discoverer Professor B. Buchanan—Psychometry. To him the world is indebted for this most important addition to the Psychological sciences; and to him, perhaps, when scepticism is found felled to the ground by accumulation of facts, posterity will have to erect a statue. The existence of this faculty was first experimentally demonstrated in 1841. It has since been verified by a thousand Psychometers in different parts of the world.—Isis Unveiled vol. I. p. 182.

যদি আমার এক গুচ্ছ কেশ পায়, অথবা আমার ব্যবহৃত আংটী, ঘড়ি, চশমা প্রভৃতি কোন বস্তু পায়, তবে সেই বস্তু বা কেশ তাহার ভ্রূমধ্যে বা ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর সংস্থাপিত করিলে, সে আমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে এবং সেই বস্তুর সন্নিকটে আমি যদি কোন বক্তৃতা করিয়া বা কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি, তবে সে সেই বাক্য ও কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে। ইহার নিদান কি? নিদান আর কিছু নহে; নিদান এই যে, প্রত্যেক বস্তু তাহার সমীপস্থ ঘটনার সংস্কার রক্ষা করিতে সমর্থ।† দর্পণে আমার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সে প্রতিবিম্ব দর্পণে সংস্কাররূপে চিরদিন অঙ্কিত থাকে। আমার কেশ বা আমার আংটী যখন আমার নিকটে রহিয়াছে, তখন ইহারা ক্যামেরাস্থ প্লেটের ন্যায় প্রতিনিয়ত আমার ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিতেছে এবং ফনোগ্রাফে যেরূপ আমার উচ্চারিত শব্দ বা কথাবার্ত্তা রক্ষা করা যায়, সেইরূপ ঐ কেশ বা আংটী আমার কথাগুলি শুনিয়া রক্ষা করিতেছে। কেশ বা আংটী সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, প্রত্যেক ভৌতিক বা জৈবিক পদার্থ সম্বন্ধে ঐ

† এ সম্বন্ধে অধ্যাপক হিচ্‌কক কয়েকটি কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। "It seems," says Professor Hitchcock, speaking of the influences of light upon bodies and of the formation of pictures upon them by means of it, "that this photographic influence pervades all nature; nor can we say where it stops. We do not know, but it may imprint upon the world around us our features, as they are modified by various passions, and thus fill nature with daguerreotype impressions of all our actions;...it may be, too, that there are tests by which nature, more skilful than any photographist, can bring out and fix these portraits, so that acuter senses than ours shall see them as on a great canvas, spread over the material universe. Perhaps, too, they may never fade from that canvas but become specimens in the great picture gallery of eternity."—Psychometry & Thought Transference by N. C. F. T. S p. 7

কথা বলা যায়। অর্থাৎ, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুই একাধারে ফটোগ্রাফ ও ফনোগ্রাফ। ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিকটস্থ ঘটনার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ এবং তাহার মূর্ত্তির ও ধ্বনির প্রতিকৃতি (picture) রক্ষা করিতে পটু। ফটোগ্রাফ এবং ফনোগ্রাফে যেরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই রক্ষিত প্রতিকৃতির পুনরুদ্ধার (reproduction) সাধিত হয়, সাইকোমেট্রি-শক্তিশালী ব্যক্তি ঐ শক্তিবলে সেইরূপ বস্তুনিবদ্ধ মূর্ত্তির বা ধ্বনির সংস্কাররূপী প্রতিকৃতির উদ্বোধন করিয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এ সম্বন্ধে মহাজ্ঞানী স্যার অলিভার লজের উক্তি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে—'পার্থিব বস্তুতে ঘটনার যে সংস্কার নিহিত থাকে, দিব্য-দৃষ্টিবলে তাহার সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাহাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি প্রখর, ঐরূপ ব্যক্তিরা ঐ সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ করিয়া সেই সকল ঘটনার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন।'

এই সাইকোমেট্রি শক্তির দুই একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বিশদ হইতে পারে। একবার এক ভ্রমণকারী মিশর দেশস্থ 'মাম্মী' শবদেহ হইতে এক টুক্‌রা কাপড় আনিয়াছিলেন। তিনি কাগজে জড়াইয়া ঐ বস্ত্রখণ্ড সাইকোমেট্রি-শক্তি-সম্পন্ন এক বন্ধুর হস্তে দেন। কাগজে কি জড়ান ছিল, বন্ধু তাহা জানিতেন না; তিনি উহা নিজের কপালের উপর রাখিলে, মিশর দেশের ছবি তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, একটি প্রাচীন নগর, সেই নগরের ধার দিয়া একটি নদী প্রবাহিত। সেই নদীতে একজন নৌকারোহণে যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে সেই নৌকা তীরে লাগাইয়া সে ব্যক্তি একটি বনে প্রবেশ করিল এবং একটি আইবিস (ibis) পক্ষী শিকার করিয়া লইয়া সেই নগরে ফিরিয়া গেল। যে শবদেহ হইতে ঐ বস্ত্রখণ্ড গৃহীত হইয়াছিল, সেই শবদেহের বক্ষের উপর এইরূপ একটি আইবিস পক্ষী রক্ষিত ছিল। অতএব দেখা

যাইতেছে, ঐ জড় বস্ত্রখণ্ড আইবিস পক্ষীর এবং পক্ষীর স্বামীর প্রতিকৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্ততঃ দুই তিন সহস্র বৎসর রক্ষা করিয়া আসিতেছিল এবং এত দিন পরে সাইকোমেট্রি-শক্তিবলে একজন তাহার উদ্ধারসাধন করিলেন।*

জড়বস্তু হইতে সাইকোমেট্রি-শক্তিবলে তন্নিহিত সংস্কার উদ্বোধনের আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা লেড্‌বিটার সাহেব-কৃত 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিতেছেন—"একবার 'ষ্টোন হেঞ্জ' (Stone-henge) প্রস্তর স্তূপ হইতে আমি অতি ক্ষুদ্র এক প্রস্তর-কণা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একটি খামে পূরিয়া সাইকোমেট্রি-শক্তিশালিনী এক রমণীর হস্তে অর্পণ করি। সে জানিত না, খামের মধ্যে কি আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই রমণী ষ্টোনহেঞ্জের স্তূপের এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশের যথাযথ বর্ণনা করিতে লাগিল, এবং ঐ স্তূপের সমীপে পুরাকালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহারও বিবরণ বলিতে লাগিল। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই ক্ষুদ্র প্রস্তর-কণার সাহায্যে সেই রমণী তৎসংসৃষ্ট সমস্ত ব্যাপারের চিত্র মানসনেত্রে দেখিতে পাইল।" †

* I received from a friend in the year 1882 a piece of the linen wrapping of an Egyptian. It was found on the breast of a mummy. I handed it wrapped up in tissue paper to a friend who did not know what, if any thing, was in the paper. He put it to his forehead and soon began to describe Egyptian scenery ; then an ancient city ; from that he went on to describe a man in Egyptian clothes sailing on a river ; then this man went ashore into a grove where he killed a bird ; then that the bird looked like pictures of the ibis. and ended by describing the man as returning with the bird to the city, the description of which tallies with the pictures and descriptions of ancient Egyptian cities.—Quoted from an article on Psychometry by W. Q. Judge in the Platonist.

† For example, I once brought from Stonehenge a tiny fragment

সাইকোমেট্রি শক্তিবলে যে কেবল অতীত ঘটনা দৃষ্টিগোচর করা যায়, তাহা নহে, অতীত বাণী বা বার্ত্তাও শ্রুতিগোচর হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকায় ঐরূপ এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সিসিলি দ্বীপে টাওরমিনা নামে যে পল্লী আছে, ঐ স্থানে গ্রীক্-গুরু পিথাগোরস্-স্থাপিত অধ্যাত্ম-আশ্রমের প্রস্তর-ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ অট্টালিকার প্রাঙ্গণে গ্রীক্-গুরু তাঁহার শিষ্যবর্গকে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন, প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে সাইকোমেট্রি-শক্তিশালী কোন ব্যক্তি ঐ সকল উপদেশের প্রতিধ্বনি প্রস্তরস্তূপে নিহিত সংস্কারের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে এই ধরণের একটি ঘটনা তাঁহার জনৈক শিষ্যকর্ত্তৃক সংকলিত 'সদ্‌গুরু-প্রসঙ্গে' নিবদ্ধ হইয়াছে। গোঁসাইজি একবার শান্তিপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত অদ্বৈতপ্রভুর ভগ্ন ভিটা দর্শনে গমন করেন। সেখানে তিনি সংকীর্ত্তনের স্পষ্ট ধ্বনি শুনিতে পান। সকলেরই মনে হইল, কোন সংকীর্ত্তনের দল আসিতেছে, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। ইহাও ঐ সাইকোমেট্রি। অদ্বৈতপ্রভুর আমলে যে সংকীর্ত্তনের সংস্কার ইষ্টকস্তূপে নিহিত ছিল, তাহাই উদ্বুদ্ধ হইয়া গোঁসাইজির শ্রুতিগোচর হইল।

of stone, not larger than a pin's head, and on putting this into an envelope and handing it to a psychometer, who had no idea what it was, she at once began to describe that wonderful ruin, and the desolate country surrounding it, and then went on to picture vividly what were evidently scenes from its early history, showing that that infinitesimal fragment had been sufficient to put her into communication with the records connected with the spot from which it came.—C. W. Leadbeater's Clairvoyance. p. 103.

ঐ সাইকোমেট্রি-ব্যাপার লক্ষ্য করিলে জাতিস্মর হওয়ার প্রণালী বুঝিতে পারা যায়। এখন পতঞ্জলির সূত্রটি একবার স্মরণ করুন। "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" 'সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়।' এ সংস্কার কারণ-শরীরে রক্ষিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত ভাবনা (Thoughts), বাসনা (Desires) ও চেষ্টার (Actions) সংস্কার। জড়বস্তুতে যেমন তৎসমীপস্থ সমস্ত ঘটনার ছবি মুদ্রিত থাকে, আমাদের কারণ-শরীরে সেইরূপ আমাদের ইহজন্মের ও পূর্ব্বজন্মের সমস্ত সংকল্প ও অনুষ্ঠানের—সমস্ত চিন্তা, সমস্ত বাসনা, সমস্ত চেষ্টার প্রতিকৃতি সংস্কাররূপে রক্ষিত থাকে। আমরা প্রত্যেকে জন্মজন্মান্তরে যে কিছু ভাবনা ভাবিয়াছি, যে কিছু কামনা পোষণ করিয়াছি, যে কিছু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছি, সে সমস্তের সংস্কার আমাদের ঐ কারণ-শরীরে রক্ষিত হইয়াছে। এই কারণ-শরীর কল্পান্তস্থায়ী। ১০০ জন্ম পূর্ব্বে আমার যে কারণ-শরীর ছিল, এ জন্মেও আমার সেই কারণ-শরীরই রহিয়াছে। মৃত্যুতে আমার এই স্থূল শরীর নষ্ট হইবে, পরে কামলোকে অবস্থানের পর আমার সূক্ষ্ম শরীরও ধ্বংস হইবে, কিন্তু আমার কারণ শরীরের ধ্বংস নাই; জন্মান্তরে আমি যখন নূতন দেহ গ্রহণ করিব, আমার চিরসঙ্গী কারণ-শরীর তখন সেই দেহের সহিত সংযুক্ত হইবে, এবং ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যত দিন না আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিয়া সমস্ত শরীর নির্ম্মূল করতঃ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইব। হিন্দুদার্শনিকেরা বলেন যে, এই কারণ শরীরেই প্রত্যেকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার সমূহ নিহিত থাকে *

* কেহ কেহ বলেন, কারণ-শরীরে নহে, আমাদের জীবাত্মার সহিত সংবদ্ধ যে স্থায়ী অণুত্রয় আছে, সেই অণুত্রয়ে ঐ সমস্ত সংস্কার রক্ষিত থাকে; এই অণুত্রয়কে থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে 'Permanent Atoms' বলে। প্রাচীন শাস্ত্রে ইহাদিগের নাম, ভূতসূক্ষ্ম।

এবং যোগবলে সংস্কারের সেই সাক্ষাৎকার করিলেই পূর্ব্বজন্মের স্মরণ হয়।

সাইকোমেট্রি-শক্তিবলে এরূপ হওয়া বিচিত্র কি? যখন জড়বস্তুতে নিহিত সংস্কার (impressions বা vestiges)-সাহায্যে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অতীতযুগে সংঘটিত ঘটনার ছবি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন, তখন যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যে, যোগবলে কারণ-শরীরে রক্ষিত সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করতঃ নিজের বা অপরের পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া জাতিস্মর হইবেন, ইহাতে অসম্ভব কি? অতএব, জাতিস্মর হওয়া অলীক কল্পনা নহে —ইহা সত্য এবং সম্ভবপর। সাধন বলে সকলেই নিজের সাইকোমেট্রি-শক্তি প্রবুদ্ধ করিয়া কারণ-শরীর-নিহিত সংস্কার সাক্ষাৎ করিতে পারে এবং তাহার ফলে জাতিস্মর হইয়া জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করিতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সাইকোমেট্রি (Psychometry) যখন দিব্যদৃষ্টি বা Clairvoyanceএর সত্যতার উপর নির্ভর করিতেছে, তখন দিব্যদৃষ্টির সত্য ও সম্ভব কিনা অগ্রে তাহা স্থির হওয়া উচিত। দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নহে। তবে পাঠকের পাছে ধারণা হয় যে, উহা অসম্ভব ব্যাপার, সেই জন্য দিব্যদৃষ্টির কয়েকটী প্রামাণিক ঘটনার আমরা এখানে উল্লেখ করিব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের Daily Mail সংবাদপত্রে দিব্যদৃষ্টির একটা অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার বিবরণ এই। জাপানে ওকায়ামা নগরে একটী ষোল বৎসরের বালক দিব্যদৃষ্টি বলে পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়া তাহার সহাধ্যায়ীদিগকে বলিয়া দিয়াছিল। ফলে সে এবং তাহার সহযোগী সমস্ত ছাত্রই পূর্ব্ব হইতে প্রশ্নের উত্তরগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়া পরীক্ষাকালে 'ফুল নম্বর' পাইয়াছিল। * বিধাতার

---

* A new problem for school-masters is reported from Okayama,

ইচ্ছায় এই শক্তি ছাত্রমহলে সঞ্চারিত হইলে, আধুনিক পরীক্ষা-বিভীষিকা বিদূরিত হইতে পারে। ইহা আকস্মিক ও স্বাভাবিক দিব্যদৃষ্টি। কারণ, যতদূর জানা যায়, ঐ বালক কোনরূপ সাধনার বলে বা কোন ব্যাধির ফলে ঐরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে নাই। সম্ভবতঃ, ঐরূপ দৃষ্টি তাহার সহজাতও নহে এবং চিরস্থায়ীও হইবে না। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, হিষ্টিরিয়া-ব্যাধিগ্রস্ত রোগী সাময়িক ভাবে এইরূপ দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শোলিয়ার (Sollier) ও কোমার (Comar) নামক দুইজন হিষ্টিরিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাঁহাদিগের চিকিৎসিত রোগিণীদিগের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঐ রোগিণীরা হিষ্টিরিয়া ব্যাধির আক্রমণের সময়ে নিজেদের দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ ব্যাপার (যথা, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, ফুসফুসের চলন, রক্তের চলাচল ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ করিয়া যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলেন. অথচ, তাঁহারা দেহবিজ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। ঐ ডাক্তার সাহেবেরা সেই শক্তির নামকরণ করিয়াছিলেন,—আন্তর আত্মদর্শন (internal autoscopy)। একজন রোগিণী appendicitis-রোগে আক্রান্ত হইলে, আপন নাড়ীর মধ্যস্থ যে ক্ষুদ্র হাড়ে ঐ ব্যাধির কেন্দ্র ছিল, তাহা ঠিক্ প্রত্যক্ষ করিয়া ডাক্তারের নিকট বর্ণনা করিয়াছিল। দেহ যদি আত্মা হয়, তবে ইহাই প্রকৃত আত্মদর্শন বটে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা তাঁহাদের এই নবাবিষ্কৃত শক্তিকে যে নামেই পরিচিত করুন্ না কেন, ইহা

where a boy named Kawasaki aged 16, has developed gifts of clairvoyance which are declared to render examinations futile. Recently he forecasted accurately all the questions set in several examinations with the result (says the Japan Times) that his class-mates all scored full marks by learning the answers to these questions by heart and neglecting any other preparation.—The Daily Mail of 20 th January, 1911.

আমাদের সেই সুপরিচিত দিব্যদৃষ্টি (clairvoyance) ভিন্ন অপর কিছুই নয়।*

দিব্যদৃষ্টি যে কেবল হিষ্টিরিয়া রোগদশাতেই লাভ করা যায়, তাহা নহে। অনেকস্থলে, ইহা যোগ-সাধনার ফল। আবার অনেকস্থলে, কাহারও কাহারও মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই দিব্য দৃষ্টিশক্তি হিপ্নটিক নিদ্রাবস্থায় প্রকটিত

* Doctors Sollier and Comar, both specialists in the study of hystersia state that they have discovered the existence of a new and remarkable sort of power of second sight in certain patients. Instances of the form of vision in which the seer perceives at dusk, under certain conditions. his own double are well-known to the scientific investigator as well as to the romance-writer. This kind of vision has been named "External autoscopy" and is supposed to be due to a peculiar development of the physical sense of the ego or the physical consciousness of self. The new phenomenon just discovered is "Internal autoscopy'. Certain female patients, observed by the two doctors, have been found to possess, when in an hypnotic trance what appears to be the extraordinary power of seeing inside their own bodies. This is introspection in literal sense. Uneducated women, knowing nothing of anatomy, have described, for instance, in their own language, using no scientific terms, the exact process of the circulation of the blood in their own bodies. As they talked they seemed to be following with the mind's eye the pulsations of the heart, the working of the valves, the arteries and the veins, picturing the whole morphology of the circulation with extraordinary accuracy, though in their own popular parlance. The most remarkable case observed was that of a woman who being taken with the first symptoms of appendicitis and afterwards put in trance, gave a detailed description of the internal effects of the malady, and said notably that she saw a small piece of bone which was causing her sufferings. Eventually, it was found by the doctor, when the woman had recovered, that the appendicitis was precisely due to the presence of a piece of bone exactly tallying with the description given by the patient. This was introspection with a vengeance.

হইতে দেখা গিয়াছে। আমরা এ কথা বলি না যে, যাহাকে তাহাকে হিপ্‌নটাইজ (hypnotise) করিলেই এ শক্তির প্রকাশ হইবে। আমাদের বক্তব্য এই, এমন সকল নরনারী দেখা গিয়াছে, যাহাদের মধ্যে জাগ্রদবস্থায় দিব্যদৃষ্টির কোন লক্ষণ দেখা যায় না, অথচ তাহাদিগকে হিপ্‌নটিক নিদ্রাচ্ছন্ন করিলেই ঐ শক্তি প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে North American Review নামক সাময়িক পত্রিকায় ডাক্তার কোয়েকোন্‌বাস. (John C. Quackuenbos. M. D.) দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ এইরূপ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। নিম্নে পাদটীকায় আমরা তাঁহার প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন—'বোষ্টন নগরের একজন ডাক্তার অধ্যাপকের বার বৎসরের পুত্রকে তাহার পিতা সময়ে সময়ে 'হিপ্‌নটাইজ' করিতেন। ঐ দশায় বালকের অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টি প্রকাশ পাইত। সে দেহের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিত। অনেকবার ঐ বালক সমীপস্থ ব্যক্তির শরীরের ভিতরকার ফোড়া, ব্রণ, গুলি ইত্যাদির ঠিক সংস্থান বলিয়া দিয়াছিল।'

* The twelve-year-old son of Dr. F. N. Brett. lately Prof. of Bacteriology in the college of Physicians and Surgeons at Boston. was gifted with X-ray vision, so that, when hypnotised by his father .he could "look right into and through the human body" seeing the internal organs as readily as one would see objects through a window, In dozens of instances this boy located tumours, foreign bodies, bullets in gun-shot wounds, valvular lesions and so forth. But Leon Brett was always approximated to the patient. It was X-ray vision at short range.

X-ray vision at long range was afforded by a woman who, under hypnotism, described a patient five miles away, diagnosing his disease correctly and sometimes better than the surgeon.

এক্‌স্‌-রশ্মির (X-ray) সাহায্যে যেমন মাংসের আবরণ কাচের মত স্বচ্ছ হইয়া যায় এবং ঐ আবরণ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরস্থ বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, ডাক্তার সাহেব বলেন যে, দিব্যদৃষ্টিও তেমন একপ্রকার 'এক্‌স্‌-রশ্মি'। ঐ রশ্মির সাহায্যে উল্লিখিত বালক নিকটস্থ বস্তু দর্শন করিত। ডাক্তার সাহেব ঐ প্রবন্ধে একজন স্ত্রীলোকের উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিপ্‌নটিক দশায় পাঁচ মাইল দূরস্থ এক রোগীর (দিব্যদৃষ্টিবলে) সঠিক রোগ নির্ণয় করিয়াছিল। কিন্তু সহজ অবস্থায় তাহার ঐ শক্তির প্রকাশ হইত না।

সম্প্রতি ডাক্তার রুডল্‌ফ টিস্‌নার (Dr Rudolph Tischner) একজন মহিলা মিডিয়মকে লইয়া সহজ অবস্থায় কয়েকটি পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐ পরীক্ষার ফল নিম্নে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।* পাঠক লক্ষ্য

* Dr. Tischner begins with his experiments with a Miss V. B., an unpaid medium, and the results, as he records them, are truly remarkable. The purpose of the experiments was to discover whether Miss V. B. could describe an object, to whose nature she had no clue, and which was quite invisible to her. The object was held by Dr. Tischner's friend, Dr. Wasielewski, and besides these two investigators and the medium there were no other people present. The conditions of the experiments, as described, seem to make fraud quite impossible. Nevertheless, in the great majority of cases, Miss V. B. succeeds in giving a very accurate description of the object. She appears to have received no hints of any kind.

A still more remarkable experiment is, when an old postcard is enclosed in black paper, such as is used for wrapping up photographic plates, placed in a thick envelope, and sealed. This packet was handed to Miss V. B., who was then left alone. But the door of the room was left ajar and Dr. Tischner often looked in, without seeing anything suspicious. Finally, it was found that Miss V. B. had deciphered part of the postcard, the words she wrote down occupying the same relative

করিবেন, ঐ মিডিয়ম অদৃশ্য ও ব্যবহিত বস্তু দিব্যদৃষ্টি-বলে দর্শন করিয়া তাহার যথাযথ বর্ণন করিয়াছিল ;—এমন কি, শিল করা পুরু লেফাফার মধ্যস্থ পোষ্টকার্ডের পংক্তিগুলি ঠিক ঠাক লিখিয়া দিয়াছিল। ইহার পরও কি clairvoyanceকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিব ?

এ সকল অস্থায়ী clairvoyance—আকস্মিকও বটে। কখন থাকে, কখন থাকে না—যদৃচ্ছাবশে আসে যায়। কিন্তু সাধনবলে এই দিব্যদৃষ্টিকে চাক্ষুষ দৃষ্টির ন্যায় সহজ ও অনায়াস করা যাইতে পারে—তখন সাধক জাগ্রদবস্থাতেই দিব্যদৃষ্টিবলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর দর্শন করেন। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে এ শক্তিকে যোগের একটা বিভূতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—'প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-জ্ঞানম্' (বিভূতি-পাদ)। অর্থাৎ, সাধন বলে যোগী দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন—যদ্দ্বারা তিনি সূক্ষ্ম (যথা পরমাণু প্রভৃতি, যাহা স্থূল দৃষ্টির অগোচর) ব্যবহিত (ব্যবধানযুক্ত, যথা প্রস্তর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ) এবং বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ, যেমন কলিকাতায় বসিয়া দিল্লীস্থ) বস্তুর প্রত্যক্ষ করেন। শাস্ত্র গ্রন্থে এরূপ বহু যোগীর উল্লেখ আছে, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন এবং অতি দূরস্থ বস্তুও 'করকলিত-কুবলয়-বৎ' দর্শন করিতেন। বর্ত্তমানে যে এরূপ যোগীর অভাব হইয়াছে, তাহা নহে। যাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে—তাঁহারা এরূপ কোন

positions as the words on the postcard. The illustrations, showing the original postcard and Miss V. B.'s copy, are certainly remarkable. So far as could be seen, the sealed envelope had not been tampered with. An interesting fact, ruling out the possibility of telepathy in this case, is that Dr. Tischner did not know the contents of the postcard. He chose it from a collection at random and put it into the envelope without looking at it. As the case stands, therefore, this experiment furnishes really strong evidence for clairvoyance.

না কোন যোগীর পরিচয় নিশ্চয়ই জানেন। শুধু এ দেশে নহে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও এরূপ যোগী দৃষ্টিগোচর হয়েন। অনেকেই বোধ হয়, সোয়েডেন-বর্গের (Swedenborg) নাম শুনিয়াছেন। ষ্টকহলম্ তাঁহার জন্মভূমি ছিল। তিনি বহুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সহযোগী পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি-বলে সোয়েডেনবর্গ কিরূপ দূরস্থ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহার একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৭৫৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সোয়েডেনবর্গ ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার কালে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গটেনবর্গ (Gottenburg) বন্দরে উপনীত হইলেন। ঐ দিন তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে একটা ভোজ ছিল। ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি বেলা ৬টার সময় বন্ধুগৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহার মুখ বিশুষ্ক ও ভয়াকুল দৃষ্ট হইল। বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন যে, ষ্টকহলম নগরে তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটেই আগুণ লাগিয়াছে এবং অগ্নি প্রবল বেগে তাঁহার গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। রাত্রি ৮টা অবধি তাঁহাকে বেশ চঞ্চল দেখা গেল—তিনি কয়েকবার বৈঠক ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। একবার বলিলেন, তাঁহার অমুক বন্ধুর বাড়ী ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রাত্রি ৮ঘটিকার কিছু পরে বলিয়া উঠিলেন,—'ভগবান্‌কে ধন্যবাদ ! অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আমার গৃহ হইতে দুইখানি বাড়ীপর্য্যন্ত আগুণ অগ্রসর হইয়াছিল।' এ ঘটনায় গটেনবর্গ সহরে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল—সহরের গভর্ণর সোয়েডেনবর্গকে পরদিন প্রত্যূষে ডাকাইয়া লইয়া ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন এবং তিনিও ঐ অগ্নিকাণ্ড আমূল বর্ণন করিলেন। তাহার পরদিবস ষ্টকহলম্ হইতে বার্ত্তাবহ অগ্নিকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ সহ গভর্ণরের নিকট উপস্থিত হইল। (বলা বাহুল্য, সে সময়ে Telegraph ইত্যাদি ছিল না)। সেই বিবরণ ও সোয়েডেনবর্গের পূর্ব্ব-

বর্ণনা অবিকল একইরূপ দেখা গেল। ইহার পর দিব্যদৃষ্টির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে কি ?*

* It was on a Saturday towards the end of September 1759 that Swedenborg returning from England landed at Gottenburg at about 4 in the afternoon. There was a party of 15 at William Bastel's to which he was invited. At 6 in the evening Swedenborg entered the salon pale and frightened. A fire had broken out, said he, that instant in Stockholm at the Sundersmalm and was violently spreading towards his house. He was very restless and went out several times. The house of one of his friends whom he named was already reduced to ashes and his own was in danger. After going out again at 8 he joyfully said—"Thank God the fire has been put out at the third door from mine !" This news created quite a sensation in the town and the governor was informed of it the same evening. This functionary called the seer on Sunday morning and questioned him on the subject. He described exactly the beginning, the end and the duration of the fire On Monday evening there arrived a courier from Stockholm, despatched by the trades people during the fire. These letters described the fire as was told by the seer. On Tuesday morning the royal messenger followed with a detailed report to the Governor which in no way differed from that of the seer. Who can plead against the authenticity of this event ? Kant himself says he cannot object to the credibility of it.

দশম অধ্যায়

পরীক্ষাগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ

'সাইকোমেট্রি'র প্রণালীতে দিব্যদৃষ্টির দ্বারা কারণশরীরে রক্ষিত সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়া কিরূপে জাতিস্মর হওয়া যায়, পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। যিনি জাতিস্মর হইতে পারেন, তাঁহার নিকট জন্মান্তর 'করকলিতকুবলয়'বৎ প্রত্যক্ষের বস্তু হয়। কিন্তু আপত্তি হইবে—'জাতিস্মর হওয়া সত্য হইলেও বহু সাধনা সাপেক্ষ। অত সাধ্য সাধনা করিবার আমার সময় নাই। সাধারণ মানুষ বিনা আয়াসে স্বল্প প্রযত্নে জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পারে কিনা? যদি পারে, তবে ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত কর। আমি চার্ব্বাকের মন্ত্রশিষ্য—প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণই গ্রাহ্য করি না। অবশ্য, সুদূরস্থিত নক্ষত্রাদি দেখিবার জন্য আমি দূরবীক্ষণ ব্যবহার করি এবং অতি সূক্ষ্ম কোষাণু প্রভৃতি দেখিবার জন্য অনুবীক্ষণও ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু, তোমার অনুমোদিত এই জন্মান্তরতত্ত্ব আমি চর্ম্মচক্ষে দেখিতে চাই। যদি দেখাইতে পার, ভালই—নতুবা ইহাকে অপ্রমাণিক বলিয়া উড়াইয়া দিব।' বড়ই কঠিন সমস্যা! আপত্তিকারী এবার যে পরিখায় প্রবেশ করিলেন, সেখান হইতে তাঁহাকে নিষ্কাশিত করা যায়, কিরূপে?

সুখের বিষয়, সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসি মনস্তত্ত্ববিৎ লান্‌সেলিন্ (Charles Lancelin) 'La Vie Posthume' (Life after Death) নাম দিয়া এ সম্বন্ধে একখানি চমৎকার গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের

সাহায্যে বোধ হয়, আমরা আপত্তিকারীর শেষোক্ত আপত্তির খণ্ডন করিতে পারিব।

ঐ গ্রন্থের একটু ইতিহাস আছে। প্রথমে সেই ইতিহাসটি বলিব। বোধ হয়, সকল পাঠকই হিপ্‌নটিজিমের (Hypnotism) নাম শুনিয়াছেন, অনেকে এই ব্যাপার হয়ত প্রত্যক্ষও করিয়াছেন। যখন পাশ্চাত্যদেশ জড়বাদে ডুবু ডুবু, তখন কয়েকজন দুঃসাহসিক ডাক্তার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে দৃক্‌পাত না করিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই হিপ্‌নটিজিম্ বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং অনেক পরীক্ষা-সমীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করেন। এখন হিপ্‌নটিজিম্ বৈজ্ঞানিক সমাজে একটা সমাদৃত আসন লাভ করিয়াছে।

হিপ্‌নটিক্ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, কোন ব্যক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে নিদ্রাচ্ছন্ন করিলে, তাহার মস্তিষ্ক এরূপ অসাড় হইয়া যায় যে, তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে, অথবা, তাহার হাতের উপর জলন্ত অঙ্গার রাখিলেও সে অনুভব করে না। অথচ, সে সময় অনেকস্থলে তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিশক্তি সহজের অপেক্ষা তীব্রতর হয়—তাহার সংবিতের জ্যোতিঃ পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হয়।* যাহাকে স্বপ্নসঞ্চরণ বা Somnambulism বলে,নিসর্গজাত সেই স্বপ্নাবস্থা ইহার অন্যতর উদাহরণ। মায়ার (Meyer) সাহেবের Human Personality গ্রন্থে এ ধরণের অনেকগুলি ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে যে, জাগ্রৎ অবস্থায় অশেষ চেষ্টাতে যে ব্যক্তি কোন কিছু স্মরণ করিতে পারগ হয় নাই, কোন একটা অঙ্ক কসিতে পারে নাই, স্বপ্নসঞ্চার অবস্থায় বিনা আয়াসে সে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। সহজ বা কৃত্রিম নিদ্রায় যখন স্থূলদেহ আচ্ছন্ন থাকে, সে অবস্থায় সম্বিতের উজ্জ্বলন

* Trance is often accompanied with exaltation of the senses, memory, intelligence &c.—Theosophy and New Psychology.

এবং স্মৃতি প্রভৃতি শক্তির প্রখরণ প্রথম দৃষ্টিতে বিচিত্র মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক ঐরূপ হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। দিবসের কলকল্লোলে দূরাগত বংশীরব স্তম্ভিত থাকে, কিন্তু রজনীর নিস্তব্ধতায় ঐ ধ্বনি স্পষ্টতর হয়

যে কারণেই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, হিপ্‌নটিক অবস্থায় স্মৃতিশক্তি তীব্রতর হয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কর্ণেল ডি রোসা (Colonel de Rochas) ১৯০৫ সালে একটি মধ্যবয়সী রমণীকে লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে হিপ্‌নটিক নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া আদেশ করিলেন, 'তোমার স্মৃতি ক্রমশঃ পিছাইয়া লইয়া যাও'; সে তাহাই করিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'তোমার বয়স এখন কত?' সে বলিল, 'আঠার বৎসর।' পরে পিছাইয়া পিছাইয়া তাহাকে দশ বৎসর বয়সে উপনীত করা হইল। অধ্যাপক ডি রোসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন তুমি কোথায় থাক?' সে বলিল, 'মার্সেল নগরে।' আট বৎসর বয়সে উপনীত হইলে, তাহার তদানীন্তন বসতি তুর্কি দেশের বিরূট সহরের কথা মনে পড়িল এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল তুর্কি-শব্দ সে বিস্মৃত হইয়াছিল, সেই সকল তুর্কি-শব্দ সে উচ্চারণ করিতে লাগিল। পরে চার বৎসর, দুই বৎসর, এক বৎসর করিয়া অবশেষে সে জন্মক্ষণে উপনীত হইল। সে অবস্থায় অন্য কোন ব্যাপার রহিল না, কেবল আমিত্ব বোধমাত্র রহিল।*

* I ask her how old she is; she replies 'eighteen years.' I tell her to return to the age of sixteen; she sees her present body transform itself accordingly; likewise for fourteen, twelve and ten years of age

When she is ten years old, I ask her where she lives, she replies, "Marseilles", which was true and of which I was not aware.

At eight years of age she is at Bairut which is still true. She remembers the people who frequented her home. I ask her how "Bonjour" is

জাগ্রৎ অবস্থায় সূতিকার স্মৃতি কাহারও মনে থাকে কি? কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ রমণী হিপ্‌নটিক নিদ্রাবলে একে একে স্মৃতি মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে অবশেষে সূতিকা-শয্যায় উপনীত হইল এবং তাহার মনে অজ্‌ শৈশবের স্মৃতি জাগরূক হইল।

১৯০৯ সালে অধ্যাপক ডুরভিল্‌, ডি রোসার প্রবর্ত্তিত পথে বিচরণ করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হন। তিনি শুধু ভাণ্ডদেহকে (Physical Bodyকে) হিপ্‌নটাইজ করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, পিণ্ডদেহ বা Etheric Bodyকেও নিদ্রাচ্ছন্ন করেন। ইহার ফলে কয়েকটী নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়—কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। ইহার কয়েক বৎসর পরে অধ্যাপক লান্‌সলিন এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ডি রোসা ও ডুর্‌ভিলের পরীক্ষার ফল স্মরণ রাখিয়া নবতর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী পরীক্ষা-সমীক্ষার ফল এখন এই La Vie Posthume গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে।

এক কথায় বলিতে গেলে, অধ্যাপক লান্‌সলিনের অবলম্বিত প্রণালীর নাম Regression of Memory, অর্থাৎ, 'স্মৃতির প্রতিসরণ'। তিনি কয়েক ব্যক্তিকে হিপ্‌নটিক নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদের স্মৃতিকে ধীরে ধীরে অতীতের দিকে ক্রমাগত প্রত্যাবৃত্ত করাইতে লাগিলেন (ডি রোসাও ঐরূপ করাইতেন)। তাহার ফলে তাহাদের স্মৃতি প্রৌঢ় হইতে যৌবনে,

said in Turkish; she replies "Salamalle" which she had forgotten in her waking state.

At four years old she is again at Marseilles.

At two years old she is at Cages in Provence (exact).

At one year old, she can no longer speak, She contents herself with looking at me and replying "yes" or "no" by nodding her head.

Further still into the past, "she" is nothing more (elle n'est plus rein". She feels that she exists, and that is all.—Colonel de Ro chas in the Annals of Psychical Science for July, 1905.

যৌবন হইতে কৈশোরে, কৈশোর হইতে শৈশবে, শৈশব হইতে সূতিকায় প্রতিলোমক্রমে অপসর্পিত হইল। হিপ্‌নটিজম্ দ্বারা তাহাদের স্থূল শরীর নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ায় তাহাদের স্মরণশক্তি ঐ অবস্থায় তীক্ষ্ণতর হইয়াছিল; সুতরাং জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল পূর্ব্ব বিবরণ তাহাদের স্মৃতিপটে কখনই উদয় হইত না, ঐ সকল বিবরণ ফুটিয়া উঠিল।* অনেকের স্মৃতি জননীজঠর অতিক্রম করিয়া তাহার পশ্চাতে যাইতে পারিল না; কিন্তু কাহারও কাহারও স্মৃতিকে ইহজন্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া জন্মান্তরে উপনীত হইতে দেখা গেল। লান্‌সেলিনের গ্রন্থে এইরূপ কয়েকটি পরীক্ষার বিবরণ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। এই সব পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া একজন অভিজ্ঞ লেখক লিখিয়াছেন, এই সকল পরীক্ষার নবীনত্ব ও বিশেষত্ব এই যে, ইহার দ্বারা জন্মান্তরবাদ অপ্রত্যাশিত ভাবে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।**

অধ্যাপক লান্‌সেলিন যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মিস্ জে নাম্নী একটি রমণীর বৃত্তান্ত বিশেষ বিস্ময়প্রদ। নিম্নে পাদ-টীকায় ঐ বৃত্তান্ত আমরা অধ্যাপকের নিজের কথায় উদ্ধৃত করিলাম।† পাঠক লক্ষ্য

---

* The hypnotised subject was taken back, step by step, to the early days of youth and childhood, through a most trying period within the darkness of the womb, and then through an intermediary life and still further back, through death, to a former physical existence. All the mediums appear to have suffered severely while retracing their experiences.

** What gave these experiments such a new and important turn was the unexpected discovery of the truths of reincarnation.—I. H. Moll's Reincarnation proved by Hypnotic Research.

† Mme. J. was born in 1878 in the Isere. In her previous existence as Marguerite Duchesne, she was born in 1835. Replaced in her fifteenth year, she is living in Briancon (a place which, in her actual existence,

করিবেন, মিস্ জে hyponotised অবস্থায় পর পর সাতটী জন্মের বিবরণ দিয়াছিলেন। ঐসকল বিবরণ পরে অনুসন্ধান দ্বারা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোন্ জন্মে তিনি কোথায় জন্মিয়াছিলেন, কোন্ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, সে সময়ে কে রাজা ও রাণী ছিলেন এবং সাধারণতঃ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল—তিনি তাহা যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলেন। ঐ সকল বিবরণ তাঁহার এ জন্মে জানিবার কোনই সুযোগ বা সুবিধা হয় নাই এবং যখন সত্য ঘটনার সহিত তাহাদের মিল দেখা যাইতেছে, তখন তাহাদিগকে কল্পনামূলক বলিবারই বা অবসর কোথায়?

জোসেফাইন্ নাম্নী একটী ১৭ বৎসর বয়স্কা পরিচারিকার (servant girl) বৃত্তান্তও কম কৌতুকাবহ নহে। সে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুইটি জন্ম স্মরণ করিতে পারিয়াছিল। ঐ দুই জন্মে সে কোথায় জন্মিয়াছিল, পুরুষ হইয়াছিল না স্ত্রী হইয়াছিল এবং তাহার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহার বিবরণ ঐ অশিক্ষিতা পরিচারিকা যেরূপ দিয়াছিল, অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, তাহা আদৌ অপ্রকৃত নহে।*

she has never visited), and has just left the School belonging to the 'Dames de la Trinite', of whom she is very fond; she is asked to say where the School is situated, and responds: 'In the rue de la Gorgonille at Briancon.' Later researches proved the fact that at that time (about 1850) there was a School kept in that street by those ladies. In her fifth previous incarnation (Michel Berry, early 16th cent.) certain details given correspond perfectly both to the habits and customs of the epoch. In her 7th previous life (Sister Marthe, tenth century) she gives almost exactly the chronology of the Kings of France and leads up to the year 1000, partakes of the terror then reigning of the near approach of the end of the world, terror, which, at our epoch, is no longer remembered except by those persons who have made deep researches into historical studies.

* Another case cited is that of Josephine, a servant girl aged 17, who after being replaced into a previous life declared she was Joseph

অধ্যাপক লান্সেলিন আর একটা পুনর্জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন। একটী শিশু পাঁচ বৎসর বয়সে মারা যায়। তাহার অকাল মৃত্যুতে তাহার জননী শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়েন। এই শিশু মাতাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিয়াছিল, সে ও তাহার এক মাসী (যে ১৩ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিল) উভয়ে যমজরূপে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার মাতা প্রথমে ঐ কথা বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু কাল পূর্ণ হইলে তিনি যখন যমজ সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তাঁহার অবিশ্বাস তিরোহিত হইল।*

এইরূপে অধ্যাপক লান্সলিন অধ্যবসায়ের ফলে অনুসন্ধান ও গবেষনার একটা নূতন দিক্ উৎঘাটিত করিয়াছেন এবং জন্মান্তরের স্বপক্ষে অনায়াসলভ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। এ জন্য তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন।

এখন বোধ হয়, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, জন্মান্তরবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কেবল আগম বা আপ্তবাক্য নহে, কেবল যুক্তি, তর্ক বা

Bourden, who did his military service at Besancon in the 7th Artillery, and that the grand military revue was held on May 1st. Subsequent enquiries proved that the 7th Artillery were garrisoning Besancon between 1832 and 1837, and that at that time the revue was held on May 1st, and not on July 17th as now. In an incarnation preceding that, she announced that her name was Philomene Charpigne, born at Ozan in 1702, and that she marries a man named Carteron at Chevneuz. It was later confirmed that families of those names were living in those towns.

* Towards the close of the book an authentic case is quoted of the rebirth of a child of 5 years old (announced by herself in dreams and seances, to her bereaved, inconsolable and disbelieving mother), together with a twin, the child's aunt, who had died at the age of 13. All the letters concerned with the verification of the case are fully given, with portraits of the children.

অনুমান নহে; কিন্তু প্রবল প্রত্যক্ষ প্রমাণও উপস্থিত করিতে পারিয়াছি। ইহার পরও যিনি জন্মান্তরকে উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। যিনি জাগিয়া ঘুমাইবেন, তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবে, এমন সাধ্য কাহার?

জন্মান্তরের প্রকার ও প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু উল্লেখ করিলেও তাহার সবিশেষ আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

একাদশ অধ্যায়

জীবের উৎক্রান্তি ও গতাগতি

অধ্যাপক ফ্রেডারিক মায়ার তাঁহার প্রখ্যাত 'Human Personality' গ্রন্থে প্রভূত অনুসন্ধান ও আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জীব—একটি নহে, তিনটী ভূমিকায় বিহরণ করে। তাঁহার ভাষা এইরূপ—

Man lives in three environments—the physical, the ethereal and the met-ethereal, that which is called the heaven world, অর্থাৎ, জীব তিন ভূমিতে বসতি করে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম (যাহাকে স্বর্গলোক বলে)। এ মতও এ দেশের প্রাচীন মতের অনুকূল। ঋষিদিগেরও শিক্ষা এই যে, জীব সাধারণতঃ তিন লোকে বাস করে—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ। ভূলোক আমাদের এই পৃথিবী—Physical Plane। ভুবর্লোককে অন্তরীক্ষ বলে। মায়ার ইহাকে Ethereal world বলিলেন—থিওসফিকেল গ্রন্থে ইহাকে Astral Plane বলা হয়। স্বর্লোক = স্বর্গ—মায়ার ইহাকে Met-ethereal বলিয়াছেন। ইহাই Heaven world—থিয়সফি-কথিত Devachan বা Mental Plane।

এই তিনলোকের অনুযায়ী জীবের তিনটী অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীব জাগ্রৎ অবস্থায় এই স্থূল ভূলোক বা Physical Planeএর সংস্রবে আইসে। তখন সে স্থূলদেহ বা Physical Body ব্যবহার করে,

এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ভূলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই স্থূল দেহের বৈদান্তিক নাম অন্নময় কোষ। জীবের যে স্বপ্নাবস্থা, সেই অবস্থায় সে সূক্ষ্ম ভুবর্লোক বা Astral Planeএর সংস্রবে আইসে। ঐ সূক্ষ্ম লোকে বিহরণ করিবার জন্য এবং ঐ লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য, স্থূলদেহই যথেষ্ট নহে—সেই লোকের উপযোগী সূক্ষ্মবাহনের প্রয়োজন। জীবের সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সূক্ষ্ম শরীরকে Astral Body বলে। ইহার বৈদান্তিক নাম প্রাণময় কোষ।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের উপর সুষুপ্তি। জীবের যে সুষুপ্তি-অবস্থা, সেই অবস্থায় সে স্বর্লোক বা Mental Planeএর সংস্রবে আইসে। ঐ লোকে বিহরণ করিবার জন্য এবং ঐ লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য, স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহই যথেষ্ট নহে—সেই লোকের উপযোগী বাহনের প্রয়োজন। জীবের সুসূক্ষ্ম শরীর দ্বারা ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ঐ সুসূক্ষ্ম দেহকে Mental Body বলে—ইহার বৈদান্তিক নাম মনোময় কোষ। প্রশ্ন হইবে, স্থূলদেহ ছাড়া জীবের যে সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহার প্রমাণ কি? উত্তরে বলি, যাঁহারা দিব্যদর্শী, যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়াছে, তাঁহারা স্থূলদেহ ছাড়া জীবের ঐ সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম দেহ প্রত্যক্ষ করেন। কখনও কখনও মৃতব্যক্তির (যাহাকে আমরা প্রেত বলি) সেই প্রেতমূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর হয়। মৃতব্যক্তির ত আর স্থূলদেহ থাকে না। অতএব, আমরা যে প্রেতমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি, ইহা নিশ্চয়ই তাহার সূক্ষ্ম শরীর। এ ঘটনাও একেবারে বিরল নহে যে, কখনও কখনও ক্যামেরা দ্বারা প্রেতমূর্ত্তির ফটোগ্রাফও গৃহীত হয়। আমরা ইহাও জানি যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জীবিত মনুষ্যের সূক্ষ্মদেহ (Human Aura) দর্শন করিয়াছেন।* ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত

* এই প্রসঙ্গে Human Aura and How to see it, by Dr. Kilner M.D. দ্রষ্টব্য।

আলোচনার স্থান এ নহে। * এখানে আমাদের এইমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যখন জীবের জাগ্রৎ অবস্থা ছাড়া, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা আছে এবং যখন কেবল স্থূল ভূলোক নহে, সূক্ষ্ম ভুবর্লোক এবং সুসূক্ষ্ম স্বর্লোকে তাহাকে বিহরণ করিতেই হইতেছে, তখন তাহার স্থূল শরীরের উপর সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম শরীর অবশ্যই আছে। আমরা যখন স্থলপথে বিচরণ করি, তখন আমাদের যান—শকট বা রেলগাড়ী। জলপথে গমনের জন্য আমাদের যান—নৌকা বা জাহাজ। কিন্তু ব্যোমপথে বিহরণ করিতে হইলে, বেলুন বা এরোপ্লেন আবশ্যক হয়। অতএব, উপাধির ভেদে বাহনের প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী।

ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোকের মিলিত নাম 'ত্রিলোকী'। এই ত্রৈলোক্যই সাধারণ জীবের লীলাক্ষেত্র। প্রতিদিন জাগ্রৎ অবস্থায় জীব ভূলোকে বিহরণ করে। নিদ্রাবস্থায় সে ভুবলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় সুষুপ্ত হইলে সে স্বর্লোকে গমন করে। সেইজন্য মায়ার্স বলিয়াছেন—Man lives in three environments.—ইহা জীবের দৈনন্দিন ঘটনা। জীবের মৃত্যু ঘটিলে যখন স্থূলদেহের বিনাশ হয়, তখন জীব সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া, প্রথমতঃ ভুবর্লোকে গমন করে। কর্ম্মানুসারে সেখানে তাহার বাসের কাল-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ভুবর্লোককে শাস্ত্রে কোথাও কোথাও 'কামলোক' বলা হইয়াছে। ঐ কামলোকে কিয়ৎকাল বাস করিবার পর, যখন তাহার সূক্ষ্মদেহের বিলয় ঘটে, তখন জীব সুসূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া স্বর্লোকে উপনীত হয়। স্বর্গলোকে জীবের বসতি চিরস্থায়ী নহে।† পুণ্যক্ষয় হইলে, জীবের ঐ স্বর্গলোক হইতে চ্যুতি হয়।

* ১৩২৮ সালের 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় আমি জীবের বিবিধ উপাধি ও কোষ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

† ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষায়—'যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা'।

এই যে স্বর্গলোক বা Mental Plane, ইহার দুইটি স্তর আছে। বৌদ্ধেরা স্বর্লোকের সূক্ষ্মতর স্তরকে অরূপ ভূমি (Arupa Level) এবং স্থূলতর স্তরকে রূপভূমি (Rupa Level) বলেন। সাধারণতঃ, রূপভূমিতেই জীবের স্বর্গভোগ হয়। ভোগান্তে মনোময় কোষের বিলয়ে জীব কারণ শরীর অবলম্বন করিয়া স্বর্লোকের অরূপ ভূমিতে উন্নীত হয়। ইহাই জীবের স্বধাম—তাহার 'প্রত্ন ওকঃ'—True Habitat। এই স্বধামে কিছুকাল অবস্থানের পর তাহার চিত্তে আবার প্রবাসে যাইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। বুদ্ধদেব ইহাকে 'তন্‌হা' বলিয়াছেন। এই তন্‌হার তাড়নায় সে ভূতসূক্ষ্ম বা Permanent Atoms দ্বারা সংবেষ্টিত হইয়া স্বর্লোকের রূপভূমি পার হইবার পর ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়া ভূর্লোকে উপনীত হইয়া জনকের দেহে প্রবেশ করে। সেখান হইতে জননীর কুক্ষিতে নিষিক্ত হয় এবং যথাকালে মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই জীবের জন্মান্তর।

এই দেহান্তর গ্রহণের বিষয় ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে—

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।১

ইহার শাঙ্কর-ভাষ্য এইরূপ—

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তর-প্রতিপত্তৌ দেহবীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তো রংহতি গচ্ছতি ইতি অবগন্তব্যম্।

অর্থাৎ, জন্মান্তর গ্রহণের জন্য জীব দেহবীজ 'ভূত-সূক্ষ্ম' সমূহ দ্বারা পরিষ্বক্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া ভূর্লোকে অবতরণ করে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, জীব যখন স্বর্গলোকে অরূপ ভূমিকা হইতে জন্মান্তর গ্রহণের জন্য অবরোহণ করে, তখন সে সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম দেহ দ্বারা বেষ্টিত থাকে না; কিন্তু দেহবীজ ভূত-সূক্ষ্ম

পরিষ্বক্ত থাকে। পরবর্ত্তী সূত্রে বাদরায়ণ এই ভূত-সূক্ষ্মের কিছু পরিচয় দিয়াছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ —৩।১।২

ত্র্যাত্মকস্তু দেহঃ ত্রয়াণামপি তেজোঽপ্‌ অন্নানাং তস্মিন্‌ কার্য্যোপলব্ধে—শাঙ্কর ভাষ্য।

ভূত সূক্ষ্ম কি কি ? তেজঃ, অপ্‌, অন্ন অর্থাৎ, ক্ষিতিতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব নির্ম্মিত তিনটি পরমাণু। থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে ইহাদিগকেই 'Permanent Atoms' বলে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনাবৃত্তি

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, সাধারণ জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রৎ অবস্থায় জীব অন্নময় কোষের বাহনে ভূর্লোকে বিহরণ করে; স্বপ্নাবস্থায় জীব প্রাণময় কোষের বাহনে ভুবর্লোকে বিহরণ করে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় জীব মনোময় কোষের বাহনে স্বর্লোকের যে নিম্নস্তর বা রূপ-ভূমি, সেই ভূমিতে বিহরণ করে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, স্বর্লোকের যে উচ্চস্তর বা অরূপ-ভূমি, উহাই জীবের স্বধাম, তাহার True Habitat; এবং স্বর্গভোগান্তে, জন্মান্তরগ্রহণের জন্য ভূর্লোকে অবতরণের অগ্রে, জীব বিজ্ঞানময় কোষের বাহনে (বিজ্ঞানময় কোষের ইংরাজী নাম Causal Body) স্বর্লোকের ঐ অরূপ-স্তরে উন্নীত হইয়া, কিছুকাল সেখানে অবস্থান করে। ইহা গেল সাধারণ জীবের কথা। কিন্তু যাঁহারা অসাধারণ জীব, যাঁহারা যোগী, সাধক, ভক্ত, ধ্যানী—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ছাড়া তাঁহাদের আর দুইটি অবস্থা আছে—তুরীয় এবং তুরীয়াতীত বা নির্ব্বাণ। ঐ দুই অবস্থায় জীব কোন্ কোষ ব্যবহার করে এবং কোন্ লোকের সংস্রবে আইসে?

শ্রুতিতে দেখিতে পাই, আদিতে 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে'—তমঃ তমসের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। ঐ তমঃই নির্ব্বিশেষ কারণার্ণব—ঋগ্বেদের 'অপ্রকেত সলিল'। মহেশ্বরের 'সিসৃক্ষা' হইলে, ঐ অব্যাকৃত একাকার কারণ-বারি ব্যাকৃত হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চতত্ত্বে সজ্জিত হইল।

তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২।১।১

এই তত্ত্ব-সৃষ্টির পর মহেশ্বর লোকসৃষ্টির সংকল্প করিলেন।

স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি—ঐতরেয়, ১।২

কি কি লোক সৃষ্টি করিলেন?

স ইমান্ লোকান্ অসৃজত—অম্ভো মরীচির্মরমাপঃ। অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ—ঐত ১।২

'অধস্তাৎ আপঃ'—এই অপ্ আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত কারণার্ণব, সমস্ত লোকের নির্ব্বিশেষ উপাদান মূল-প্রকৃতি। তাহা হইতে নির্ম্মিত নিম্নে মর বা পৃথিবী (আমাদের পরিচিত ভূর্লোক বা Physical Plane), মধ্যে মরীচি বা অন্তরিক্ষ (আমাদের পরিচিত ভুবর্লোক বা Astral Plane), উর্দ্ধে দ্যৌ বা দিব্ (আমাদের পরিচিত স্বর্লোক বা Mental Plane)—এবং তাহার পরে অম্ভঃ। ঐ অম্ভঃ লোক কোথায়? পরেণ দিবং অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকীর উর্দ্ধতন যে লোক, তাহার সাধারণ নাম অম্ভঃ। এই অম্ভঃ লোকের সহিত সাধারণ জীবের সম্বন্ধ না থাকিলেও, অসাধারণ জীবের উহাই বিকাশ ক্ষেত্র। *

প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে সাতটি লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

ওঁ গায়ত্রীমাবাহয়ামি ইতি।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ। ওঁ মহঃ। ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্—
তৈত্তি আরণ্যক ১০।২৭

অর্থাৎ, গায়ত্রীকে আবাহন করি—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্।

---

* সেই জন্য শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট একস্থলে বলিয়াছেন যে, প্রথম দীক্ষার পর সাধকের বিকাশক্ষেত্র ঐ উর্দ্ধলোক (where proceeds the specific evolution of the Initiate after the first of the great initiations).

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিন লোক লইয়া নিম্ন ত্রিলোকী এবং জনঃ, তপঃ ও সত্য—ঐ তিন লোক লইয়া ঊর্দ্ধ ত্রিলোকী। মহর্লোক এই নিম্নতর ত্রিলোকী ও ঊর্দ্ধতর ত্রিলোকীর মধ্যবর্ত্তী। জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই ঊর্দ্ধতর ত্রিলোকীর সাধারণ নাম ব্রহ্মলোক বা প্রজাপতি লোক।

ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্।

যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যধৃত এই প্রাচীন শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহর্লোকের উপরিতন যে ত্রিভূমিক (three levelled) লোক, তাহার নাম ব্রহ্মলোক বা প্রজাপতি লোক। এই ভূমিত্রয় আমাদিগের পরিচিত জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক। ঐতরেয় উপনিষদ্ যে 'অম্ভে'র উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ ব্রহ্মলোক ও মহর্লোক তাহার অন্তর্গত।

থিয়সফিকেল গ্রন্থে Five Planesএর উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—Physical Plane, Astral Plane, Mental Plane, Buddhic Plane এবং Nirvanic Plane। ভূর্লোক—Physical Plane, ভুবর্লোক—Astral Plane, স্বর্লোক Mental Plane এবং ঐ মহর্লোক Buddhic Plane এবং ঐ ব্রহ্মলোক—Nirvanic Plane.

আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ অবস্থায় জীবের লীলাক্ষেত্র ঐ ভূর্লোক, স্বপ্নাবস্থায় জীবের লীলাক্ষেত্র ঐ ভুবর্লোক এবং সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের লীলাক্ষেত্র ঐ স্বর্লোক। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ছাড়া উন্নত জীবের যে আর দুইটী উচ্চতর অবস্থা আছে (তুরীয় ও নির্ব্বাণ) ; সেই সেই অবস্থায় জীবের লীলাক্ষেত্র কি কি? তুরীয় অবস্থায় জীবের লীলাক্ষেত্র ঐ মহর্লোক। এবং নির্ব্বাণ অবস্থায় জীবের লীলাক্ষেত্র ঐ ব্রহ্মলোক। অতএব, আমরা দেখিতেছি জীবের পাঁচ অবস্থার অনুযায়ী ঐ পঞ্চলোক। প্রথমতঃ, ভূর্লোক (physical plane)। এই লোক ক্ষিতিতত্ত্ব দ্বারা গঠিত এবং এই ভূর্লোকে বিহরণের উপযোগী ক্ষিতিতত্ত্বে নির্ম্মিত জীবের

অন্নময় কোশ (Physical Body)। ভূর্লোকের পর ভুবর্লোক (Astral Plane)। এই লোক অপ্‌তত্ত্বে গঠিত এবং এই লোকে বিহরণের উপযোগী অপ্‌তত্ত্বে নির্ম্মিত জীবের প্রাণময় কোশ (Astral Body)। ভুবর্লোকের পর স্বর্লোক (Mental Plane)। এই লোক অগ্নিতত্ত্বে গঠিত এবং যেহেতু ইহার দুই স্তর (রূপভূমি ও অরূপভূমি), অতএব ঐ দুই ভূমিতে বিহরণের উপযোগী অগ্নিতত্ত্বের রূপভূমির স্থূলতর পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত জীবের মনোময় কোশ (Mental Body) এবং অগ্নিতত্ত্বের অরূপভূমির সূক্ষ্মতর পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত বিজ্ঞানময় কোশ (Causal Body)।

স্বর্লোকের পর মহর্লোক (Buddhic Plane)। এই লোক বায়ুতত্ত্বে গঠিত এবং ঐ লোকে বিহরণের উপযোগী বায়ুতত্ত্বে নির্ম্মিত জীবের আনন্দময় কোশ (Buddhic বা Bliss Body)। যে সাধক যোগবলে তুরীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছেন, তিনি এই আনন্দময় কোশের সাহায্যে ঐ মহর্লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

মহর্লোকের উপর ব্রহ্মলোক (Nirvanic Plane)। ঐ লোক আকাশ-তত্ত্বে গঠিত এবং ঐ লোকে বিহরণের উপযোগী আকাশ-তত্ত্বে নির্ম্মিত জীবের হিরণ্ময় কোশ (Nirvanic Body)—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং—মুণ্ডক ২।২।৯

সাধক যখন তুরীয় ভূমিকা উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ ভূমিকায় আরোহণ করেন, তখন এই হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে ঐ ব্রহ্মলোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের মৃত্যু ঘটিলে, যখন স্থূলদেহের (অন্নময় কোশের) নাশ হয়, তখন জীব সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া ভুবর্লোকে বসতি করে। ঐ লোকে কিয়ৎকাল বাস করিবার পর, যখন তাহার প্রাণময় কোশের বিলয় ঘটে, তখন জীব সুসূক্ষ্ম দেহ (মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ)

অবলম্বন করিয়া স্বর্গলোকে বাস করে। প্রথম, মনোময় কোশে স্বর্গলোকের রূপভূমিতে অবস্থান করিয়া মনোময় কোশের বিলয় ঘটিলে,জীব স্বর্গলোকের অরূপভূমিতে বিজ্ঞানময় কোশের বাহনে উন্নীত হয়। সেখানেও জীবের বসতি চিরস্থায়ী নহে। পুণ্যক্ষয় হইলে তন্হার তাড়নে জীবের স্বর্গলোক হইতে চ্যুতি হয়। তখন সে ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া আবার ভূর্লোকে ফিরিয়া আসে। ইহাকে শাস্ত্রের ভাষায় ধূমযান বা কৃষ্ণাগতি বলে। এ গতি ছাড়া উন্নত জীবের আর এক গতি আছে, তাহার নাম শুক্লাগতি বা দেবযান। সেইজন্য গীতা বলিয়াছেন—

শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥—৯ ২৬

অর্থাৎ, জীবের এই দুই গতি—কৃষ্ণা গতি বা ধূমযান এবং শুক্লাগতি বা দেবযান। ধূমযানে জীবের আবৃত্তি হয়, কিন্তু দেবযানে জীবের আবৃত্তি হয় না।

সাধারণ জীব ধূমযানমার্গে ভূঃ,ভুবঃ,স্বঃ এই তিন লোকে গতাগতি করে —ইহার নাম আবৃত্তি। কিন্তু উন্নত সাধক—যিনি অসাধারণ জীব, তিনি দেহান্তে ঐ তিন লোক পার হইয়া দেবযানমার্গে উচ্চতর মহঃ, জনঃ, তপঃ বা সত্য লোকে গমন করেন। সেখান হইতে তাঁহার আর আবৃত্তি হয় না।

গীতা এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ —৮।২৪

'অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস,—তখন প্রয়াণ করিলে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।' এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের বিস্তৃত উপদেশ এই—

যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিসমভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যামাণ পক্ষমাপূর্য্যামাণ পক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্।

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্য মাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।—ছান্দোগ্য ৫।১০।১২

অথ যদু চৈবাস্মিংচ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চিষমেবা ভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণ পক্ষ মাপূর্য্যমাণ পক্ষান্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্য মাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫

'যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধারূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চ্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করান ; ইহাই দেব-যান পন্থা।'

'আর এরূপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চ্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান পথ। এ পথে গমনকারীকে আর মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।'

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে এই দেবযানমার্গের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সকল সাধককেই এই দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া, ঐসকল উচ্চতর লোকে উপনীত হইতে হয়—

অর্চ্চিরাদিনা তৎ প্রথিতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১

এই দেবযান মার্গের অনেকগুলি পর্ব্ব (stages)—অর্চ্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ সম্বৎসর প্রভৃতি। বাদরায়ণ বলেন যে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গচিহ্ন বা ভোগভূমি নহে। ইঁহারা পথপ্রদর্শক দিব্য পুরুষ ; সাধককে স্ব স্ব অধিকৃত পর্ব্ব পার করিয়া দেন।

আতিবাহিকা স্তল্লিঙ্গাৎ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪-৫।

অর্থাৎ, 'উপনিষদুক্ত অর্চ্চিঃ, দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ'। শেষ পর্ব্বে সাধক এক অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চতম ব্রহ্মলোকে নীত হন।

তৎপুরুষোঽমানবঃ। স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি।

'অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান।'

এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধককে বাদরায়ণ 'মুক্ত' বলিয়াছেন।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২

বাদরায়ণ ঐরূপ মুক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদ্ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২

'ব্রহ্মলোকগত মুক্তের আর আবৃত্তি হয় না,—শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন'। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকের এই যে অনাবৃত্তি—ইহা কি আত্যন্তিক না আপেক্ষিক? উপনিষদ্ এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মলোকান্ গময়ন্তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি।

—বৃহদারণ্যক ৬।২।১৫

'তাঁহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ু-ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিত কাল বাস করেন।'

স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে। ন চ পুনরাবর্ত্ততে।

—ছান্দোগ্য ৮।১৫।১

'তিনি এইরূপ থাকিয়া যতদিন ব্রহ্মার আয়ুঃ, ততদিন ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন। পুনরায় আবর্ত্তন করেন না।'

গীতার উপদেশে কিন্তু আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মলোক হইতেও আবর্ত্তন হইতে পারে। গীতা বলিয়াছেন—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গীতা, ৮।১৫।১৬।

অর্থাৎ, 'মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়, অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্ত্তন করে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত-সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু কল্প ক্ষয় হইলে, তাহাকেও ফিরিতে হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্ অবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। মামুপেত্য বর্ত্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেব।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জ্জন্ম হইবে, যদি না তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এইরূপ ক্রমমুক্তি-ফলদায়া উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে) ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভ করেন। অপরে করিতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম কখনই হয় না।'

এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্মৃতি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানো প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

'কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন।'

ব্রহ্মসূত্রও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাৎ—ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১০

'কার্য্যের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসানে তাহার অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা পর-তত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।'

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যদিও ব্রহ্মলোকবাসীর স্থিতি স্বর্গলোকবাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহারও পতন অর্থাৎ জন্মান্তর হয়—যদি না ইতিমধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। অতএব বাদরায়ণের সূত্রোক্ত অনাবৃত্তি এই ভাবেই বুঝিতে হইবে।

সেইজন্য পণ্ডিতবর শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শঙ্করভাষ্যের অনুবাদে এই অনাবৃত্তির প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন, "এইস্থানে আর একটী সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই—

যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন-ব্রহ্মদর্শন, অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।"

অন্যত্র গীতা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যদি পরমেশ্বরের সমীপে পৌঁছিতে পারে, তবেই তাহার আবৃত্তির শেষ হয়, নতুবা হয় না।

যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।—গীতা ১৫।৬

'যেখানে পৌঁছিলে আর আবর্ত্তন করিতে হয় না, আমার সেই পরমধাম।'

গীতা পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া অন্যত্রও এই কথাই বলিতেছেন,

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥—গীতা ৮।২১

'অব্যক্ত অক্ষর—যাহাকে পরম গতি বলে, যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না—আমার সেই পরম ধাম।'

ইহাই প্রকৃত অনাবৃত্তি। এই অনাবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন—

তদ্বুদ্ধয় স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ —৫।১৭

'পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, পরমেশ্বরই যাঁহাদের আত্মা, পরমেশ্বরে যাঁহাদের নিষ্ঠা, পরমেশ্বরই যাঁহাদিগের পরায়ণ—সেই জ্ঞাননির্ধূতপাপদিগের আর আবৃত্তি হয় না।' ইহাই জন্মান্তর নিবৃত্তির, আত্যন্তিক অনাবৃত্তির একমাত্র উপায়।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় —শ্বেতাশ্বতর ৩।৮

'তাঁহাকে জানিলে, তবেই মৃত্যুর (জন্মান্তরের) অতীত হওয়া যায়—অনাবৃত্তির অন্য পন্থা নাই।'

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

গীতায় ঈশ্বরবাদ (চতুর্থ সংস্করণ)

(ষড়দর্শনের বিশিষ্ট আলোচনা সম্বলিত) ৩৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ১।০

উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব)

তৃতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

(উপনিষদের পরিচয়সহ ব্রহ্মতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা) ২৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ১।০

বেদান্ত পরিচয়

(বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা) ২৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ,-মূল্য ১।০

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব

(জগৎত্রাতা মহাপুরুষের আগমন সূচনা) মূল্য ॥০

প্রাপ্তিস্থান

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ প্রকাশকের নিকট

৪।৩এ কলেজ স্কোয়ার বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি

---

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে।